Contents

বিভিন্ন ফিকহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

ড. আবূ বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার

বিভিন্ন ফিকহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

ড. আবূ বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার

গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.waytojannah.com

বিভিন্ন ফিকহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

ড. আবূ বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২০

ইফা গবেষণা : ১৩০
ইফা প্রকাশনা : ২৬০৮
ইফা গ্রন্থাগার.: ৩৪০.৫৯০৯

ISBN : 978-984-06-1324-5

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩
মাঘ ১৪১৯
রবিউল আউয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
লুৎফর রহমান সরকার
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫২১

প্রচ্ছদ :
ফারজীমা মিজান শরমীন (এশা)

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ডাঃ খিজির হায়াত খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রুফ সংশোধন
মোহাম্মদ মোকসেদ

মূল্য : ১৭৪.০০ টাকা

BIVINNO FIKHER TALUNAMULAK PORJALOCHONA (Comparative Discussion on Various Fiqh) : Written by Dr. Abu Bakar Md. Zakaria Mojumder and published by Director, Research Department, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8181521

Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 174.00 ; US Dollar : 5.00

www.waytojannah.com

মহাপরিচালকের কথা

আল্লাহ্‌র দীনের গবেষক ফকীহগণ কঠোর পরিশ্রম করে উম্মতের জন্য এক বিশাল গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেছেন। পরবর্তীকালের মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে তাঁরা এমন সব প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করেছেন যেগুলো তখনও সংঘটিত হয়নি।

সাহাবায়ে কিরামের পরে ফিক্‌হী গবেষণার কাজটি তাবি'ঈগণ শুরু করেন। তারপর তাঁদের ছাত্ররা যুগের ধারাবাহিকতায় তা উত্তরোত্তর উন্নয়ন করে সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে দেন। ইতিহাসে ইমাম আবু হানীফা (রহ) সর্বপ্রথম ফিক্‌হ গবেষণার পথ রচনা করেন। সে জন্যই ইমাম শাফে'ঈ (রহ) বলেছেন, "ফিকহ শাস্ত্রে পৃথিবীর সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফার পোষ্য ও পরিবারভুক্ত।"

ইমাম আবু হানীফা (রহ) হাদীস শাস্ত্রে এক বিরাট বিশারদ ছিলেন এবং 'মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা' নামে তাঁর একটি হাদীস সংকলনও রয়েছে। তবে ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশে তাঁর অনন্য অবদান সবার আগে স্বীকৃত। অবশ্য পরিবর্তীতে অনেক গবেষক আলিম কুরআন-সুন্নাহর নিজস্ব ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে মোট চারটি মাযহাব বা ফিকহী মতাদর্শ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এইসব মাযহাবের ইমামগণের ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু সূত্র বা মূলনীতি। এর ভিন্নতার প্রেক্ষাপটেই মাসআলার সিদ্ধান্তও ভিন্নতা পায়। সন্ধানী পাঠকগণ তাই ফিকহের মূলনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা জানতে আগ্রহী। এই প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যেই গবেষণা বিভাগ থেকে এই ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশাকরি গবেষক ও চিন্তাশীল পাঠকগণ এই বইয়ের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে সক্ষম হবেন।

বিশিষ্ট গবেষক ড. আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদারকে এই গ্রন্থটি প্রণয়নের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের কল্যাণকামী প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

ফিক্‌হ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশনার আলোকে গৃহীত বা প্রণীত আইনের সংকলন। ইসলামী আইনকে বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যাস করে ফিক্‌হ-এর গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট করা হয়। মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকে হাজারো প্রশ্ন থাকে, তারই উত্তর খোঁজা হয় ফিক্‌হ বা জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে। ইমাম আবু হানীফা (রহ) হচ্ছেন ফিক্‌হ শাস্ত্রের পথিকৃত। পরবর্তীতে আরও বহু পণ্ডিত তাঁদের ফিক্‌হচর্চার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমানে চারটি মাযহাব রয়েছে, যাদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অভিমত হচ্ছে যে, কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রকৃত নির্দেশনা এ চারটি মাযহাবেই আবর্তিত হচ্ছে। তারপরও অনুসন্ধিৎসু মন ফকীহগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি জানতে আগ্রহী থাকে। এতে শরীয়াতের উদ্দেশ্য, ফিক্‌হের মূলনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে বহু যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাওয়া যায়।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণা বিভাগ ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের ওপর "বিভিন্ন ফিক্‌হের তুলনামূলক পর্যালোচনা" নামে এ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশিষ্ট গবেষক ড. আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার বইটি প্রণয়ন করে দেবার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি আমাদের এ গ্রন্থটিও পাঠকদের নিকট সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের এ প্রয়াসকে কবূল করুন। আমীন !

লুৎফর রহমান সরকার
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

তুলনামূলক ফিকহ চর্চা

সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা আদায় করছি যিনি ফিকহ শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রত্যক্ষ জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে একটি শ্রেণীকে বিরত থেকে ফিকহ শিক্ষায় রত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ٠

"মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, ওদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীনের মধ্যে গভীর জ্ঞান চর্চায় রত থাকতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।" [সূরা আত-তাওবাহ : ১২২]

فَقِهَ অর্থ বোঝা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মভাবে বোঝা। আর تَفَقَّهَ অর্থ কোন কিছু পরিশ্রম করে অর্জন করা ও তাতে লেগে থাকা। সেমতে বাক্যের মর্ম হবে, "তারা যেন দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলা বাহুল্য, সালাত, সাওম, হজ্ব ও যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাকেই দ্বীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না। বরং দ্বীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে দলীল-প্রমাণসহ এমনভাবে বোঝা—যা তার মধ্যে এ উপলব্ধি সৃষ্টি করবে যে, এ সংক্রান্ত প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে আখিরাতে। দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে—মূলত এই চিন্তাই হলো দ্বীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফিক্‌হ'-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা হলো এই যে, "ফিকহ্ সে শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বুঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বুঝে নেয় যা থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরী।" বর্তমানে মাসআলা-মাসায়েলের জ্ঞানকেই যে 'ইলমে-ফিকহ' বলা হয় তা পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফিকহ্-এর তাৎপর্য তাই, যা ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন।

সত্যিকার ফিকহ অর্জন করতে হলে কুরআনের পরিভাষায় তা অর্জন করতে হবে। দ্বীন সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করা জরুরী। মামুলী মাসআলা-মাসায়েল জানার চেয়ে মাসআলা-মাসায়েলের উৎস ও দলীল-প্রমাণাদির জ্ঞানই অর্জন করতে

www.waytojannah.com

হবে। যাকে আল্লাহ্ এ জ্ঞান দিয়েছেন সেই সত্যিকারের কল্যাণ লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ ، وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى اَمْرِ اللّٰهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ ·

"আল্লাহ্ যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন, আমি তো কেবল বন্টনকারী আর আল্লাহ্ই হলেন প্রদানকারী, এ উম্মত সর্বদা আল্লাহ্র নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্র নির্দেশ আসে।" [বুখারী : ৭১]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, যতক্ষণ 'ফিকহ ফিদ্দ্বীন' থাকবে এবং উম্মতের একটি বিরাট অংশ ফিকহ্ চর্চায় রত থাকবে ততদিন এ দ্বীনের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

এ উম্মতের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসকে মূল ভিত্তি করে উম্মতের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ সাধন করে গেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল হক্ব জানা ও তা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের প্রচেষ্টার সওয়াব তাঁরা একগুণ বা দু'গুণ পাবেনই। তাঁদের মতামতের পক্ষে বা বিপক্ষে যে সমস্ত দলীল-প্রমাণ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক বিচার-বিশ্লেষণ করার মত গভীর পর্যালোচনামূলক কাজই তুলনামূলক ফিকহচর্চার উর্বর ক্ষেত্র। এ কাজটি করার প্রয়োজনীয়তা সর্বযুগেই পরিলক্ষিত হয়েছিল তবে আজকের বিশ্বায়নের যুগে তার প্রয়োজনীয়তা যে অনেক বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার পাশাপাশি এর ব্যাপকতা ও কষ্টসাধ্য হওয়াও লক্ষণীয়। কারণ ফিকহের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে ইতোমধ্যে আরবী ভাষায় অনেক বড় বড় বিশ্বকোষও তৈরি হয়েছে। আবার ফিকহ-এর অনেক পরিভাষার বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মন-মানস মোতাবেক সঠিক অনুবাদ করাও দুরূহ। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে এর গভীরে যাওয়ার জন্য যে সময় ও সাধ্য দরকার তার কতটুকু আমি করতে পেরেছি তা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। তবে আশার বিষয় এই যে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য গুরুত্বের সাথে এগিয়ে এসেছে। তাদের এ প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং মহান আল্লাহ্র কাছে এর জন্য দো'আ করছি।

ড. আবূ বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফিকহ্-এর সংজ্ঞা	১১
ফিকহ যুগে যুগে	১৭
রাসূলের যুগ	১৯
খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (১১-৪০ হি.)	২২
খোলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম পর্যন্ত (৪১-১১০ হি.)	২৫
দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত (১১০-৩৫০ হি.)	৩০
চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাগদাদের পতন পর্যন্ত (৩৫০-৬৫৬ হি.)	৩৫
বাগদাদের পতন থেকে উসমানীয় খিলাফতের পতন পর্যন্ত (৬৫৬-১২২৯ হি.)	৩৬
ফিকহে ইসলামীর বর্তমান যুগ (খিলাফতের পতনের পর থেকে আজ পর্যন্ত)	৩৭
ইজতিহাদ, তাকলীদ, তাফাররুদ	৪৪
বিভিন্ন ফিকহের পরিভাষা	৫২
ফিকহ্ এর মাদরাসাসমূহ, এর উৎপত্তি ও বিকাশ	৬৭
কুফা ভিত্তিক মাদরাসাসমূহ ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী	৬৭
কুফা ভিত্তিক প্রাথমিক মাদরাসাসমূহ ও তার বৈশিষ্ট্য	৬৭
পরবর্তী মাদরাসাসমূহ ও তার বৈশিষ্ট্য	৬৯
১) ইমাম আবূ হানিফা (র.) ও তাঁর ফিকহ্	৬৯
হিজায ভিত্তিক মাদরাসাসমূহ ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী	৭৪
তাবি'ঈদের মাদরাসাসমূহ	৭৪
তাবি'ঈ পরবর্তী মাদরাসাসমূহ	৭৬
১) ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহ	৭৬
২) ইমাম শাফে'য়ী ও তাঁর ফিকহ	৭৯
৩) ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ ও তাঁর ফিকহ	৮১
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মাদরাসাসমূহ	৮৪
যাহেরী ফিকহের মাদরাসা ও তার গতি-প্রকৃতি	৮৭
ফুকাহাদের ইখতিলাফ বা মতবিরোধের কারণসমূহ	৮৭
তুলনামূলক ফিকহ	১৭৭

www.waytojannah.com

Contents

তুলনামূলক ফিকহ-এর সংজ্ঞা ১৭৭
তুলনামূলক ফিকহ-এর বিষয়বস্তু ১৭৮
তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৮০
তুলনামূলক ফিকহ-এর ইতিহাস ১৮৪
প্রথম পর্যায় : প্রারম্ভিকতা ১৮৪
দ্বিতীয় পর্যায় : গ্রন্থ প্রণয়ন ১৮৫
তৃতীয় পর্যায় : স্বাধীন ও সঠিকভাবে মত প্রকাশ ১৮৮
চতুর্থ পর্যায় : স্থবিরতা ১৮৮
পঞ্চম পর্যায় : বর্তমান অবস্থা ১৮৯
তুলনামূলক ফিকহ চর্চার ক্ষেত্রে যা জানা প্রয়োজন ১৯১
তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের উপকারিতা ১৯২
তুলনামূলক ফিকহ আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী ১৯৪
তুলনামূলক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১৯৫
ত্বাহারাত বা পবিত্রতা অধ্যায় ১৯৬
ওযুতে নিয়্যত করার হুকুম ১৯৬
ওযুর ফরয ১৯৯
মাথা মাসেহ-এর পরিমাণ ২০৬
কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ ২০৯
পানিতে নাপাকি পড়ার পর যদি সে পানি পরিবর্তিত না হয় ২১৩
পানিতে পাক কিছু পড়ার পর যদি সে পানি পরিবর্তিত হয় ২১৩
পবিত্রতায় ব্যবহৃত হওয়ার পর সে পানির বিধান ২১৬
মানুষ ও গৃহপালিত চতুষ্পদ হালাল জন্তু ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পানীয়ের বিধান ২১৮
ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ ২২৩
শরীর থেকে নির্গত নাপাকির কারণে ওযু ভঙ্গ ২২৪
ঘুমের কারণে ওযু ভেঙ্গে যাওয়া ২২৭
নারী স্পর্শের কারণে ওযু ভঙ্গ ২৩১
গোপনাঙ্গ স্পর্শের কারণে ওযু ভেঙ্গে যাওয়া ২৩৫
উটের গোশত খাওয়ার কারণে ওযু ওয়াজিব হওয়া ২৩৮
নামাযে হাসির কারণে হেসে ফেলার পর ওযু সম্পর্কে ২৪০
লাশ বহনের ফলে ওযু ২৪২
তাওয়াফের জন্য ওযুর বিধান ২৪৩
ফরয গোসলের জন্য নিয়্যতের বিধান ২৪৫

www.waytojannah.com

ফরয গোসলের জন্য কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান ২৪৭
হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময় ২৫০
নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময় ২৫৩
মৃত জন্তুর চামড়া সংক্রান্ত বিধান ২৫৫

সালাত অধ্যায় ২৫৯
বিতর কি ওয়াজিব ২৫৯
সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান ২৬২
যোহরের সালাতের শেষ সময় ২৬৬
মাগরিবের সালাতের শেষ সময় ২৬৯
এশার সালাতের প্রথম ও শেষ সময় ২৭০
তাকবীরে তাহরীমার পরে 'তাওজীহ' ও সানা পাঠের বিধান ২৭৪
সালাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান ২৭৭
সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান ২৭৯
সালাতে কুরআনের শব্দ ছাড়া দো'আ করার বিধান ২৮২
সালাতে তাশাহ্হুদের বিধান ২৮৪
সালাতের শেষে সালামের বিধান ২৮৭
সালাতে হাত উঠানোর বিধান ২৮৯
সালাতের বৈঠকে বসার নিয়ম ২৯১
সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত রাখার স্থান ও তার বিধান ২৯৪
একাকী সালাত আদায়ের পরে জামাত হলে একাকী সালাত আদায়কারী কী করবে? ২৯৭
ইমামকে লোকমা দেয়ার বিধান ৩০০
ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ৩০২
কাতারের পিছনে এক কাতারে একজন দাঁড়ানোর বিধান ৩০৩
বসে সালাত আদায়কারী ইমামের পিছনে মুক্তাদি সালাত বসে পড়বে না দাঁড়িয়ে ৩০৬
পরিশিষ্ট ৩০৯
গ্রন্থপঞ্জি ৩১২

www.waytojannah.com

ফিকহ্-এর সংজ্ঞা

আভিধানিক

ফিকহ্ শব্দটি আরবী। এটি بَاب سَمِعَ ও بَاب كَرُمَ এই দুই বাব হতে ব্যবহৃত হয়।

❖ بَاب سَمِعَ থেকে। যেমন বলা হয় فَقِهَ فِقْهًا। তখন এর দুটি অর্থ হয়।

১. জ্ঞান।[১]

২. সূক্ষ্ম জ্ঞান বা সূক্ষ্ম বুঝ।[২] যেমন আল্লাহ্ বলেন :

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۔

"তারা বলল, 'হে শু'আইব! তুমি যা বল তার অনেক কথাই আমাদের বোধগম্য নয় এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজন-বর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মারতাম, আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।'"[৩]

নিঃসন্দেহে তারা শু'আইব আলাইহিস্ সালামের কথা বুঝত; কারণ তিনি তাদের ভাষাভাষী তাদের গোত্রের সবচেয়ে বাগ্মী লোক ছিলেন। কিন্তু তারা তার কথার মর্মার্থ বুঝতে, গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাইত না বলেই না বোঝার ঘোষণা দিয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে 'ফিক্হ' শব্দটি বিভিন্নভাবে বিশটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪]

---

১. অধিকাংশ অভিধানবিদ এ অর্থটি উল্লেখ করেছেন। ইবন মানযূর, লিসানুল আরব, ১৩/৫২২, আয-যাবিদী, তাজুল আরুস, পৃ. ৬৫৩৫, ৮২৩৩, ইবনে ফারেস, মু'জামু মাকায়িসুল লুগাহ, ৪/৪৪২।

২. যামাখশারী, আসাসুল বালাগাহ, ১/৩৫৬; খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদি: আল-আইন, ৩/৩৭০; ইবন ফারেস, মু'জামু মাকায়িসুল লুগাহ, ৪/৪৪২; আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ.৬৯৮।

৩. সূরা হূদ: ৯১।

৪. সূরা আন-নিসা : ৭৮, আল-আন'আম : ২৫, ৬৫, ৯৮, আল-আ'রাফ : ১৭৯, আল-আনফাল: ৬৫, আত-তাওবাহ : ৮৭, ১২২, ১২৭, হূদ : ৯১, আল-ইসরা : ৪৪, ৪৬, আল-কাহাফ : ৫৭, ত্বাহা : ২৮, আল-ফাতহ : ১৫, আল-হাশর : ১৩, আল-মুনাফিকূন : ৩, ৭।

www.waytojannah.com

তার প্রায় সব কয়টিতেই[৫] الفهم الدقيق বা গভীর জ্ঞান বা সূক্ষ্ম বুঝ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৬]

অনুরূপভাবে হাদীসের বিভিন্ন ভাষ্যেও এ শব্দটি উপরোক্ত গভীর জ্ঞান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে যেমন, হাদীস من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে তাঁর দ্বীনের মধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।"[৭] হাদীসের অধিকাংশ স্থানেই আমরা এ শব্দটিকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্থেই ব্যবহৃত হতে দেখি। আবূ হিলাল আসকারী বলেন, ইলম ও ফিকহ-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, কোন বাক্য চিন্তা-ভাবনা করে সে অনুসারে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাই ফিকহ। আর সে জন্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে 'ফকীহ' বলা হয় না। কারণ, তাঁকে চিন্তা-ভাবনা করে বলতে হয় না। আর তুমি কাউকে تفقه ما أقول একথা ঐ সময়ই বল যখন তুমি তার কাছে এটা চাও যে তুমি যা বলছ তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুক।[৮]

এর কারণ হচ্ছে এ শব্দটি মৌলিকভাবে দু'টি অর্থ ধারণ করে,

এক. شق বা ব্যুৎপত্তিগত বিদারণ। দুই. فتح বা উন্মোচন।[৯] এ দুটি অর্থই এটা দাবি করে যে, ফিকহ কোন সাধারণ জ্ঞান নয় বরং যে জ্ঞান অর্জিত হলে কোন বস্তুর ব্যুৎপত্তি সুনির্ধারিত হবে এবং যা অর্জিত হলে কোন বস্তুর উপরে বর্তমান অজ্ঞানতার আবরণ থেকে তা মুক্ত হবে তা-ই ফিকহ। সে হিসেবে ফকীহ হচ্ছেন এমন 'আলিম, যিনি চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে আইনের তত্ত্ব উন্মোচন করেন এবং তার প্রকৃত তাৎপর্যগুলো অনুসন্ধান করেন এবং অবোধগম্য ও জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেন।[১০]

❖ আর باب كرم হতে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফকীহ হওয়া। যেমন বলা হয় قد فقه فقاهة وهو فقيه، أي أصبح الفقه سجيته। অর্থাৎ ফিকহ তার প্রকৃতিতে পরিণত

---

৫. যে আয়াতটি সম্পর্কে বলা হয় যে, সেটি সাধারণ বোঝার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, يَفْقَهُوا قَوْلِي সূরা ত্বা-হা: ২৮। মূলত এখানেও মূসা আলাইহিস্ সালামের উদ্দেশ্য তার কথার প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারা। সুতরাং এটিও সূক্ষ্ম ও গভীর বুঝ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৬ মুহাম্মাদ রশীদ রেজা, তাফসীরুল মানার, ৯/৩৫২।

৭. বুখারী, হাদীস নং ৭১।

৮. আল-আসকারী, আবূ হিলাল, মু'জামুল ফুরুকুল লুগাওয়িয়্যাহ, ৪১২।

৯. যামাখশারী, আল-ফায়িক, ১/৩৫০; ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ, ৩/৭৭৪; ইবন মানযূর, লিসানুল আরব, ১৩/৫২২; আয-যাবিদী, তাজুল আরূস, পৃ. ৬৫৩৫, ৮২৩৩, ইবন ফারেস, মু'জামু মাকায়িসুল লুগাহ, ৪/৪৪২; আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ.৬৯৮।

১০. ইমাম গাযালী, ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/২৮।

www.waytojannah.com

হয়েছে। এটা এ কারণেই যে, بَابُ كَــرُمَ এর বিশেষত্বই হলো, এখানে ব্যবহৃত শব্দগুলো প্রকৃতিগত বা মজ্জাগত হওয়ার অর্থ প্রদান করে। এ অর্থে এক হাদীসে এসেছে, ذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم"[11] "সেটা হলো ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীনের 'ফিক্হ্' যার মজ্জায় পরিণত হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা তার জন্য উপকারী হয়েছে। ফলে সে তা জেনেছে এবং অপরকে জানিয়েছে।"

❖ কোন কোন আলিম এ শব্দটিকে بَابُ فَتَحَ ব্যবহৃত হয় বলেও মত দিয়েছেন। তাঁদের মতে, তখন এর অর্থ হবে, سَبَقَ غَيْرَهُ إِلَى الْفَهْمِ বা অবগত বা বোঝার ক্ষেত্রে সে অন্যের তুলনায় অগ্রগামী হয়েছে।[12]

পারিভাষিক

পরিভাষায় 'ফিক্হ' কাকে বলা হয় সে ব্যাপারে কয়েকটি সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

❖ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে শরী'আতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্হ বলা হয়।[13]

❖ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية ❖

শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।[14]

❖ العلم بالأحكام الشرعية العملية الفرعية من أدلتها التفصيلية

শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।[15]

---

১১. বুখারী, হাদীস নং ৭৯; মুসলিম, হাদীস নং ২২৮২।

১২. খাইরুদ্দীন রামলী, মিনহাতুল খালিক আলাল বাহরির রায়িক, ১/১৪; ইবন আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার, ১/৩৮; শারওয়ানী, হাশিয়া আলাল মিনহাজ, ১/২০; শারহুল বাহজাহ, ১/৮; ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, ১/১২১। তবে এ অর্থটি কোন অভিধান গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি।

১৩. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ১/১১৮।

১৪. আল-মাহাল্লী, জামউল জাওয়ামি'উ, ১/৩২, জামালুদ্দিন আল-ইসনাওয়ী, শারহু জামউল জাওয়ামেউ, ১/২৪; আদদুদ্দিন আল-ঈজী: শারহু মুখতাসারু ইবনিল হাজেব, ১/১৮, ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/১৬।

১৫. ইবনে কাশেম, আল-বাহরুয যাখখার, ২/১১৫।

www.waytojannah.com

মূলত উপরোক্ত মতভেদের কারণ হচ্ছে, 'ফিকহ' শব্দটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, উসুলে ফিকহের দৃষ্টিতে 'ফিকহ' শব্দটির অর্থ তিনটি স্তর অতিক্রম করেছে,

এক. যখন 'ফিকহ' শব্দটি 'শরীয়ত' অর্থেই ব্যবহৃত হত, তখন 'ফিকহ' বলতে বোঝাত 'যা আল্লাহ্ তা'আলা থেকে এসেছে। চাই তা বিশ্বাসগত দিক বা চারিত্রিক দিক বা কর্মকাণ্ডগত দিক যাই হোক না কেন। আর এ অর্থেই ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, هو معرفة النفس ما لها وما عليها

অর্থাৎ ফিকহ হচ্ছে কোন নাফসের জন্যে কোন্‌টি তার পক্ষে উপকারী হবে আর কোন্‌টি তার জন্য অপকারী হবে সেটা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া।[১৬] মূলত এটা ছিল প্রাথমিক যুগ, যখন 'ফিকহ'-এর বর্তমান পরিভাষা নির্ধারিত হয়নি। আর এজন্যই ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ তাঁর আকীদা বিষয়ক গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন, 'আল-ফিকহুল আকবার'।

দুই. যখন 'ফিক্‌হ' শব্দের ব্যাপক অর্থে কিছুটা বিশেষত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে, তখন আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদি 'ফিক্‌হ' পরিভাষা থেকে আলাদা করে 'ইলমুত তাওহীদ, ইলমুল আকায়েদ, আস-সুন্নাহ বা ইলমুল কালাম নামে খ্যাত হয়ে পড়ে। সে সময় 'ফিক্‌হ' বলতে বোঝাত, العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية

এখানে الفرعية বলে ما سوى الأصلية التى هى العقائد বা মৌলিক বিষয়াদি তথা আকায়েদ বিষয়ক আলোচনাকে বাইরে রাখা হয়েছে। তবে এ সংজ্ঞার মধ্যে শরীয়তের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডগত দিক যেমন রয়েছে, তেমনি আন্তরিক ও চারিত্রিক কর্মকাণ্ডগত দিকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিন. যখন 'ফিকহ'-এর পরিভাষা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। বর্তমানে যে পরিভাষা সবচেয়ে বহুল প্রচলিত তা হলো, هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية অথবা, علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية[১৭]

এ সংজ্ঞা আগের সংজ্ঞার চেয়েও সংকীর্ণ। এর মাধ্যমে পূর্বোক্ত 'ফিকহ' পরিভাষা থেকে 'চারিত্রিক দিক' বের হয়ে যায়। কারণ তা 'ইলমুল আখলাক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

---

১৬. ইবনে নুজাইম, বাহরুর রায়িক, ১/৯; ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার, ১/১৫৩।

১৭. তাসকুবরা যাদাহ, মিফতাহুস সা'আদাহ, ২/১৭৩।

www.waytojannah.com

মোটকথা, 'ফিকহ'-এর বর্তমান পরিভাষা অনুসারে যে সমস্ত বিষয় এতে প্রবেশ করবে না তা হচ্ছে :

১. আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদি। যেমন, আল্লাহ্র নাম ও গুণ, ফিরিশতা সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান, ইত্যাদি।

২. চারিত্রিক বিষয়সমূহ। যেমন, ভদ্রতা, নম্রতা, ক্ষমা ইত্যাদি।

৩. বিবেক-বুদ্ধিপ্রসূত বিষয়াদি। যেমন, দুই আর দুই যোগ করলে চার হবে, ইত্যাদি।

৪. আন্তরিক অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি। যেমন, হিংসা, বিদ্বেষ হারাম হওয়া সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৫. শরীয়তের মৌলিক নীতিমালাসমূহ। যেমন, 'খবরে ওয়াহিদ' বা 'দু একজনের দেয়া সংবাদ' মেনে নেয়া ওয়াজিব হওয়া, কিয়াস দলীল হওয়া সংক্রান্ত নীতিমালা, ইত্যাদি।

৬. যে সমস্ত জ্ঞান প্রচেষ্টালব্ধ নয়, যেমন জিবরীলের জ্ঞান, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওহী সংক্রান্ত জ্ঞান। কারণ এগুলো গবেষণালব্ধ নয়।

৭. শরীয়তের যা জানা অত্যাবশ্যক। যেমন, সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি ফরয হওয়া। কারণ, এগুলো গবেষণালব্ধ নয়।

৮. যা কারও তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে জানা যায়। কারণ, তা গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়।

এ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে, উসুলে ফিকহের দৃষ্টিতে যার গবেষণা করার যোগ্যতা নেই সে ফকীহ হিসেবে ঘোষিত হওয়ার যোগ্য নয়।

পক্ষান্তরে ফকীহগণ 'ফিকহ' শব্দটিকে দু'টি অর্থে ব্যবহার করেছেন,

এক.

حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة فى الكتاب أوالسنة أو وقع الإجماع عليها ، أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا أو بأى دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلة سواء احفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها .

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা গ্রহণযোগ্য কিয়াস অথবা এ জাতীয় অন্যান্য দলিলের উপর ভিত্তি করে শরী'আতের যে সমস্ত কার্যগত বিধি-বিধান নির্ধারিত হয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রপ্ত করা। চাই সেগুলো দলীল সহ রপ্ত করুক বা দলীল ব্যতীত।

Contents

এতে বোঝা গেল যে, তাঁরা ফকীহ হওয়ার জন্য উসূলবিদদের মত মুজতাহিদ বা গবেষণা করার ক্ষমতা থাকার শর্ত আরোপ করেন না। তবে কি পরিমাণ বিধি-বিধান জানলে 'ফকীহ' বলা যাবে সেটা নিয়ে বিভিন্ন মতামত থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা 'উরফ' এর উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

দুই.

الفقه يطلق على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية

'ফিকহ' বলতে শরী'আতের কার্যগত কিছু বিধি-বিধান ও মাসআলা মাসায়েলকেই বোঝায়।

মোটকথা, 'ফিকহ' এমন একটি বিদ্যার নাম যার মাধ্যমে শরীয়তের উৎস থেকে দ্বীনের বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসাইল অবগত হওয়া যায় এবং যার দ্বারা বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের শরী'আতসম্মত সমাধান ও উত্তর খুঁজে বের করা যায়। আবার কখনও কখনও সে সমস্ত বিধি-বিধান, মাসআলা-মাসাইল, সমাধান ও উত্তরকেও ব্যাপকার্থে 'ফিকহ' বলা হয়।

ফিকহ্ যুগে যুগে

ফিকহের ইতিহাস বর্ণনায় গবেষকগণ এর বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করে ফিকহকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তারা বিভক্তির ব্যাপারে একমত হলেও তার পদ্ধতি ও পর্যায়ের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন।

❖ তাদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষের জীবনের সাথে তুলনা করে তিনভাগে ভাগ করেছেন। এক. উৎপত্তি। দুই. বিকাশ। তিন. অবনতি। কিন্তু গবেষকদের অনেকের নিকটই এ ভাগটি খুব বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কারণ, মানুষের জীবনের সাথে জ্ঞানের বিষয়ের তুলনা চলে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره "আমার উম্মতের উদাহরণ হচ্ছে বৃষ্টির মত, জানা যায় না তার প্রথম অংশ অধিক কল্যাণের হবে, না তার শেষাংশ।"[১৮]

❖ আবার অনেকে চারভাগে ভাগ করেছেন। এক. উৎপত্তি। নবুওয়তের শুরু থেকে রাসূল (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত। সর্বমোট ২২ বছর কয়েক মাস। দুই. সাহাবা ও তাবেয়ীদের মধ্যকার প্রবীণদের যুগ। তাদের নিকট সেটি ১১ হিজরী থেকে ১১০ পর্যন্ত। কারণ; সর্বশেষ সাহাবী আবুত তুফাইল আল-আমেরীর মৃত্যু হয়েছিল ১১০ হিজরী সনে। তিন. পূর্ণতা ও পরিপক্কতার যুগ। আর তা চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চার. বৃদ্ধাবস্থা। আর তা হচ্ছে তাকলীদের যুগ।[১৯] কিন্তু তাদের উপরোক্ত ভাগও অনেক গবেষকের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। যার কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

❖ আবার অনেকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এক. উৎপত্তি যুগ। আর তা রাসূল (সা)-এর যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট। দুই. নির্মাণ যুগ। আর তা সাহাবা ও তাবিঈদের যুগ নিয়ে গঠিত। যার ব্যাপ্তি ছিল হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত। তিন. পূর্ণতা ও পরিপক্কতার যুগ। আর তা চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চার. মাযহাব ও তাকলীদের প্রসারের যুগ, যা চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে

১৮. তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৬৯।

১৯. মুহাম্মাদ ইবন হাসান আল-হাজাওয়ী, আল-ফিকরুস সামী, ১/১।

www.waytojannah.com

শুরু করে প্রথমে বাগদাদের ধ্বংস পর্যন্ত। তারপর 'মাজাল্লাতুল আদলিয়া'-এর রচনা পর্যন্ত। পাঁচ. ফিকহের পুনর্জাগরণের যুগ, যা তুরস্কে 'মাজাল্লাতুল আদলিয়া' রচনার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।[২০]

❖ তবে অনেক গবেষকই মৌলিকভাবে ফিকহের বিভিন্ন পর্যায় বিবেচনা করে ফিকহের বিভিন্ন যুগকে সর্বমোট ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। তারাও আবার এ ভাগ বিন্যাসে মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ[২১] ছয়টি স্তরকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

১. নবী যুগ।

২. খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগ।

৩. তাবিঈদের যুগ।

৪. ইমাম চতুষ্টয়ের যুগ।

৫. স্থবিরতা ও ইজতিহাদ বন্ধের ঘোষণার যুগ।

৬. বর্তমান যুগ বা সংস্কার যুগ।

আবার কেউ কেউ সে ছয়টি স্তর বিন্যাস নিম্নোক্তভাবে করেছেনঃ

১. নবী যুগ। ১১ হিজরী পর্যন্ত

২. খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগ। (১১-৪০ হি.)

৩. খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগের পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত (৪১-১০১ বা ১১০ হি.)

৪. দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (১০১ বা ১১০-৩৫০ হি.)

৫. চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাগদাদের পতন পর্যন্ত (৩৫০-৬৫৬ হি.)

৬. বাগদাদের ধ্বংস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত (৬৫৬-১৪৩০ হি.)

❖ উপরোক্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে আমরা ফিকহে ইসলামীর একটি সার্বিক স্তরবিন্যাস করতে পারি, যাতে ফিকহের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনায় আনা হয়েছে :

১. রাসূলের যুগ (নবুওয়ত প্রাপ্তির সময় থেকে রাসূল (সা)-এর ওফাতের সময় পর্যন্ত)। (৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩২/৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ বা হিজরী ১০ বা ১১ সাল পর্যন্ত।

---

২০. ড. বাদরান আবুল আইনাইন বাদরান, তারীখুল ফিকহিল ইসলামী ও নাযরিয়াতুল মিলকিয়াতি ওয়াল উকুদ, পৃ. ৩৫।

২১. ড. হুসাইন হামিদ হাসান।

www.waytojannah.com

Contents

২. খোলাফায়ে রাশিদীনের (চার খলিফার যুগ তথা হিজরী ১১ থেকে ৪০ পর্যন্ত)।

৩. খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগের পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত (৪১-১১০ হি.)

৪. দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (১১০-৩৫০ হি.)

৫. চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তাতারীদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত (৩৫০-৬৫৬ হি.)

৬. বাগদাদের ধ্বংস থেকে 'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়া'-এর রচনা পর্যন্ত (৬৫৬-১২৮৬ হি.)।[২২]

৭. 'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়া' রচনার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত (১২৮৬ হি.-১৪৩০ হি.)। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা ফিকহে ইসলামীর এ সাতটি পর্যায়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রথম যুগ

রাসূল (সা)-এর যুগ

(৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ বা হিজরী ১১তম সাল পর্যন্ত)

এ যুগটি মূলত 'তাশরী' বা শরীয়ত প্রবর্তনের যুগ। এতেই শরীয়ত প্রবর্তিত হয়েছিল। এরপর আর 'তাশরী' এর কোন সুযোগ অবশিষ্ট নেই। এ যুগের শুরু হয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে। আর শেষ হয় একাদশ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের মধ্য দিয়ে। এ সময়ের যাবতীয় বিষয়ই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফাতাওয়া ফারাইয, দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। সে সময় স্বতন্ত্র ফিক্হ শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত ফয়সালা ও আইন কানুনগুলো আলোচিত এবং অনুসৃত হত অবশ্যই, কিন্তু যথারীতি সংকলিত হয়নি। তৎকালীন জীবন যাত্রার প্রয়োজন সীমিত হবার কারণে এর তেমন প্রয়োজনও ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল ছিল মানব জীবনের মৌল শক্তি ও গুণাবলীকে বিকশিত করার এবং ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার

---

২২. এ সময়কে আবার তুর্কী খিলাফত বিলুপ্তি ঘোষণা পর্যন্ত প্রলম্বিত করলে দাঁড়ায় ৬৫৬ হি. থেকে ১৩৪৩ হি. বা ১৯২৪ খ্রি. পর্যন্ত।

www.waytojannah.com

যুগ। তদুপরি তাদের উপর আরোপিত ছিল কঠোর জিহাদের দায়িত্ব-সংযমের জিহাদ, প্রচারের জিহাদ, আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র জিহাদ। অন্যপক্ষে তখন লেখাপড়ার চর্চাও ছিল সীমিত। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম কুরআন মাজীদের আয়াতের অনুলিপি রাখতেই কেবল নির্দেশিত হতেন। একটি সৎ, সরল ও অনাড়ম্বর সমাজ জীবনের যে সব প্রশ্ন ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হতে পারে, সেগুলির বিশ্লেষণের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই শিক্ষা বাস্তবায়নের মধ্যে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফয়সালা লিখে রাখার গরয তাঁরা অনুভব করলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে তাঁদেরকে প্রথমে নিষেধ করেছিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী ছিল جوامع الكلم বা স্বল্প অথচ বিস্তৃত অর্থের সমাহারসম্পন্ন বাক্য, যা অনেকটাই কুরআনের বাণীর সাথে মিল হয়ে যেতে পারত। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যখন কুরআন ও রাসূলের বাণী বা হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায়, তখন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ফয়সালাগুলোকে লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ব্যাপক ছিল না।[২৩] সাহাবায়ে কিরাম সেগুলোকে মুখস্থ রাখা ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং সে দায়িত্ব যথারীতি পালন করেছিলেন।

এ যুগে ফিকহের উৎস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ফিকহের মাত্র দুটি উৎস ছিল। ১. কুরআন, ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস। উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করতেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কুরআনিক বিধান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কোন দ্বিমতের অবতারণা হতো না। এমনিভাবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি এবং বিরোধের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখা দিত না। কুরআন মাজীদে ফিক্‌হের যে সমাধান পেশ করা হয়েছে, এর কতকগুলো তো এমন যা সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসিদ আমল এবং বাতিল চিন্তা-ভাবনার মূলোৎপাটনের নিমিত্তে নাযিল করা হয়েছে, আবার কতক এমন যা কারো প্রশ্নের জবাবে নাযিল করা হয়েছে। আবার কতক আয়াত এমনও আছে, যা কারো প্রশ্নের জবাবে নয় বরং এমনিই নাযিল হয়েছে। তাছাড়া

২৩. এ ব্যাপারে খতীব আল-বাগদাদী লিখিত তাকয়ীদুল ইলম (দারুল কলম, দামেশক হতে প্রকাশিত) গ্রন্থটিতে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

পবিত্র কুরআনে মূলনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিধান ব্যতীতও একটি সৎ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও সমস্যাবলীও আলোচিত হয়েছে। যখন যেসব প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেই অনুযায়ী কুরআনী বিধানও নাযিল হয়েছে। এই সঙ্গে বিপদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যও বিধান এসেছে। যখন যেসব ওহী নাযিল হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—বাচনিক। খুব জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি।

মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজগুলি ছিল নিম্নরূপ :

১. আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা দেওয়া

২. আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দান। হিকমত শিক্ষাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. উম্মতের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারিত ছিল না। প্রদত্ত বিধি-বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য এতই প্রভাবশীল ছিল যে, তাঁর অনুকরণে সমাজ জীবনের সমস্ত কাঠামোই পুরোপুরি বদলে যেতো।

৪. সমষ্টিগত জীবনের এমন প্রশিক্ষণ দান করা, যাতে জীবন পথের প্রতিটি মোড় ও প্রতিটি অবস্থান অতিক্রম করে ইসলামী কার্যক্রম অনবরত এগিয়ে যেতে পারে।

৫. এমন একটি জামা'আত গঠন করা, যাতে নবুয়াতের অবসানের পর নবুয়াতের দায়িত্ব নবুয়াতেরই নকশা অনুয়ায়ী সম্পন্ন করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে ঠিক তখনই বিদায় নিলেন, যখন ইসলামের বুনিয়াদ সব দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। একদিকে তিনি ইসলামী আইনের ভবিষ্যৎ সংকলনের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে পূর্ণ একটি কাঠামো তৈরি করে দেন এবং অন্যদিকে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তীদের জন্য কার্যকর পন্থা সৃষ্টি করে যান।

অন্যপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর কর্ম ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে তাঁরা যে কুরআন তা'লীম পেতেন তা মুখস্থ করা, বোঝা ও 'আমল করা। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু-আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাচনিক ও কর্মমূলক ব্যাখ্যাসমূহ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতেন। এ ছাড়া আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনমূলক বিশেষ হিদায়াতসমূহকে তাঁরা মনেপ্রাণে অনুধাবন করতেন।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় যুগ

খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগ (১১-৪০ হি.)

রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব

বহুসংখ্যক বিজয় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবনধারার মুখোমুখী হবার কারণে এই যুগে নতুন নতুন বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। অবস্থা ও যুগের দাবির প্রেক্ষিতে সমস্যাবলী সমাধানের নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথম যুগের যে বিধান-সমষ্টি মনের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত এবং বাস্তবে কার্যকর ছিল, সমকালীন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তার সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিল এবং তারা সেই সম্প্রসারণ এমনভাবে করলো যাতে অন্য কোন উৎস থেকে আলো ধার করার প্রয়োজন হল না।

ইজমা' ও রায়

এ যুগে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে দুটো প্রক্রিয়ার ব্যবহার শুরু হয়। এ দুটি হচ্ছে : (১) ইজমা ও (২) রায় (যথাক্রমে ফকীহদের সম্মিলিত মত এবং তাঁদের ব্যক্তিগত মত)। এ দু'টিকে কাজে লাগানোর প্রেরণা কুরআন ও সুন্নায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর পরবর্তী কালের লোকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই সংগে যতদূর সম্ভব যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের বাইরে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুরআন ও সুন্নায় কোন উদ্ভূত বিষয়ে ফয়সালা না পাওয়া গেলে তাঁদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে যে ফয়সালা গৃহীত হয়ে যেত, তা আইনের মর্যাদা লাভ করতে থাকে। অবশ্য ফকীহদের 'রায়' প্রদান এবং গ্রহণের ব্যাপারে ফিকহের বিধি-বিধান শরীয়তের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহের আওতাধীনেই রায় অর্থাৎ সুযোগ্য ফকীহদের সুচিন্তিত ও ইজতিহাদ প্রসূত অভিমতের ব্যবহার হতো। যে বে-পরওয়া ব্যক্তিগত মত বা রায় ইসলামের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতির উপর আঘাত হানতো তা প্রত্যাখ্যান করা হতো।

কুরআন ও সুন্নাহর আইনের উৎস রূপে ইজমা এবং রায় যুক্ত হলেও এ যুগের ফিকহের উপজীব্য ছিল বাস্তবতানির্ভর ও ঘটনাভিত্তিক। যখন যে প্রয়োজন দেখা দিতো অথবা সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধানের দাবি করতো, কেবলমাত্র তারই সমাধান পেশ করা হতো। পরবর্তীকালে যেসব সমস্যা ও ঘটনার উদ্ভব হতে পারে সেগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মত ফুরসত তাঁদের ছিল না।

www.waytojannah.com

সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ

কতিপয় ব্যাপারে এ যুগে সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, কারণ :

১. কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ, যাতে বিধান দানেও মতপার্থক্য ঘটে কয়েকটি অবস্থায় কুরআনের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য দেখা দিত : (ক) দ্ব্যর্থবোধক আরবী শব্দের ব্যবহার, যেমন قروء (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের 'ইদ্দত (عدة) সম্পর্কে ব্যবহৃত)। শব্দটিকে কোন কোন সাহাবী হায়েয حيض (ঋতুকাল) অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং অন্যেরা একে গ্রহণ করেছেন طهر (পরিচ্ছন্ন অবস্থার) অর্থে। (খ) আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহের অবতারণা থাকলে যথাঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দত যে আয়াতে চারমাস দশ দিন বলা হয়েছে, সে আয়াতটির অর্থ ব্যাপক। ফলে গর্ভবতী নারীর স্বামীর মৃত্যুতেও ইদ্দতের একই বিধান বলে অনুমিত হয়। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারী সম্পর্কিত আয়াতের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার ইদ্দত নির্দেশ করা হয়েছে। গর্ভবতী নারীর স্বামী মারা গেলে সে কোন্ আয়াতের আওতাধীন হবে? তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন হবে? না সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত? কোনো কোনো সাহাবী প্রথম আয়াতটি অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন, কেউ দিয়েছেন দ্বিতীয় আয়াত অনুযায়ী। (গ) স্থান ও কাল নির্ধারণের ব্যাপারে মতবিরোধ। অন্য সাহাবীদের সাথে 'উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর অধিকাংশ মতবিরোধ এই কারণেই হয়েছে।

২. কোন হাদীস সম্পর্কে কতিপয় সাহাবীর অনবহিত থাকার কারণে ফতোয়ার বিভিন্নতা। সাধারণভাবে হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের জানা ছিল কিংবা এ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 'আমল লোকদের সামনে ছিল। আবার কতিপয় হাদীস সম্বন্ধে বহু সাহাবী অনবহিত ছিলেন এবং এ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলও ছিল অল্প কয়েকজন সাহাবীর জ্ঞাত, অন্যেরা ছিলেন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। কারণ সাধারণভাবে হাদীস বর্ণনা করার রেওয়াজ তখন ছিল না। গ্রন্থাকারে হাদীস লিপিবদ্ধও ছিল না।

৩. কোন হাদীস যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে সূত্রটি নির্ভরযোগ্য কি-না, এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে ফতোয়ার মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেয়।

৪. 'রায়' দানের ব্যাপারে মতবিরোধ। সাহাবীগণ 'রায়' প্রদান করার ক্ষেত্রে "মাসালিহ" (مصالح তথা জনকল্যাণ), দীনের মূলনীতি ও ফিকহের প্রাণ তথা হিকমত-এ সবই দৃষ্টিপথে রেখেছিলেন। তাঁদের আমলে ফিকহের নিয়ম-কানুন রচিত বা বিধিবদ্ধ

www.waytojannah.com

Contents

হয়নি। বিধান দানের ব্যাপারে استحسان (যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও জনকল্যাণের বিবেচনা) এবং استصلاح (অবস্থা দৃষ্টে কল্যাণকামিতা)-এর নীতি গ্রহণের প্রমাণ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর আমলেও পাওয়া যায়। যদিও তাঁরা শরীয়তের বিভিন্ন বিধানের স্থান-কাল নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং নবুয়তের প্রকৃতির সাথে পরিচিতির মাধ্যমে শরী'আতের ব্যবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন; তবুও সকল সাহাবা একই দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাসালিহ' তথা সার্বিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেবেন এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা দিত, ফলে ফতোয়ার মধ্যেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হতো। ফিকহ ছিল ঘটনাভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী, তাই মতবিরোধ ছিল সীমাবদ্ধ। অন্যপক্ষে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিশ্চয়তা অর্জন করার পর যে সমস্যার সমাধান করা হতো তার মধ্যে মতবিরোধের অবকাশই থাকতো না।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা ফকীহ এবং গভীর জ্ঞানীদের নাম নিচে দেয়া হলো :

আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবূ মূসা আশ'আরী, মু'আয ইবন জাবাল, উবাই ইবন কা'আব এবং যায়দ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম।

মুসলিম জামা'আতের বিভক্তি

এ যুগে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম জামা'আতের তিনটি ভাগে বিভক্তি ফিকহের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। দলগুলো হচ্ছে :

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ, যারা হাসান (রা)-এর পর আমীর মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফত মেনে নিয়েছিল। তাদের অপর নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'।

২. শী'আ সম্প্রদায়, যাদের বিশ্বাস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন খিলাফতের বৈধ অধিকারী এবং খিলাফত অবশ্যই আহলে বায়ত (أهل بيت) তথা নবী পরিবারের সদস্য-দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৩. খারিজী সম্প্রদায়, যারা উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ তিন জনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো।

মতবিরোধ রাজনৈতিক বা যে ধরনেরই হোক না কেন, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বপক্ষীয়দের রেওয়ায়েত ও 'রায়' অধিকতর গুরুত্ব পেতে থাকলো, ফলে ফতোয়ায় বিভিন্নতা দেখা দিল।

www.waytojannah.com

তৃতীয় যুগ

খোলাফায়ে রাশিদীনের পর থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম পর্যন্ত (৪১-১১০ হি. পর্যন্ত) (বয়োকনিষ্ঠ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম ও তাবিঈগণের আমল তথা হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত)।

ফিকহ্ সংকলনের ভিত্তিস্থাপন

এ যুগটি আমীর মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শাসনামল ৪১ হিজরী সন থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ফিকহের সংকলন, বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করার সমস্ত মালমসলা এ যুগেই তৈরি হয়। এজন্য একে ফিকহের বিন্যাস ও গ্রন্থনার ভিত্তি যুগ বলাই সংগত।

এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ফিকহের উপরও বিস্তার করে :

১. ফেরকাবাজির দরুন প্রত্যেক ফেরকার প্রবণতা হল, কোন কোন পর্যায়ে দলীয় লোকদের রেওয়ায়েত ও রায়কে অগ্রাধিকার দান করা।

২. কেন্দ্রের প্রতি আগের মতো আকর্ষণ না থাকার কারণে এই সংগে ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তাগিদে 'উলামা ও ফকীহগণ বিভিন্ন বিজিত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তথায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের শিক্ষায় তাবিঈদের একটি নতুন প্রজন্ম যোগ্যতার মাপকাঠিতে সাহাবীদের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত প্রমাণিত হয়। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো তাবিঈ যথাযথই বিধান উদ্ভাবন ও ফতোয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সাহাবীগণের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

৩. হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণ শিক্ষারীতি ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে থাকে। সাহাবীদের যুগে এ কাজটি কতকটা সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিধানগুলো তখন লোকদের সামনে বাস্তব কর্মরূপে মূর্ত ছিল, তাই হাদীস বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু এখন রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ ও জীবনধারা, যা সাহাবীগণ নিজেদের জীবনে চিত্রায়িত করে রেখেছিলেন, শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে যত ব্যাপকভাবে সম্ভব প্রচলিত করাই ছিল শরী'আতের কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার একমাত্র পথ। কাজেই সাহাবীগণ নিজেদের জ্ঞাত সমস্ত হাদীস এবং নিজেদের পবিত্র জীবন ধারা তাবে'য়ীদের হাতে সমর্পণ করেন। রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তর্ধানের পর তাদেরকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সমাধান দিতে হয়েছিল তথা খোলাফায়ে রাশেদীনের

www.waytojannah.com

আমলে মুসলিম মিল্লাত যেসব আকীদা এবং অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম সে সবই তাবে'য়ীদের সামনে তুলে ধরেন।

৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আজমী (عجمى বা অনারব) লোকদের একটি বিরাট দল তৈরি হয়। তাঁরা ইসলামী বিশ্বের সমস্ত শহরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। যোগ্যতার দিক দিয়ে তাঁরা আরবদের চাইতে কম ছিলেন না। বরং কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ফিকহ্ ও হাদীসের ক্ষেত্রে আজমীদের অবদান ছিল আরবদের চাইতে বেশি। যদি বেশি না-ও হয়, তুল্য অবদানের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এভাবে শরী'আত ব্যবস্থা অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় অনারব দেশের লোকদের জন্য।

৫. 'রায়' ও হাদীস প্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারণে মতভেদ দেখা দেয়। এর ফলে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি দল এমন সব হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দিত, যেগুলি তাদের গোচরীভূত ছিল এবং যেগুলির সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর ছিল। এজন্য তাদের ফতোয়া দানের গন্ডী ছিল তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় দলটি শরী'আতকে বুদ্ধি ও নীতিভিত্তিক মানদণ্ডে বুঝতে চেষ্টা করতো এবং কোনো ক্ষেত্রে হাদীস পাওয়া না গেলে তারা 'রায়'-এর আশ্রয় গ্রহণ করতো। এজন্য ফতোয়া দানের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি পরিসর প্রথমোক্ত দলটির তুলনায় ব্যাপকতর। হিজাযবাসীগণের প্রবণতা ছিল প্রথমোক্ত দলটিকে অগ্রাধিকার দানের দিকে এবং তাদের কেন্দ্র ছিল মদীনা। আর দ্বিতীয় দলটির প্রতি অনুরক্ত ছিল 'ইরাকবাসীরা এবং তাদের কেন্দ্র ছিল কূফা। একথা সুস্পষ্ট, হিজাযবাসীদের পক্ষে হাদীস সন্ধান করাটা যত সহজ ছিল ইরাকবাসীদের ততটা ছিল না। তবে সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর হিজাযবাসীদের জন্যও হাদীসের সন্ধান ও সংগ্রহ আর ততটা সহজ থাকেনি। সে সময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন ছিল না, যাতে হাদীসভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর। এ ছাড়া প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটির তমদ্দুন ও মতবাদের ধারক এখানে বেশি ছিল। এ কারণে দু'দলের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য হওয়া ছিল অনিবার্য। ফলে তাদের ফতোয়া ও ফয়সালার মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

কিয়াস, ইসতিহ্সান ও ইসতিসলাহের ব্যাপক ব্যবহার

এ যুগে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াস, ইসতিহ্সান ও ইসতিসলাহের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে। ফকীহগণের ওপর নতুন নতুন প্রশ্নের চাপ পড়ে অনেক বেশি। ফলে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। হাদীসপন্থী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এর কঠোর প্রতিবাদ করেন। এমনকি তাঁরা কিয়াসকে নাজায়িয

www.waytojannah.com

Contents

গণ্য করেন। কিন্তু তাঁরা যদি কিয়াসপন্থীদের মতো সমপর্যায়ে জীবনের সমস্যাদির মুখোমুখী হতেন তাহলে মতবিরোধের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য দেখা দিতো। এ কারণে মতবিরোধের কঠোরতা বেশি দিন অব্যাহত থাকতে পারেনি। বরং কিছু দিন পরে তাঁদের শাগরিদদের মধ্যে পরস্পর ইলম চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে লাভবান হবার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণের নাম নিচে দেয়া হলো :

মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ মুফতীগণ

১. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা), ২. আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা), ৩. আবূ হুরায়রা (রা), ৪. সা'য়ীদ ইবন মুসাইয়্যাব আল-মাখযুমী (রহ), ৫. উরওয়া ইবন যুবাইর ইবন 'আওয়াম (রহ), ৬. আবূ বকর ইবন আব্দুর রহমান (রহ), ৭. আলী ইবন হোসাইন যাইনুল আবেদীন (রহ), ৮. উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উতবাহ ইবন মাসউদ (রহ), ৯. সালিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রহ), ১০. সুলাইমান ইবন ইয়াসার (রহ), ১১. নাফে', ১২. কাসেম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর (রহ), ১৩. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হোসাইন (রহ), ১৪. আবূ যিনাদ আব্দুল্লাহ ইবন যাকওয়ান (রহ), ১৫. ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ আনসারী (রহ) এবং ১৬. রাবী'আহ ইবন আবী আবদির রহমান আর-রা'য়ী (রহ)।

মক্কার ফকীহগণ

১. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা (রহ), ২. মুজাহিদ ইবন জাবর (রহ), ৩. ইকরিমাহ্ (রহ), ৪. আতা ইবন আবি রাবাহ (রহ), ৫. আবূয যুবাইর মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (রহ)।

কূফার ফকীহ ও মুফতীগণ

১. আলকামা ইবন কায়স নাখঈ (রহ), ২. মাসরূক ইবন আজদা' (রহ), ৩. 'আবীদাহ্ ইবন আমর সালমানী (রহ), ৪. আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ নাখঈ (রহ), ৫. শুরাই্ ইবন হারেস কিনদী (রহ), ৬. ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ নাখঈ (রহ), ৭ সা'য়ীদ ইবন জুবাইর (রহ) এবং ৮. 'আমির ইবন আল-মুনজিজ ফিল আলামে শারাহীল বলে উল্লেখ রয়েছে, (পৃ. ৩৩৩), কিন্তু আল-ইকমালে সুরাহবীল বলে উল্লেখ রয়েছে; সুরাহবীল আশ-শা'বী রাহেমাহুমুল্লাহ।

বসরার ফকীহ ও মুফতীগণ

১. আনাস ইবন মালেক আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাদেম, ২. আবুল আলিয়া (রহ), ৩. আবুশ শা'সা জাবের

www.waytojannah.com

ইবন যায়দ (রহ), ৪. মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রহ), ৫. হাসান ইবন আবুল হাসান ইয়াসার (রহ) এবং ৬. কাতাদা ইবন দা'আমাহ রাহেমাহুমুল্লাহ।

সিরিয়ার ফকীহ ও মুফতীগণ

১. আব্দুর রহমান ইবন গানাম আশ'আরী (রা), ২. আবূ ইদরীস খওলানী (রহ), ৩. কাবীসা ইবন যুওয়াইব (রহ), ৪. মাকহূল ইবন আবী মুসলিম (রহ), ৫. রাজা' ইবন হাইওয়াহ্ কিন্দী (রহ) এবং ৬. উমর ইবন আবদিল আযীয ইবন মারওয়ান রাহেমাহুমুল্লাহ।

মিসরের ফকীহ ও মুফতীগণ

১. আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল 'আস (রা), ২. আবুল খায়র মুরশিদ ইবন আবদিল্লাহ (রহ) এবং ৩. ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব (রহ)।

ইয়ামানের ফকীহ ও মুফতীগণ

১. তাঊস ইবন কায়সার জুনদী (রহ), ২. ওহাব ইবন মুনাব্বিহ (রহ) এবং ৩. ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর (রহ)।

উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ সবাই হাদীস ও ফিকহের জ্ঞানে ব্যুৎপন্ন এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাঁদের শহরের জনগণের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন। এ যুগে ফিকহের বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মাযহাব কায়েম হয়নি। বরং যে যার কাছ থেকে ইচ্ছা ফতোয়া গ্রহণ করতো এবং মুফতী নিজের জ্ঞান অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। যদি এই ফতোয়া সন্তোষজনক নয় মনে হতো অথবা কোন ব্যাপারে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজনবোধ হতো তাহলে অন্য কোন মুফতী ও ফকীহের কাছে একই ব্যাপারে ফতোয়া নেওয়া হতো। এ ধরনের বিষয়কে দূষণীয় মনে করা হতো না।

মুফতী ও ফকীহ ছাড়া বিভিন্ন শহরে সরকারের পক্ষ থেকে কাযী (বিচারপতি)-ও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচার করতেন। যদি কুরআন ও হাদীসে তাঁরা কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশ না পেতেন তাহলে বিখ্যাত ফকীহদের কাছ থেকে ফতোয়া নিতেন অথবা নিজেদের ইজতিহাদ প্রসূত মতের ভিত্তিতে ফায়সালা দিতেন। আবার কখনো তাঁরা পত্রের মাধ্যমে খলীফার কাছ থেকেও ফায়সালা জেনে নিতেন।

খারেজী ও শী'আ সম্প্রদায়ের উন্নতি

এ যুগে খারেজী ও শী'আ সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। খারেজীরা বিভিন্ন দ্বীনি ব্যাপারে নিজেদের মতের উপর অটল থাকে। এ কারণে হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা এমন সব লোককে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, যারা ছিল তাদের বন্ধু ও সমমনা।

www.waytojannah.com

শী'আদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার জন্ম হয়। তারা গায়র শী'আ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ বা হাদীস গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়নি। ফলকথা এভাবে প্রত্যেক ফেরকা, দল ও সম্প্রদায় নিজেদের ইমামের কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ সংক্রান্ত ফায়সালা গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দেয়।

হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস

একদিকে যথাযথ পদ্ধতিতে হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয রাহেমাহুল্লাহ্ প্রচেষ্টা শুরু করেন। ইসলামী দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের শাসক এবং আলিমদের কাছে তিনি লিখে পাঠান, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস সন্ধান করে তা সংগ্রহ করতে থাকো। আমি ইলম ও উলামার নিঃশেষ হয়ে যাবার আশঙ্কা করছি।" অন্য দিকে তখন জাল হাদীস রচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

জাল হাদীস রচনার কারণ

১. ইসলাম বিরোধী লোকদের ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার বাসনা।

২. মূর্খ সূফী ও 'আবিদ (ইবাদতে মশগুল) গণের বাসনা, তাঁরা অনুপ্রেরণামূলক ও ফাযায়েল (فضائل) সংক্রান্ত হাদীস তৈরি করে জনগণকে ধর্মকর্মে উদ্বুদ্ধ করতেন।

৩. সংকীর্ণমনা এবং স্বল্প শিক্ষিত মুহাদ্দিসগণের খ্যাতি অর্জনের বাসনা।

৪. বিদ্'আত প্রচারে উৎসাহী ও বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের নিজেদের মতবাদের সপক্ষে দলীল পেশ করার গরয।

৫. বৈষয়িক স্বার্থান্বেষীদেরকে তাদের কর্মের সপক্ষে শর'য়ী দলীল পেশ করে খুশি করার ইচ্ছা।

৬. দুর্বল মতন-এর[২৪] দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রখ্যাত সনদ[২৫] জুড়ে দেওয়া, কোন প্রখ্যাত সনদকে ওলট-পালট করে কাট-ছাঁট করে দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ 'মতন' এর সাথে যুক্ত করা, যাতে তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রবল অভিযোগ না আসে এবং তাদের বর্ণনার অভিনবত্বে জনগণ তাদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়।

৭. সাহাবীদের উক্তি, আরবী প্রবাদবাক্য ও জ্ঞানীদের জ্ঞানগর্ভ কাহিনীগুলিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা।

---

২৪. যে শব্দগুলোতে হাদীসের বক্তব্য প্রকাশিত হয় তার সমষ্টিকে হাদীসের মতন (متن) বলা হয়।

২৫. হাদীস বর্ণনাকারী রাবী (راوى)-দের নামের সমষ্টিকে হাদীসের সনদ বলে।

www.waytojannah.com

এইসব উদ্দেশ্যে কোনো কোনো লোক মিথ্যে করে বলে দিত "আমি নিজের কানে এই হাদীস শুনেছি, আমি বর্ণনাকারীর সাথে সাক্ষাত করেছি ইত্যাদি।"[২৬]

সত্যানুসারীদের বিপুল সংখ্যা

একথা সত্য, কোনো যুগের সব মানুষ এক ধরনের হয় না এবং এ যুগের সবার প্রবৃত্তি একই রকম ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের কাছাকাছি হবার কারণে সত্যানুযায়ী এবং দ্বীন ও ঈমানের জন্য জীবন উৎসর্গকারী লোকের সংখ্যা এ যুগে ছিল প্রচুর। কিন্তু জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাবে মুহাদ্দিসগণের জন্য হাদীস সংকলনের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ হয়ে পড়ে। তাঁরা কিভাবে এ কর্মে সাফল্য লাভ করেন, তা ইসলামের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

চতুর্থ যুগ

দ্বিতীয় শতকের শুরু[২৭] থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত (১১০-৩৫০ হি.)

চতুর্থ যুগের বুনিয়াদ রচিত হয় তৃতীয় যুগেই। ঐ যুগে ফিকহের সংকলন ও গ্রন্থনার সূচনা হয় এবং চতুর্থ যুগেই যথাযথভাবে ফিকহ্ লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়। ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিক যেসব মহান মর্যাদা সম্পন্ন ইমামগণ—যাঁদের মুকাল্লিদ তথা অনুসারীবর্গ চারদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজ নিজ ইমামের ফিকহী ফায়সালাকে নিজেদের জীবনে কার্যকর করেছিলেন, সে ইমামগণ ছিলেন এই চতুর্থ যুগেরই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য

এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ফিকহের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে :

---

২৬. এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ড. উমর হাসান ফুল্লাতাহ রচিত 'আল-ওয়াদ'উ ফিল হাদীস' (দারুল হাদীস, কায়রো থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থখানি দেখা যেতে পারে।

২৭. লক্ষ্য করুন, আমরা এটাকে ১১০ হিজরী সাল থেকে গণনা করছি। কারণ, সর্বশেষ যে সাহাবী মারা গেলেন, তিনি ছিলেন আবুত তোফায়েল আল-আমেরী। তিনি হিজরী ১১০ হিজরীতে মারা যান। তারপর থেকে শুধুমাত্র তাবেয়ীদের যুগ। সাহাবীগণের যুগ যেহেতু 'খাইরুল কুরুন' বা উত্তম প্রজন্ম সেহেতু সেটাকে আলাদা করে দেখাতে চেষ্টা করেছি। অথচ কোন কোন গবেষক ১০০ হিজরী সাল থেকেই এ যুগের শুরু হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতের পক্ষে যুক্তি হল, তখন ছিল উমর ইবন আবদিল আযীয-এর খিলাফত কাল। আর এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি শত বর্ষের প্রারম্ভে এ উম্মতের জন্য একজন মুজাদ্দিদ পাঠাবেন। সে হিসেবে তিনি একজন মুজাদ্দিদ। তার তাজদীদ বা সংস্কার কর্মকাণ্ড থেকে এ যুগের সূচনা হয়েছে বলা বেশি যুক্তিযুক্ত। মোটকথা, এ যুগের সূচনা হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমে হয়েছিল সেটা ১০০ হিজরীও ধরা যেতে পারে আবার ১১০ হিজরী থেকেও শুরু করা যেতে পারে।

www.waytojannah.com

Contents

১) সভ্যতার ব্যাপকতা। এর ফলে নতুন নতুন প্রয়োজনের জন্ম হয় এবং চিন্তা গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

২) জ্ঞান চর্চার প্রসার। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন ও প্রসার ঘটে যাতে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ (এবং দুর্যোগ) সৃষ্টি হয়।

৩) হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন। এ যুগেই হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয়। প্রায় সমস্ত ইসলামী শহরেই এ কর্মে মনোযোগ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রাখেন :

১. মদীনায় মালিক ইবন আনাস, ২. মক্কায় আব্দুল মালিক ইবন আবদিল আযীয, ৩. কূফায় সুফিয়ান সাওরী, ৪. বসরায় হাম্মাদ ইবন সালামাহ এবং সা'য়ীদ ইবন আবী আরুবাহ্, ৫. ওয়াসিতে হাইসাম ইবন শাব্বীর, ৬. সিরিয়ায় আবদুর রহমান আওযাঈ, ৭. ইয়ামানে ইয়ামার ইবন আরকাদ, ৮. খোরাসানে আবদুল্লাহ ইবন মুবারক, ৯. রাই-এ জারীর ইবন আব্দিল হামীদ রাহেমাহুমুল্লাহ।

হাদীস সংকলন ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা প্রথম পর্যায়ে সাধারণত একই বিষয়ে যেমন সালাত, সাওম ইত্যাদি বিষয়ের হাদীসসমূহকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সন্নিবেশিত করা হতো। তাছাড়া হাদীসের সাথে সাহাবা ও তাবে'য়ীগণের উক্তিও মিশ্রিত করার প্রচলন ছিল। হাদীস সম্পর্কিত হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এবং সাহাবা ও তাবে'য়ীগণের বাণী সম্পর্কিত হতো তাদের নিজেদের সাথে।

হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণ রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস এবং অন্যদের উক্তিগুলি পৃথক পৃথকভাবে সংকলন করেন। এ পর্যায়ে مسند নামে অভিহিত সংকলনের সৃষ্টি হয়, যাতে প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলো তাঁর নামে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন- মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবন মূসা কুফী, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ্, মুসনাদে উসমান ইব্ন আবী শাইবাহ্, মুসনাদে আসাদ ইবন মূসা বসরী, মুসনাদে নু'আইম ইবন হাম্মাদ। এঁরা সবাই এক একজন রাবী বা বর্ণনাকারীর বর্ণিত সমস্ত বর্ণনা একই জায়গায় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। হাদীসের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন—এই বিন্যাস ছিল রাবী ভিত্তিক।

তৃতীয় পর্যায়ে হাদীসের এই বিশাল সঞ্চয় থেকে সঠিক হাদীস নির্বাচন করার জন্য বিস্তর যাচাই-বাছাই করা হয়। এই যাচাই-বাছাই, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাকারীদের শীর্ষে অবস্থান করেন ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ নিশাপুরী। চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার পর তাঁরা যথাক্রমে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম নামক দুটি সংকলন তৈরি করেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসা'য়ী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ আরো

www.waytojannah.com

Contents

চারটি হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন। এই ছয়টি হাদীসগ্রন্থ 'সিহাহ সিত্তাহ' নামে পরিচিত। আরো বহু মুহাদ্দিস হাদীসের সংকলন প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁরা ঐ ছয়জনার মত খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। যদিও কোনো কোনো বিবেচনায় এঁদের সংকলন অধিকতর খ্যাতির দাবিদার, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এইগুলি উপরোক্ত ছয়টি সংকলন অপেক্ষা নিম্নতর মানের।

এই যুগে মুহাদ্দিসদের একটি শ্রেণী হাদীসের রাবীদের অবস্থা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করেন। এই দল রাবীদের ব্যক্তিগত গুণাবলী যথা নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা, স্মরণশক্তি, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। এ দলের সদস্যরা রিজালে জারহ ও তা'দীল নামে খ্যাত হন।

জারহ্ ও তা'দীল-এর মাধ্যমে প্রমাণিত হল, এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত নানা দোষে দুষ্ট এবং প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্জনযোগ্য, তৃতীয় এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসের মূল পাঠও (متن) এই বিচার-বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ ভাষাগত বিচারে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য কি-না, তাও যাচাই করা হতো।

ফল কথা, এ যুগে হাদীসের জারহ্ ও তা'দীল জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায় (فن) পরিণত হয় এবং বিস্তর লোক এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৪. উসূল ফিক্হ প্রণয়ন ও ফিকহের মূল বিষয়ে মতবিরোধ

এ যুগে উসূলে ফিকহ তথা ফিকহের মূলনীতিগুলি রচিত হয়। কিন্তু ফিকহী বিধানসমূহে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর নিম্নোক্ত কারণগুলি চিহ্নিত করা করা যেতে পারে :

(ক) হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা এবং তা থেকে ফিকহের মাসায়েল উদ্ভাবনের যৌক্তিকতার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি। তবে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই পদ্ধতির ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে এবং প্রত্যেক ফকীহ নিজের মানদণ্ড অনুযায়ী যাচাইয়ের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। কিছু সংখ্যক লোক দলীল রূপে হাদীস গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসেছিলেন। কিন্তু উম্মতে মুসলিমার ফকীহ গোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং তাঁরা ওদের কঠোর সমালোচনা করেন। এমনকি ইমাম শাফে'য়ী ও অন্যেরা হাদীস অস্বীকারের এই মতবাদকে পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করেছেন।

www.waytojannah.com

(খ) কিয়াস ও ইসতিহ্সানকে ইসলামী ফিকহের উৎস হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। মুহাদ্দিসগণ কিয়াস ব্যবহার করার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করেন। ইমাম শাফে'য়ী ইসতিহ্সানের বিরোধিতা করেন। যাহেরীয়া সম্প্রদায় কিয়াস অস্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, নিঃসন্দেহে এ যুগে কিয়াস খুব বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে হানাফীদের অংশ বেশি। হাম্বলী ও মালেকীদের অংশ সে তুলনায় অনেক কম। আর শাফে'য়ীদের অংশ দুই শ্রেণীর প্রায় মাঝামাঝি।

(গ) ইজমার শর্তসমূহের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়। এ জন্য ফিকহী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে।

(ঘ) ফিকহী কোন্ হুকুমের কি মর্যাদা এবং কি দলীল, তা নিরূপিত হলে এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। যেমন, কোন্ বিষয়টি ওয়াজিব এবং ওয়াজিব বলে গণ্য হতে হলে কিরূপ দলীলের প্রয়োজন হয়, ফকীহগণ এর নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন।

উল্লেখ্য, এই চতুর্থ যুগে ফকীহগণ উসূলে ফিকহের বিষয়ে অসংখ্য কিতাব লেখেন। অসাধারণ সাফল্যের সাথে তাঁরা ইসলামী জ্ঞানের শাখাটির গ্রন্থনা করেন। পরবর্তী আলিমগণ এ ব্যাপারে পথনির্দেশ (Guideline) লাভ করেন। এরই ভিত্তিতে তাঁরা ফিকহী হুকুম উদ্ভাবন (استنباط) করতে থাকেন।

৫. এই যুগে কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাভঙ্গি এবং কতখানি জোরালো ভাষায় কর্মের নির্দেশ দেয়া বা কর্ম নিষেধ করা হয়েছে ইত্যাদির প্রতি কর্মের শ্রেণীবিভাগ সূচক পরিভাষা যেমন- ফরয (فرض), ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মানদূব, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। এতেও কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

এ যুগের বিখ্যাত ফকীহ্গণ

১. ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ। তাঁর যুগে কূফায় আরো তিনজন বড় বড় ফকীহ ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন :

ক. সুফিয়ান ইবন সাইদ সাওরী রাহেমাহুল্লাহ,

খ. শারীক ইবন আবদিল্লাহ নাখ'য়ী রাহেমাহুল্লাহ,

গ. মুহাম্মদ ইবন আবদির রহমান ইবন আবী লায়লা রাহেমাহুল্লাহ।

ইমাম আবূ হানীফা ও এঁদের মধ্যে প্রায় ইলমী বিতর্ক-আলোচনা চলতেই থাকতো। ইমাম আবূ হানীফার শাগরিদদের মধ্যে যাঁরা বেশি খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা হচ্ছেন :

* আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম আনসারী রাহেমাহুল্লাহ।

* মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন ফরকদ শাইবানী রাহেমাহুল্লাহ।

* যুফার ইবন হুযাইল ইবন কায়স রাহেমাহুল্লাহ।

* হাসান ইবন যিয়াদ লুলুয়ী কূফী রাহেমাহুল্লাহ।

২. ইমাম মালেক ইব্ন আনাস ইব্ন আবী আমের। মুহাদ্দিস ও ফকীহ উভয় দলে তাঁর বহু শাগরিদ রয়েছেন। কারণ ইমাম মালেকের মধ্যে ফকীহ ও মুহাদ্দিস উভয়েরই গুণাবলী ছিল।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস শাফে'য়ী। তিনি শাফে'য়ী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইরাক ও মিসর উভয় এলাকায় তাঁর শাগরিদদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল। মুহাদ্দিস ও ফকীহ উভয় দলে তাঁর শাগরিদদের সংখ্যাও যথেষ্ট।

চার ইমামের খ্যাতির সাধারণ কারণসমূহ

এই চারজন ইমামের মাযহাব খ্যাতি অর্জন করে এবং জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। এদের ফিকহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং টিকে থাকে। এঁদের খ্যাতি লাভের সাধারণ কারণগুলি নিচে দেয়া হলো :

১. এঁদের সমস্ত রায় অর্থাৎ প্রদত্ত বিধানগুলো সংগৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ইমামদের বিধান বিক্ষিপ্ত থেকে যায় এবং সে জন্য তাঁরা খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি।

২. এঁদের শাগরিদগণ সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তাঁরা নিজেদের উস্তাদগণের 'রায়' জনগণের সামনে তুলে ধরলে তাকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। শাগরিদগণ উস্তাদগণের রায় প্রচারে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন।

৩. কোনো কোনো মাযহাবের উদারতার কারণে এবং জনগণের প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা বেশি থাকায় তা সরকারের আইনে পরিণত হয়ে যায়।

যায়দিয়া ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের খ্যাতি

এ যুগে শী'আদের দুই সম্প্রদায় যায়দিয়্যা ও ইমামিয়্যা এবং তাদের মাযহাব দুটো খ্যাতি লাভ করে। যায়দিয়্যা সম্প্রদায়টি যায়দ ইবন আলী ইবন হুসাইনের নামের সাথে সম্পর্কিত। এই সম্প্রদায়ের ইমামদের জন্য ইজতিহাদ ছিল অপরিহার্য। এ কারণে তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক স্বাধীন রায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন ইমামের জন্ম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত ইমামগণ বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন :

www.waytojannah.com

১. আল হাসান ইবন আলী ইবন হাসান যায়দ,
২. আল হাসান ইবন যায়দ ইবন মুহাম্মদ,
৩. কাসেম ইবন ইবরাহীম,
৪. হাদী ইয়াহইয়া ইবন হাসান ইবনিল কাসিম।

ইমামিয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের বুনিয়াদ ছিল প্রধান দু'টি আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত, এক. ইমাম অবশ্যই মাসূম (معصوم) তথা নিষ্পাপ হবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশধর হবেন। দুই. 'আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর وصى অর্থাৎ অসিয়াতের মাধ্যমে মনোনীত ইমাম বা খলীফা (তাঁর অধিকার হরণ করে আবূ বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম অবৈধভাবে খিলাফত গ্রহণ করেছেন)।[২৮] ইমামিয়াদের এ শাখা বারজন ইমামের প্রবক্তা (ইসনা 'আশারিয়া)। তাদের সবচেয়ে বড় ইমাম ছিলেন আবূ আব্দুল্লাহ জা'ফর সাদেক এবং তাঁর পিতা আবূ জাফর মুহাম্মদ বাকের। শী'আদের আরো অনেক ফেরকা রয়েছে।

পঞ্চম যুগ

চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাগদাদের পতন পর্যন্ত (৩৫০-৬৫৬ হি.)

এ যুগ হিজরী চতুর্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয় এবং হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে বাগদাদের ধ্বংসের মাঝে শেষ হয়। এ যুগ হচ্ছে ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ এবং তাকলীদের যুগ। সর্বোপরি এ যুগ হচ্ছে, ইলমে ফিকহ, মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। এ সময়ে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশিষ্ট ইমামগণের তাকলীদ করতে থাকেন এবং তাদের ফিকহী মতাদর্শের ভিত্তিতে কিতাব লিখতে শুরু করেন। মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে যেসব মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করেছিলেন এ সময় এসে সেসব মাসায়েলের সত্যাসত্য নিরূপণ ও বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সমর্থনের পক্ষে বিপক্ষে মুনাযারা এবং বাহাস বিতর্কের সূচনা হয়। অবশেষে ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহেমাহুমুল্লাহ-এর তাকলীদ করার উপর অধিকাংশ মুসলিম নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, "মাযহাব অবলম্বনের

---

২৮. নিঃসন্দেহে শী'আদের দাবি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইমাম বা খলীফাকে মা'সুম বা নিষ্পাপ হতে হবে এমন কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া আবূ বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমও বৈধ খলীফা ছিলেন। তাঁরা সঠিক পদ্ধতিতেই নির্বাচিত হয়েছিলেন।

www.waytojannah.com

ক্ষেত্রে এ চারটির মধ্যে সীমিত থাকার উপযোগিতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে সমূহ বিশৃংখলা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে।”

ষষ্ঠ যুগ

বাগদাদের পতন থেকে মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদালিয়া রচনা পর্যন্ত।[২৯] (৬৫৬-১২৮৬ হি.)

হিজরী সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বাগদাদের ধ্বংসের পর থেকে এ যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই ইমামগণের তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাসআলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনের তখন খুব বেশি প্রচলন ছিল না। কেননা, চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের ফকীহগণ একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকহ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন শাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন, যাতে মানবজীবনের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান রয়েছে। সে যুগের কিতাবসমূহে এমন সমস্যার সমাধান রয়েছে যা উদ্ভব হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এখনও তা সংঘটিত হয়নি। সেসব কিতাবে এত খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধানও রয়েছে যা এখনও অলীক ও কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়ত কখনও সে সমস্যারও উদ্ভব হতে পারে। তখন সেগুলোর সমাধান সে পুরাতন কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে। হাঁ, যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, যার সমাধানের উপলক্ষ সে যুগের কিতাবসমূহে নেই বা সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই, তবে অবশ্যই ইজতিহাদ করতে হবে, এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার তখনও উন্মুক্ত ছিল। এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখতেন। যেমন, হানাফী মাযহাবে আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম, আল্লামা জামালুদ্দীন যাইলা'য়ী এবং আল্লামা ইবন কামাল পাশা প্রমুখ। মালিকী মাযহাবে আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ প্রমুখ। শাফে'য়ী মাযহাবে আল্লামা ইযযুদ দ্বীন আব্দুস সালাম, শাইখ তাকীউদ্দীন সুবকী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শাইখ জালালুদ্দীন মাহাল্লী প্রমুখ এবং হাম্বলী

২৯. আগেই বলা হয়েছে যে, অনেকেই বাগদাদের পতনের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত একই যুগ বলে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু এ বিরাট সময়কে আমরা একত্রে আলোচনা করলে এর অনেক বিষয়ই সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাছাড়া এ পুরো সময়ে ফিকহে ইসলামীর অবস্থা যে একই পর্যায়ের ছিল তা কিন্তু নয়। তাই আমরা চেষ্টা করেছি একটা সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট নির্ধারণ করতে। সে হিসেবেই 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' রচনা করে ফিকহের যে উন্নতি সাধিত হয়েছে সেটাকে টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে গণ্য করে সেখান পর্যন্ত এক যুগ ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেকে আবার তুর্কী উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষণাকাল (১৩৪৩ হি. ১৯২৪ সাল) পর্যন্ত এ যুগকে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। প্রত্যেকের মতের পক্ষেই শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকা স্বাভাবিক।

www.waytojannah.com

মাযহাবের আল্লামা ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যেম, ইবন রাজাব প্রমুখ। তাঁরা নিজ নিজ ইমামদের মূলনীতি অনুসারে কিতাবাদি রচনা করে ফিকহের ক্রমবিকাশের এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

সপ্তম যুগ

ফিকহে ইসলামীর বর্তমান যুগ (তুরস্কের খিলাফতের পতনের পর থেকে আজ পর্যন্ত)

ফিকহে ইসলামীর বর্তমান যুগ একদিকে দুঃখের অপর দিকে আনন্দেরও।[৩০] তুরস্কে ইসলামী খিলাফতের পতনের পর রাতারাতি প্রায় সমস্ত মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে ইসলামী আইন উঠে যাওয়া সত্যি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু সুখের বিষয় হলো এই যে, হিজরী ত্রয়োদশ শতকের শেষাংশে ফিকহের পুনর্জাগরণের সূত্রপাত হয়। যদি সে কর্মতৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য অব্যাহত থাকে তবে তা উম্মতের জন্য প্রচুর কল্যাণের কারণ হবে। এ সময়ে ফিকহে ইসলামীর যে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয়েছে তার কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো :

১। মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ্

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্কী উসমানী খেলাফতের নায়কগণ তৎকালীন আলিম-উলামাদের একত্র করে তাদের কাছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ফিকহে ইসলামীর উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের জন্য সিভিল আইন প্রণয়নের আহ্বান জানালেন। সেখানে মৌলিকভাবে সুনির্দিষ্ট কোন মাযহাবের কথা বলা হয়নি। তবে এটুকু বলা ছিল যে, সাধারণভাবে ফিকহে হানাফী অনুসারে তা রচনা করতে হবে; কারণ, এটি তখনকার খিলাফতের রাষ্ট্রীয় মাযহাব।

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আলিমগণ ১২৮৬ হিজরীতে যে কাজ শুরু করেছিলেন তা-ই পরবর্তীতে 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়া' (আইন ও বিচার বিষয়ক বিধিবদ্ধ গ্রন্থ) নামে খ্যাত হয়। ১২৯২ হিজরী সন থেকে তা তুর্কী উসমানী খিলাফতের অধীন রাষ্ট্রগুলোতে কার্যকর হয়।

এ আইন গ্রন্থ প্রণয়নে কোথাও কোথাও মাযহাব চতুষ্টয়ের বাইরে গিয়েও কোন কোন মত গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, শর্তাধীন বেচাকেনার ব্যাপারে 'আব্দুল্লাহ ইবন শুবরুমাহ' (মৃ. ১৪৪ হি.)-এর মতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে তুর্কী উসমানীয় খেলাফত মাযহাবী গণ্ডি থেকে বের হবার পথ দেখিয়ে ইসলামী ফিকহের পুনর্জাগরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এ গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে বিচারক ও আইনজীবিগণ ইসলামী আইনের ব্যাপারে প্রাচীন ফিকহী গ্রন্থাবলী খুঁজে বিধি-বিধান

৩০. ড. উমর সুলায়মান আল-আশকার, তারিখুল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ১৮৫।

www.waytojannah.com

বের করা সংক্রান্ত যে সমস্ত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন সেগুলোর অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল।

এ একটি পদক্ষেপ ছিল যুগান্তকারী। যা পরবর্তীতে ফিকহে ইসলামীকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। ফিকহে ইসলামীকে প্রাচীন রূপরেখা থেকে আধুনিকভাবে উপস্থাপনের যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে তা পরবর্তীতে ইসলামী ফিকহে গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে। সাথে সাথে এর মাধ্যমে মানবরচিত আইনের কবল থেকে মানুষকে উদ্ধার করার একটি সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' রচিত হওয়ার পর উসমানীয় খিলাফত সেটাকে রাষ্ট্রীয় আইন গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে ফকীহ ও আইনজীবিগণ তার পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন দেশে তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। অনেক ভাষায় অনূদিত হয়। কারণ, আইনের মত করে ফিকহে ইসলামীকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। অনেক ফকীহ ও বিচারক এটিকে ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে আলী হায়দার, খালেদ আতাসী, সা'য়ীদ আল-মুহাসেনী, সেলিম রুস্তম বায এর ব্যাখ্যা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তবে এটা সত্য যে, 'মাজাল্লা'য় শুধুমাত্র চুক্তি আইনসমূহ বা সিভিল ল' সমূহই উল্লেখ করা হয়েছিল।

২। কানূন হুকুকিল 'আয়েলাহ্ আল-উসমানী (উসমানী খিলাফত কর্তৃক প্রণীত পারিবারিক অধিকার আইন)

মাজাল্লায় যেহেতু শুধুমাত্র সিভিল ল'সমূহই বর্ণিত হয়েছিল সেহেতু উসমানী খিলাফতের কর্ণধারগণ চিন্তা করলেন যে, একই আঙ্গিকে পারিবারিক আইনসমূহও প্রণীত হওয়া দরকার। সে অনুসারে তারা কানূন হুকুকিল 'আয়েলাহ্ আল-উসমানী: (উসমানী খিলাফত কর্তৃক প্রণীত পারিবারিক অধিকার আইন) রচনা করলেন। সেখানে বিয়ে, তালাক সংক্রান্ত ইসলামী ফিকহের যাবতীয় বিধি-বিধান হানাফী মাযহাব অনুসারে আইন আকারে সাজিয়ে লেখা হলো। যদিও কোন কোন মাসআলায় অন্য মাযহাব থেকেও কিছু কিছু ধারা সংযোজন করা হয়েছিল। এটি ১৯১৭ সালে প্রণীত হয়েছিল এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সিরিয়ায় কার্যকর ছিল। এমনকি কোন কোন আরব দেশে মুসলিমদের জন্য তা এখনও বলবৎ আছে।[৩১]

৩। কোন সুনির্দিষ্ট মাযহাবের উপরই নির্ভরশীল না হওয়া

উসমানীয় তুর্কী খিলাফতের দ্বিতীয় এ প্রজেক্টটি ফিকহে ইসলামীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বার উন্মোচন করেছে। আর তা হচ্ছে, কোন সুনির্দিষ্ট মাযহাবের বাধ্যবাধকতামুক্ত

৩১. যেমন, লেবাননের মুসলিমদের জন্য এখনও তা প্রযোজ্য রয়েছে।

www.waytojannah.com

হওয়া। এর দেখাদেখি আলিমগণ প্রয়োজন অনুসারে অন্য মাযহাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে দ্বিধা করেন নি। তাদের এ প্রচেষ্টা তুলনামূলক ফিকহ-এর কাজকে ত্বরান্বিত করে। তখন থেকেই বিভিন্ন দেশে ফিকহ-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বিধি-বিধান প্রণীত হওয়া আরম্ভ হয় এবং সে অনুসারে অনেক দেশেই এ ধারার ফিকহ্ এর ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে।[৩২]

৪। ফিকহী বিভিন্ন সামগ্রিক রচনার সূত্রপাত

উসমানী খিলাফত কর্তৃক প্রণীত পারিবারিক আইনের অনুকরণে বিভিন্ন স্থানে সামগ্রিক কিছু রচনার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। মিসরে যিনি সর্বপ্রথম এ ধরনের ফিকহ ভিত্তিক আইন গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেন তার নাম কাদরী পাশা। তিনি এ সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক তিনটি গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পান।

ক. 'আল-আহ্কামুস শার'ইয়্যাহ ফিল আহওয়ালিস শাখসিয়্যাহ'। এতে তিনি হানাফী মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুসারে পারিবারিক আইন রচনা করেন। তবে তিনি তা শুধু বিয়ে, তালাক বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখেন নি বরং অসিয়ত, হেবা, মীরাস, অভিভাবকত্ব বিষয়ের আলোচনা দ্বারাও তার গ্রন্থটি সমৃদ্ধ করেন। এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে কোথাও গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও ফকীহ ও বিচারকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল।

খ. 'মুরশিদুল হাইরান'। এটি হানাফী মাযহাব অনুসারে মু'আমালাত বা ব্যবহারিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত ফিকহের এক বিরল সংগ্রহ।

গ. 'কানুনুল আদল ওয়াল ইনসাফ ফী আহ্কামিল আওকাফ'। এ গ্রন্থে তিনি ওয়াকফ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধি-বিধান রচনা করার প্রয়াস পান। এটাকে আইনের ধারা অনুসারে এমনভাবে সাজিয়ে লিখেছেন যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত সহজ বলে বিবেচিত হয়েছে।

কাদরী পাশার পাশাপাশি মালিকী মাযহাবের পক্ষ থেকেও অনুরূপ একটি আইনী আদলের ফিকহী গ্রন্থ রচিত হয়। মুহাম্মাদ আমের মালিকী মাযহাবের কিছু ফিকহী নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে "মুলাখখাসুল আহ্কামিশ শার'ইয়্যাহ আলাল মু'তামাদ মিন মাযহাবে মালিক" গ্রন্থটি রচনা করেন।

অনুরূপভাবে, হাম্বলী মাযহাবের পক্ষ থেকেও অনুরূপ পদক্ষেপ নেয়া হয়। শাইখ আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-কারী আল-মাক্কী (মৃ. ১৩৫৯ হি.) হানাফীদের 'মাজাল্লাহ' এর অনুসরণে হাম্বলী মাযহাব অনুসারে একটি ফিকহী আইনী গ্রন্থ 'মাজাল্লাহ' রচনা করেন। যাতে মোট একুশটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছিল।[৩৩]

---

৩২. যেমন, বর্তমান সিরিয়া, মিসর, জর্দান, মরক্কোয় বলবৎকৃত পারিবারিক আইন।

৩৩. ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার, তারিখুল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ১৯৮।

www.waytojannah.com

৫। পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার

এ যুগে ফিকহ চর্চা শুধু গ্রন্থ লেখাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং পঠন ও পাঠনের ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে চারটি মাযহাবই বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শরী'আহ অনুষদে এবং শরী'আহ কলেজসমূহে ব্যাপকভাবে পাঠদান করা হচ্ছে। কোন মাযহাবের প্রতি অযথা বাড়াবাড়ি বা কোন মাযহাবকে হেয় প্রতিপন্ন না করে এ পাঠদানের মাধ্যমে ফিকহী চিন্তাধারার উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। ফলে মাযহাবী গোঁড়ামি ও পরস্পর কাঁদা ছোড়াছুড়ি থেকে উম্মতের শিক্ষিত সমাজকে রক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৬। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ফিকহ চর্চা

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ফিকহ চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এর মাধ্যমে ছাত্রদের ফিকহী যোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন দলীল থেকে কিভাবে মাসআলা বের করা যাবে তার সঠিক দিকনির্দেশনা তারা পাচ্ছে। ফলে একই বিষয়ে বহু অভিসন্দর্ভ রচিত হচ্ছে, যাতে বিভিন্ন মাযহাবের আলোকে সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা হয়ে প্রাধান্য দেয়ার মত যোগ্যতাও সৃষ্টি হচ্ছে। এ ধরনের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত অভিসন্দর্ভের সংখ্যা অগণিত।

৭। বিভিন্ন গবেষণাধর্মী পত্রিকার মাধ্যমে ফিক্‌হ চর্চা

বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী পত্রিকার মাধ্যমে ফিকহ চর্চা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। কোন কোন পত্রিকা শুধুমাত্র এ ফিকহ বিষয়ক রচনাবলীর জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত। যেমন, মাজাল্লাতুল ফিকহিয়্যা আল-মু'আসারাহ, মাজাল্লাতুল বুহুসুল ফিকহিয়্যাহ ইত্যাদি। তাছাড়া কোন কোন গবেষণাধর্মী পত্রিকায় কোন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে এত ব্যাপক আলোচনা হয়েছে যে, তাতে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে ফিকহের বিধানাবলী সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।

৮। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এ ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান

ফিকহ-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে অনেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে 'ইসলামী ফিকহ সপ্তাহ' ঘোষণা করেছে। সেসব সপ্তাহে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ইসলামী ফিকহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হচ্ছে। সাথে সাথে সেগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন হয়ে কোন কোনটির ব্যাপারে সিদ্ধান্তও গৃহীত হচ্ছে, যা অনেকটাই আইনের মর্যাদা পাচ্ছে।

www.waytojannah.com

৯। ফিকহ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠান

ফিকহ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র এমনকি বেশ কয়েকটি অমুসলিম রাষ্ট্রেও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেসব সম্মেলনে অনেক আধুনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সেগুলোর দলীলভিত্তিক সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে।[৩৪]

১০। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামী ফিকহের ভিত্তিতে ইসলামী আইন ব্যবস্থার প্রসার

বর্তমানে বিশ্বের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে ফিকহের উপর ভিত্তি করে রচিত ইসলামী আইন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথমেই রয়েছে সৌদি আরব, তারপর রয়েছে ইরান। তাছাড়া মালয়েশিয়ার কয়েকটি প্রদেশও ফিকহ-এর ভিত্তিতে রচিত ইসলামী আইনে পরিচালিত হচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র নাইজেরিয়ার ৬টি প্রদেশে ইসলামী আইন বলবৎ রয়েছে। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের জন্য পাকিস্তান সরকার শরী'আহ আইন বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে।

১১। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শরী'আহ বা ফিকহ ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা স্থাপন

বিশ্বের অনেক মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রেও অন্যান্য আইনের ভিত্তিতে স্থাপিত কোর্টের পাশাপাশি শরী'আহ কোর্ট প্রতিষ্ঠিত আছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এমনকি খোদ ভারতের কোন কোন প্রদেশেও এ কোর্টের অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলো নিঃসন্দেহে ফিকহের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

১২। ফিকহে ইসলামীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

১৯৩২ সালে সর্বপ্রথম তুলনামূলক আইনের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হল্যান্ডের 'লাহাই'তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ড. আলী বাদাবি ইসলামী আইনের সাথে মিলিয়ে একটি প্রবন্ধ পেশ করেন যার নামকরণ করা হয় 'আল-আলাকাতু বাইনাল আদইয়ানি ওয়াল কাওয়ানীন' বা ধর্ম ও আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক। এ সম্মেলনে প্রবন্ধকারের আলোচনা ইসলামী আইন সম্পর্কে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। তাঁরা পরবর্তী সম্মেলনে ইসলামী আইনের প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হন।

১৩৫৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৭ সালে লাহাইতে অনুষ্ঠিত হয় তুলনামূলক ফিকহ বিষয়ক আরেকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সেখানে মিসরের আল-আযহার ইউনিভার্সিটির দু'জন সদস্য গুরুত্বপূর্ণ দু'টি প্রবন্ধ জমা দেন। তার একটি হচ্ছে 'ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধবিষয়ক দায়-দায়িত্ব ও সিভিল দায়-দায়িত্ব'। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'রোমান আইনের সাথে ইসলামী শরী'আতের সম্পর্ক'। যাতে কোন কোন

---

৩৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১৫।

www.waytojannah.com

প্রাচ্যবিদের দাবি 'ইসলামী আইন রোমান আইন থেকে সংগৃহীত হয়েছে' মর্মে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত একটি মিথ্যা অভিযোগের অপনোদন করা হয়েছে।

আল-আযহারের দু'জন সদস্য সেখানে ফিকহ বা ইসলামী আইনকে সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে সেখানে উপস্থিত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গ কয়েকটি সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন :

ক. ইসলামী শরী'আতকে আইনের একটি উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হলো।

খ. ইসলামী শরী'আতকে একটি জীবন্ত, উন্নত ও বিকাশমান আইন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।

গ. ইসলামী শরী'আতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, সেটি অন্য কোন আইন থেকে ধার করা নয়।

ঘ. প্রথম প্রবন্ধটিকে আরবী ভাষাতেই সম্মেলনের প্রবন্ধ হিসেবে রেজিস্ট্রিকরণ এবং প্রয়োজনে এর সাহায্য নেয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ।

ঙ. সম্মেলনে আরবী ভাষা ব্যবহারের অধিকার এবং পরবর্তী সম্মেলনগুলোতে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

তারপর ১৯৪৮ সালে আইনজীবীদের আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সর্বমোট ৫৩টি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে ইসলামী আইনের বিষয়টি ছিল গবেষক ও আইনজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সে সম্মেলনের আহ্বান ছিল 'ইসলামী আইনকে যেন তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়'।

তারপর ১৯৫১ সালে প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ প্রথম ইসলামী ফিকহ সপ্তাহ পালন করে। সেখানে ইসলামী ফিকহের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার উপর প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সম্মেলন শেষে আইনজীবী পরিষদ নেতার ঘোষণা ছিল, "আমি জানি না, আমাদের কাছে যেভাবে ইসলামী আইন পেশ করা হয়েছিল যে, তা সম্পূর্ণরূপে অনুৎপাদনশীল, তার মধ্যে এবং আলোচ্য সম্মেলনে ইসলামী আইন সম্পর্কে যা শুনলাম এ দুয়ের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করব। আমার কাছে নিঃসন্দেহে মনে হচ্ছে যে, ইসলামী আইন অত্যন্ত গভীর, মৌলিক, সূক্ষ্ম, শাখা পল্লবিত ও সর্বকালে ও সর্বযুগের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।" তারপর সম্মেলন কয়েকটি প্রস্তাব পাস করে :

ক. ফিকহে ইসলামীর আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

খ. ফিকহে ইসলামীর বিভিন্ন মাযহাব সেটাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করেছে। তবে ইসলামী ফিকহকে যুগের মানুষের জন্য সহজভাবে উঠিয়ে না ধরার অপরাধ ইসলামের বর্তমান কালের ফকীহদের উপরই বর্তায়।

www.waytojannah.com

গ. এ সম্মেলন ফিকহ বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ বের করার উপর জোর দেয়। যা আধুনিক কালের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো থাকবে।[৩৫]

১৩। ফিকহ্ বিষয়ক বিশ্বকোষ তৈরি

ফিকহ্ বিষয়ক বিশ্বকোষ তৈরির প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। পরবর্তীতে সেটি দামেশকে বন্ধ হয়ে গেলেও মিসরে অব্যাহত ছিল। সেখানে موسوعة جمال عبد الناصر বা জামাল আব্দুন নাসের বিশ্বকোষ প্রণীত হচ্ছিল। বিভিন্ন কারণে সেটি বন্ধ হয়ে গেলে পরবর্তীতে মিসর সরকারের ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কোষ তৈরি করতে সক্ষম হয়।

তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো কুয়েত সরকারের প্রচেষ্টা। সেখানকার সরকার বিশ্বের সেরা ফিকহবিদদের সহায়তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী বিশ্বকোষ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের সে বিশ্বকোষের নাম হচ্ছে الموسوعة الفقهية الكويتية বা 'কুয়েত সরকারের প্রণীত ফিকহী বিশ্বকোষ'। এটি ৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত। এটি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিকহী কর্ম বলে বিবেচিত। তবে এ বিশ্বকোষগুলোতে আধুনিক যে সমস্ত ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে সেগুলো আলোচিত হয়নি। সেগুলোর জন্য আলাদা আরেকটি বিশ্বকোষ তাঁরা তৈরি করবেন।

১৪। ফিকহে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'ইসলামী অর্থনীতি'র উপর ভিত্তি করে নির্মিত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসার

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী অর্থনীতি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বিশেষ করে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধস নামার পর মানুষ ক্রমেই ইসলামী অর্থনীতির প্রতি ঝুঁকছে। আর এ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং, যা ইসলামী ফিকহের একটি অংশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পাশাপাশি সেসব ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে এ পর্যন্ত অনেকগুলো সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সমস্ত সেমিনার ফিকহে ইসলামীর যথার্থতা ও সার্বজনীন ও সর্বকালের বাস্তবসম্মত হওয়াকে জোরালোভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

---

৩৫. ড. আহমদ শালাবী, আত-তাশরী' ওয়াল কাদা ফিল ফিকরিল ইসলামী, পৃ. ২২০-২২৩।

www.waytojannah.com

Contents

ইজতিহাদ, তাকলীদ, তালফীক ও তাফাররুদ

ইজতিহাদ-এর সংজ্ঞা

ইজতিহাদ শব্দটি আরবী جهد থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ কষ্ট করা। নিজের ক্ষমতা ব্যয় ও কষ্ট সহ্য করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা। কোন কিছু হাসিলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। তবে কোন সহজ বস্তুকে বহন করতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় না।

পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হয়, কোন বিষয়ে শর'য়ী বিধান জানার ক্ষেত্রে নিজের প্রচেষ্টা ব্যয় করা। অথবা, শরী'আতের কোন বিধান সম্পর্কে সুষ্ঠু সমাধান লাভের উদ্দেশ্যে মুজতাহিদ কর্তৃক গবেষণা ও উদ্ভাবনের স্বীকৃত সাধারণ নিয়মানুসারে চেষ্টা-সাধনার শেষ সীমানা পর্যন্ত ব্যয় করা।[৩৬]

পারিভাষিক এই ইজতিহাদ সাধারণত তিন বিষয়ে হয়ে থাকে; এক. কুরআন ও সুন্নাহর নস বা বাণী থেকে কোন বিধান বের করতে প্রচেষ্টা চালানো, যা 'ইজতিহাদ ফী ফাহমিন নস' বলা যায়। দুই. যেসব মাসআলাতে সরাসরি শরীআতের কোন বিধান বর্ণিত হয়নি সেসব মাসআলায় কুরআন ও সুন্নাহ্র নস বা বাণী থেকে কোন বিধানের কারণ নির্ণয় করে সে কারণ অনুসারে বিধান দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো, যাকে কিয়াস বলা হয়। তিন. যেসব মাসআলাতে কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সরাসরি কোন বিধান নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না, সেগুলোতে শরী'আতের মৌলিক নীতিমালা অনুসারে বিধান নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা চালানো। এটাই ইস্তিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, সাদ্দুয যারায়ি' ইত্যাদি নামে খ্যাত। এ সবই ইজতিহাদের অংশ।

তাকলীদ-এর সংজ্ঞা

'তাকলীদ' আরবী শব্দ। অর্থ গর্দানে হার, রশি ইত্যাদি পরিয়ে দেয়া। ব্যবহারিক অর্থে অনুসরণ করা, বাধ্যতামূলকভাবে অন্যের কথা মান্য করা।

পারিভাষিক অর্থ নির্ধারণে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কোন কোন আলিম বলেন, তাকলীদ হলো কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির সত্যতায় বিশ্বাস করে প্রমাণের প্রতি দৃকপাত ব্যতীত তার অনুসরণ করা। অন্য কথায় প্রমাণ ছাড়াই অপরের মতামত গ্রহণ করাকে 'তাকলীদ' বলা হয়। কোন কোন আলিম বলেন, প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত মুজতাহিদ ইমামের কথা অনুসারে আমল করাকে তাকলীদ বলে। কারও কারও মতে,

---

৩৬. ড. আবদুল করীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উসুলিল ফিকহ, পৃ. ৪০১।

www.waytojannah.com

কোন নির্দিষ্ট ইমামের গবেষণালব্ধ মাসায়েল ও নীতিসমূহ জানা, তাকে শরীয়ত বলে স্বীকার করা, সেমতে আমল করা এবং উক্ত ইমামের নীতির ব্যতিক্রম না করাকে তাকলীদ বলে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হলো, তাকলীদের মূল সূত্র হচ্ছে, 'প্রমাণ অন্বেষণ না করা'। এখানে এটা অবশ্যই জানা থাকা জরুরী যে, প্রমাণ অন্বেষণ না করার অর্থ : অনুসরণকৃত মুজতাহিদের কাছে কোন প্রমাণ নেই, অথবা কোন প্রমাণ ছাড়াই মুজতাহিদের মনগড়া কথার উপর আমল করা হচ্ছে তা নয়, বরং প্রকৃত বিষয় হলো, মুজতাহিদের কাছে অবশ্যই কোন-না-কোন প্রমাণ আছে। কিন্তু মুকাল্লিদ অনুসরণের জন্য তা অন্বেষণ করা আবশ্যকবোধ করবে না।

সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে ফিকহ রচনার যুগ বা হিজরী চতুর্থ শতক পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই কমবেশী মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ উভয় প্রকার লোক বর্তমান ছিল। সাধারণত যে সকল ফকীহ কুরআন ও সুন্নাহ আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা করে মাসআলা ইস্তিম্বাত (গবেষণা করে বের করা) ও এতদসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাদেরকে মুজতাহিদ বলা হত। অপর পক্ষে সাধারণ লোক যারা কুরআন ও সুন্নাহকে ভালভাবে শিক্ষা করেনি এবং মাসআলা ইস্তিম্বাতের দক্ষতাও অর্জন করতে পারে নি তাদেরকে মুকাল্লিদ বলা হত। এজন্য যখনই জনসাধারণ সাধারণ কোন মাসআলা বা সমস্যার সম্মুখীন হত তখনই ফকীহদের মধ্য হতে কোন না কোন একজনের কাছে ছুটে যেত। আর তিনি তাদেরকে সে মাসআলার সমাধান বলে দিতেন। কিন্তু সে সময় সাধারণ মানুষ সর্বদা কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করতেন এমনটি প্রমাণিত হয়নি। বরং তারা সাধারণভাবে আলিমদের কাছে যেতেন এবং তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন।

কিন্তু হিজরী চতুর্থ শতক থেকে শুরু হওয়া তাকলীদ পরবর্তীতে ব্যাপক রূপ লাভ করে। অধিকাংশ দেশেই ব্যক্তি তাকলীদ প্রসারিত হয়ে পড়ে। আলিম, সাধারণ লোক সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বে ফকীহ ছাত্রগণ দারসে কুরআন ও হাদীস বর্ণনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ফলে তারা মাসআলা ইস্তিম্বাত করতে পারতেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী ছাত্রগণ প্রধানত কোন নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাবের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন এবং তার পদ্ধতি ও নীতিমালা আয়ত্ত করে তা হতে আহকাম বা বিধি-বিধান বের করতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে যারা বিধি-বিধান বের করতে সক্ষম হতেন তাদেরকে ফকীহ বলা হতে লাগল। তাদের মধ্যে কোন কোন উৎসাহী ফকীহ নিজ ইমামের মাযহাব মত কিতাবাদি প্রণয়নও করেন। এই কিতাবাদি হয় পূর্বের কোন কিতাবের সার-সংক্ষেপ, তার ব্যাখ্যা অথবা মাসআলাসমূহের সংকলন ছিল।

www.waytojannah.com

মোটকথা, প্রথম যুগ ছিল ইজতিহাদ, মাসআলা বিন্যাস ও সম্পাদনার যুগ। আলিম সমাজের মধ্যে তখন ইজতিহাদ অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। তাকলীদ শুধু জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে মাযহাবের প্রবর্তক ইমামদের উচ্চস্তরের ছাত্রগণের মধ্যে তাকলীদের নাম-গন্ধও ছিল না, শুধু যোগাযোগের সম্পর্ক ছিল, যার কারণে তাদেরকে 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' এবং মাযহাবের প্রবর্তক ইমামগণকে 'মুজতাহিদ ফিদ দ্বীন' বলা হত। এর নিম্নস্তরের আলিমদের মধ্যে যদিও তাকলীদ পাওয়া যেত তবুও যখনই কোন ফকীহ কোন বিশেষ মাসআলায় ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাতের (গবেষণার) শক্তি অর্জন করতে পারত তখনই তারা তাকলীদ ছেড়ে দিতেন। এ ধরনের আলিমদেরকে 'মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল' বলা হত।

ঐ যুগে স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের প্রচলন ছিল খুব ব্যাপক। সে যুগের পরে খাওয়াস তথা বিশিষ্ট আলিমদের মধ্যে তাকলীদ একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে ইজতিহাদ ও স্বাধীন মতবাদ বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এর একটি সঙ্গত কারণও ছিল; তা হলো, তখন বেশির ভাগ উসূল (নীতি) অথবা মাসআলার উপর মুজতাহিদগণের রায় হয় সর্বসম্মতিক্রমে নয়ত বিতর্কিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর কেউ যদি এ বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে তবে তা পূর্ববর্তী কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদী রায় বা কোন নির্দিষ্ট নীতির অনুরূপই হবে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বার ইজতিহাদ 'তাহসীলে হাসিল' বা 'প্রাপ্ত বিষয় দ্বিতীয়বার পাওয়া' এর বৃথা চেষ্টা করারই শামিল। হ্যাঁ, যদি এমন কোন মাসআলা বা সমস্যা দেখা দেয়, যা একেবারে নতুন এবং যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহগণ কোন আলোচনাই করেন নি, তবে সে মাসআলার উপর ইজতিহাদ চলবে। কেননা অনুরূপ মাসআলার উপর ইজতিহাদ কখনও বন্ধ হয়নি বা হবেও না।

ঐ যুগের পরে বিতর্কিত রায়সমূহের তারজীহ অর্থাৎ প্রাধান্য দেয়ার রীতি বরাবরই বহাল ছিল। কিন্তু মুসলিম আলিমদের একটি দল এর পরে সেটারও বিরোধিতা করতে থাকে। তারা সেটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কিন্তু অধিকাংশ আলিমের নিকটই সেটা সবার জন্য অপ্রয়োজনীয় হলেও গবেষকদের জন্য অত্যাবশ্যক। আমরা আলোচ্য গ্রন্থে এ প্রাধান্য দেয়ার পদ্ধতি অনুসরণের প্রচেষ্টা চালাব।

তালফীকের সংজ্ঞা

অভিধানে 'তালফীক' শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. মিলিত করা, মিশ্রণ ঘটানো। দুই. মিথ্যাকে সাজিয়ে বলা। দুটি কাপড়ের একটি দিয়ে আরেকটি

www.waytojannah.com

Contents

ঢেকে রাখা।[৩৭] পরিভাষায় শব্দটি মিশ্রণ ঘটানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন মাসআলায় বিভিন্ন বর্ণনাকে একত্রিত করাও বোঝায়।[৩৮]

আর বিভিন্ন মাযহাবে তালফীক করার অর্থ, কোন মাযহাবে সুনির্দিষ্ট বিষয় নিষিদ্ধ হওয়ার পর অন্য মাযহাব থেকে কিছু অংশ এনে এর সাথে জুড়ে দিয়ে সেটাকে জায়েয করার প্রচেষ্টা চালানো। যেমন, কোন ব্যক্তি ওযু করার পর কোন গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করল, পেশাব-পায়খানার পথ ব্যতীত অন্য পথে রক্ত বের হল, গাইরে মাহরামকে স্পর্শ করার কারণে শাফে'য়ীদের নিকট তার এ ওযু বাতিল, পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য পথে রক্ত বের হওয়ার কারণে হানাফীদের নিকটও বাতিল। তবে শাফে'য়ীদের মতে পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য পথে রক্ত বের হলে ওযু নষ্ট হয় না। অনুরূপভাবে গাইরে মাহরামকে স্পর্শ করলে হানাফীদের নিকট ওযু নষ্ট হয় না। তারপর যদি কেউ এ ওযু দ্বারা সালাত আদায় করে, তখন তার সালাতকে শুদ্ধ বলতে হলে দুই মাযহাব থেকে কিছু অংশ মিলিয়ে বলতে হবে। এটার নামই তালফীক। হানাফী কিতাব দুররে মুখতারে বলা হয়েছে, এ ধরনের তালফীককৃত হুকুম সবার ঐকমত্যে বাতিল। কেউ তাকলীদ করে আমল করার পর (সেটা অবৈধ প্রমাণিত হওয়ার পর) তা থেকে ভিন্ন মত অবলম্বন করে নিজের কর্মকাণ্ড বৈধ করার প্রচেষ্টা চালানো সবার নিকটই বাতিল। হানাফী মাযহাবের এটা গ্রহণযোগ্য মত। কেননা, তাকলীদ জায়েয হওয়ার শর্ত হলো তালফীক না করা। ইবন আবেদীন এ ব্যাপারে বিস্তারিত মতামত প্রদান করেছেন।[৩৯]

প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ যদি বিভিন্ন মাযহাবের 'রুখসত' বা 'যাতে শিথিলতা আছে এমন বিষয়াদি' অনুসরণ করে, তার বিধান কি? এ ব্যাপারে উসূলবিদ ও ফকীহ আলিমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে, তবে সবচেয়ে সঠিক মত হলো এ কাজটি নিষিদ্ধ হওয়া; কেননা এভাবে বিভিন্ন মাযহাবের শিথিলকৃত বিষয়াদি অনুসরণকারী প্রকারান্তরে দ্বীন থেকেই বের হয়ে যায়। এভাবে সে তার মনে যা চায় তা-ই অনুসরণ করে।[৪০] কেউ কেউ এটাকে সরাসরি ফাসেকী কাজ বলেও মন্তব্য করেছেন। তবে অনেকেই বলেছেন, যদি কেউ ইচ্ছা করে বিভিন্ন মাযহাবে বর্ণিত শিথিলতা খুঁজতে থাকে, তবে তা হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি শিথিলতা না খুঁজে শুধুমাত্র দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহণ করে

---

৩৭. জাওহারী, আস-সিহাহ; ফাইরুযাবাদী, আল-কামুসুল মুহীত; ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব; 'لفق' শব্দ।

৩৮. ইমাম নাওয়াবী, রাওদাতুত তালেবীন, ১/১৬২।

৩৯. ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার, ১/৫১, ৩/৬০২।

৪০. সুবকী, জাম'উল জাওয়ামে'উ, ২/৪০০।

www.waytojannah.com

তবে তা নিষিদ্ধ নয়।[৪১] কোন কোন আলিম বলেন, যদি অন্য কোন মতের উপর আমল করার পর বিভিন্ন মাযহাবে শিথিলতা তালাশ করতে থাকে তবে তা হারাম হবে, নতুবা হারাম হবে না।[৪২]

এটা জানা অত্যাবশ্যক যে, যে তালফীক শরী'আতে নিষিদ্ধ তা হচ্ছে, কোন এক মাসআলায় বিভিন্ন ইমামের বিভিন্ন মতকে একত্র করে একটি আলাদা মত তৈরি করে নেয়া। তবে বিভিন্ন মাসআলায় দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন ইমামের মত গ্রহণ করাকে তালফীক বলা হবে না। এটি অনেক আলিমের নিকটই প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তে জায়েয।

ফিকহী তাফাররুদের হুকুম

তাফররুদ মানে ভিন্ন মত। মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মত হতে সরে গিয়ে স্বতন্ত্র মত প্রকাশকে 'তাফাররুদ' বলা হয়। বিভিন্ন যুগে দেখা গেছে যে, মাযহাবের ইমামগণ থেকে কোনও বিষয়ে সুস্পষ্ট মত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনও কোনও ফকীহ্ তার নিজস্ব গবেষণার আলোকে সে মত পরিত্যাগ করেছেন। তিনি দেখেছেন যে, সে মতের দলীল শক্তিশালী নয়, বরং তার বিপরীত মতই দলীল-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়। সুতরাং সেই ভিন্ন মতকেই তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন।

এরূপ 'তাফাররুদ' বিভিন্ন রকম হতে পারে :

ক. ফকীহ্ কর্তৃক স্বীয় গবেষণার আলোকে এমন কোন মত অবলম্বন করা যার পক্ষে পূর্ববর্তী কোন ইমামের সমর্থন নেই। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইমামদের কারও কথা গ্রহণ না করে নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোন কথা বলা।

খ. স্বীয় মাযহাবের বিপরীতে অন্য কোন মাযহাবের মতকে দলীল-প্রমাণের অনুকূল মনে করে সেই মত গ্রহণ করে নেওয়া।

গ. নিজ মাযহাবের একাধিক মতের মধ্যে এমন কোনও মত অবলম্বন করা, যে মতটি মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম কর্তৃক সাধারণভাবে গৃহীত নয় এবং এমন বিশেষ কোনও পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়নি যে সে মত গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

ঘ. সাধারণের কল্যাণ বিবেচনায় বা ব্যাপক সমস্যা নিরসনকল্পে অপর কোন মাযহাব বা স্বীয় মাযহাবেরই অপ্রধান মত অবলম্বন করা।[৪৩]

এ চার প্রকার তাফাররুদের মধ্যে প্রথম প্রকার মত অবলম্বন করা কারও জন্য জায়িয নয়, তিনি যে স্তরের ফকীহ্ হোন না কেন।

৪১. আর-রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ, ১/৪১।

৪২. আমীর বাদশাহ, তাইসীরুত তাহরীর, ৪/২৫৪।

৪৩. ইফাবা, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৬৩০।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় প্রকারের তাফাররুদ মুহাক্কিক আলিমের জন্য বৈধ।[৪৪] মুহাক্কিক আলিম স্বীয় গবেষণার আলোকে যদি মনে করেন যে, তার মাযহাবের মত অপেক্ষা অন্য মাযহাবের মতই অধিকতর প্রমাণসিদ্ধ এবং সে হিসেবে তিনি সেই মত গ্রহণ করে নেন, তবে সে অবকাশ তার জন্য আছে বৈকি, তবে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এরূপ না করাই তার পক্ষে শ্রেয়।[৪৫]

তৃতীয় প্রকারের তাফাররুদ অর্থাৎ স্বীয় মাযহাবেরই অপ্রধান (مرجوح) মতকে নিজ গবেষণায় শক্তিশালী মনে হলে মুহাক্কিক আলিমের জন্য তা গ্রহণ করা জায়িয। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তা অনুসরণ করতে পারেন, কিন্তু অন্যদের জন্য তার অনুসরণ বৈধ নয়; বরং তারা স্বীয় মাযহাবের প্রধান (راجح) মতই মেনে চলবে। আর অন্যের জন্য এ মতের অনুসরণ যেহেতু জায়িয নয়; তাই মুহাক্কিক আলিম সে মত অনুযায়ী ফতওয়াও দিতে পারবেন না। ব্যাপারটা কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[৪৬] এজন্যই ইবনুল হুমাম-এর 'তাফাররুদ' সম্পর্কে তার বিখ্যাত ছাত্র কাসিম ইবন কুতলুবুগা বলেন, আমাদের উসতায-এর ভিন্ন মত গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুর্থ প্রকারের তাফাররুদ অর্থাৎ অনিবার্য প্রয়োজনে বা সর্বব্যাপী সমস্যা নিরসনকল্পে স্বীয় মাযহাবের অপ্রধান মত বা অন্য মাযহাবের রায় গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। মুহাক্কিক আলিম সে অনুসারে নিজেও আমল করতে পারেন এবং অন্যদেরও ফাতওয়া দিতে পারেন।[৪৭] প্রকৃতপক্ষে এটা তাফররুদ বা ভিন্ন মতের ব্যাপার নয়, বরং এটা সামগ্রিক ফাতওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

কতিপয় ফকীহের তাফাররুদের দৃষ্টান্ত

ক. ইমাম তাহাবী রাহেমাহুল্লাহ হানাফী মাযহাবের একজন বিখ্যাত ইমাম। হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ, আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ ও মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ -এর মতামতের একজন বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ ব্যাখ্যাতা। হাদীসের আলোকে স্বীয় মাযহাবের মাসাইল প্রতিষ্ঠায় তিনি বিচার-বিশ্লেষণের যে নৈপুণ্য ও যুক্তি-প্রমাণের চমক দেখিয়েছেন সৃজনশীল প্রতিভার সে এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, এ মানের ফকীহ্ ও মুজতাহিদের পক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নমত পোষণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং কোনও কোনও মাসআলায় ইমাম তাহাবী রাহেমাহুল্লাহও মাযহাবের প্রধান (راجح)

---

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

Contents

মত ত্যাগ করে তাফাররুদ অবলম্বন করেছেন। যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে, "মাতাল ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিলে সে তালাক হয়ে যায় কিন্তু ইমাম তাহাবী রাহেমাহুল্লাহ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে মাতাল ব্যক্তির তালাক সহীহ্ নয়।"[৪৮]

এমনিভাবে সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয়ের আগে অথবা আসরের পর সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফ করলে সে তাওয়াফের সালাত আদায় সম্পর্কেও ইমাম তাহাবী রাহেমাহুল্লাহ্-এর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতের বিপরীত।[৪৯]

খ. বিখ্যাত হানাফী ফকীহ্ ইবনুল হুমামও কোনও কোনও মাসআলায় ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন, মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে নফল পড়া সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের রায় হচ্ছে যে এটা মাকরূহ। কিন্তু ইবনুল হুমাম রাহেমাহুল্লাহ-এর মতে মাকরূহ নয়।[৫০]

সালাতের ভেতর থাকা অবস্থায় মোজার উপর মাসাহ্ -এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, কিন্তু পানি না থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে সালাত নষ্ট হবে না। কিন্তু ইবনুল হুমাম রাহেমাহুল্লাহ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।[৫১]

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত রায় হচ্ছে যে, উযুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব, কিন্তু ইবনুল হুমাম রাহেমাহুল্লাহ-এর তাফাররুদ হচ্ছে যে, 'বিসমিল্লাহ্' বলা ওয়াজিব।[৫২] এমনিভাবে আরও বিভিন্ন মাসআলায় তিনি স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত ছাত্র কাসেম ইবন কুতলুবুগা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের উসতাযের ব্যতিক্রমী মত গ্রহণযোগ্য নয়।[৫৩] সুতরাং অন্যদের পক্ষে এর অনুসরণ জায়িয নয়।

গ. হিজরী দ্বাদশ শতকের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী ব্যক্তিত্ব শাহ ওয়ালি উল্লাহ রাহেমাহুল্লাহ ছিলেন একজন হানাফী ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। হাদীস ও ফিকহের সমন্বয় সাধন এবং ইসলামী বিধি-বিধানের উপর দার্শনিক ও মুজতাহিদসুলভ বিচার-বিশ্লেষণ ছিল তাঁর জ্ঞান চর্চার প্রধান ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য এবং সাফল্য অভাবনীয়।

---

৪৮. ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ৩/৪৩১।

৪৯. তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার, ১/৩৯৭; ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ১/৪৩৮।

৫০. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ১২/৪৬২-৪৬৩।

৫১. ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, ১/১৫৫; ইবনে নুজাইম, আল বাহরুর রায়িক, ১/৩১০।

৫২. ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, ১/১৯-২১; ইবনে নুজাইম, প্রাগুক্ত, ১/৩৯-৪১।

৫৩. ইফাবা ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৬৩২।

www.waytojannah.com

মুজতাহিদসুলভ বিচার-বিশ্লেষণের ধারায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনিও স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে ফজরের সালাতে কুনূত পড়ার বিধান নেই, কিন্তু শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ রাহেমাহুল্লাহ-এর মতে কুনূত পড়া জায়িয।[৫৪] সুতরাং এটি তাঁর তাফাররুদ।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ রাহেমাহুল্লাহ-এর মতে জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।[৫৫] এটা তাঁর ভিন্ন মত। কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে এটা সুন্নাত নয়।[৫৬]

এমনিভাবে গ্রামে জুমু'আ আদায়,[৫৭] ইমামের পেছনে মুকতাদির সূরা পড়া[৫৮] প্রভৃতি বিষয়েও তিনি স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেছেন।

কোনও কোনও বিষয়ে ইমাম কারখী রাহেমাহুল্লাহ, আব্দুল হাই লাখনৌভী রাহেমাহুল্লাহ, প্রমুখও সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম হতে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে এসব ভিন্ন মত বা তাফাররুদ তাঁদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ফতোয়া দেয়া বা অন্যের অনুসরণ করার জন্য নয়।[৫৯]

---

৫৪. হুজ্জাতিল্লাহিল বালেগাহ, ২/১১।

৫৫. প্রাগুক্ত, ২/৩৬।

৫৬. ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ২/৩২১।

৫৭. হুজ্জাতিল্লাহিল বালেগাহ, ২/৩০।

৫৮. প্রাগুক্ত, ২/৯।

৫৯. ইফাবা, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৬৩২।

www.waytojannah.com

বিভিন্ন ফিকহের পরিভাষা

ফিক্‌হ এর পরিভাষাসমূহকে আমরা সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।
এক. সাধারণ পরিভাষা।
দুই. মাযহাবভিত্তিক পরিভাষা।

প্রথমত, ফিকহের সাধারণ পরিভাষাসমূহ

ফিকহের সাধারণ পরিভাষাসমূহ অত্যন্ত ব্যাপক। তবে নিম্নে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিভাষার উল্লেখ করব যা তুলনামূলক ফিকহের আলোচনায় সহায়ক হবে।

ফিকহ ও উসূলভিত্তিক কিছু পরিভাষা। যেমন, ফরয, ওয়াজিব, মান্দুব (মুস্তাহাব), হারাম, মাকরূহে তাহরীমি ও মাকরূহে তানযীহী, মুবাহ। এগুলো 'হুকমে তাকলীফী' (আদেশ-নিষেধসূচক বিধি-বিধান) এর প্রকারভেদ বলে স্বীকৃত। যার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. ফরয : শরী'আতে যার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, অকাট্য ও সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে। যেমন, ইসলামের পাঁচটি রুকন, যা সরাসরি কুরআন ও মুতাওয়াতির সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, সালাতে কেরাআত পড়ার বাধ্যবাধকতা। অনুরূপভাবে যা অকাট্য ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যেমন, গম, যব, খেজুর ও লবণ—এ চারটি বস্তু বাকীতে সমপর্যায়ের মধ্যে বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়া। ফরযের বিধান হচ্ছে, তা অবশ্যই করতে হবে এবং যা করলে সওয়াব হয়, ছেড়ে দিলে শাস্তি পেতে হয়। আর যার অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. ওয়াজিব : শরী'আতে যার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, তবে তার দলীলের ভাষ্যে অকাট্যতা নেই বরং কিছুটা সম্ভাবনাময়। যেমন, সাদকায়ে ফিতর, সালাতুল বিতর, দুই ঈদের সালাত; এগুলোর বাস্তবায়ন অবশ্যই করতে হবে। তবে এগুলোর বাস্তবায়ন ফরযের বাস্তবায়নের মত নয়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, হানাফী আলিমগণ ব্যতীত অপরাপর মাযহাবের আলিমগণের নিকট ফরয ও ওয়াজিব একই পর্যায়ভুক্ত। এ দুয়ের মধ্যে তাঁরা কোন পার্থক্য করেন না।

www.waytojannah.com

৩. মান্দুব বা মুস্তাহাব অথবা সুন্নাহ : শরী'আতে যার বাস্তবায়ন চাওয়া হয়েছে তবে অবশ্য করণীয় করা হয়নি। অথবা, যা বাস্তবায়ন করলে প্রশংসিত হয় অথচ না করলে নিন্দা করা হয় না। যেমন, কর্জের লেন-দেন লিখে রাখা।

হানাফী আলিমগণের নিকট এ ধরনের কাজ ছেড়ে দিলে তিরস্কার করার সুযোগ রয়েছে। তারা মান্দুব বা সুন্নাতকে মুআক্কাদাহ ও যায়েদাহ এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একটির জন্য তিরস্কার সাব্যস্ত করেছেন, অপরটির জন্য নয়। তবে হানাফী আলিমগণের অন্যতম দুররে মুখতারের গ্রন্থকার-এর মতে উভয়ের বিধানই হচ্ছে যে, মান্দুব ছেড়ে দেয়া উত্তম রীতির বিপরীত কাজ। এমনকি এটা ছেড়ে দেয়া মাকরূহও হতে পারে। অপরাপর মাযহাবের আলিমগণ মান্দুবকে সুন্নাত, নফল প্রভৃতি নামও দিয়ে থাকেন।

৪. হারাম : শরী'আতে যার বর্জন নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। তবে হানাফী আলিমগণের নিকট হারাম হচ্ছে, শরী'আতে যার বর্জন নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, অকাট্য ও সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে। যেমন হত্যা, মদপান, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি।

এর বিধান হচ্ছে, এটা অবশ্য বর্জনীয়। আর যারা এটা করবে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। হারামকে মা'সিয়াত, যানব, কবীহ, ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। হারামকে হারাম জ্ঞান না করলে কাফির হবে।

৫. মাকরূহ : শরী'আতে যার বর্জন চাওয়া হয়েছে তবে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি। যা ছেড়ে দিলে সাওয়াব হবে, করলে শাস্তি বা নিন্দা করা হবে না।

তবে হানাফী আলিমগণ এটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক. মাকরূহে তাহরীমী: যার বর্জন কঠোরভাবেই চাওয়া হয়েছে, কিন্তু তার দলীল অকাট্য নয়। অর্থাৎ, সম্ভাবনাময় দলীল দ্বারা যার বর্জন চাওয়া হয়েছে সেটাকে মাকরূহে তাহরীমী বলা হবে। এটি না করলে সাওয়াব হবে আর করলে শাস্তিযোগ্য গুনাহ হবে। পক্ষান্তরে যার বর্জন চাওয়া কঠোরভাবে চাওয়া হয়নি তাকে মাকরূহে তানযীহী বলা হবে। এটি না করলে সওয়াব হবে আর করলে তিরস্কৃত হবে।

৬. মুবাহ : শরী'আত যা করা না করার ব্যাপারে মুকাল্লাফ বা দায়িত্ববান ব্যক্তিকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেছে। যেমন, খাওয়া, পান করা।

মূলত দুনিয়াবী প্রতিটি বস্তুর মূল হচ্ছে হালাল হওয়া, যতক্ষণ তাতে হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত না হবে। এর বিধান হচ্ছে যে, এটা করলে সওয়াবও যেমন নেই, না করলেও তেমন গুনাহ নেই। তবে যদি এটা না করলে বা করলে কোন ক্ষতির আশংকা থাকে তবে ভিন্ন কথা।

ফিকহ ও উসূল ভিত্তিক আরও কিছু পরিভাষা। যেমন সবব, ইল্লত, শর্ত, মানে', সহীহ, ফাসিদ, আযীমত, রুখসত, আদা, কাযা ও ইয়াদাহ। এগুলোকে হুকমে ওয়াদ'য়ী (কার্যকারণসূচক বিধি-বিধান) বলা হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে :

www.waytojannah.com

Contents

১. সাবাব : যা পাওয়া গেলে বিধানটি পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমেই হতে হবে এমনটি নয়। সেটি مناسب বা বিধানের উপযোগী বা মূল কারণও হতে পারে। আবার غير مناسب বা অনুপযোগী বা মূল কারণ নাও হতে পারে। প্রথমটির উদাহরণ যেমন, মাদকতা মদ হারাম হওয়ার কারণ, কারণ এর মাধ্যমে বিবেক বিনষ্ট হয়। অনুরূপভাবে সফর করা সাওম ভাঙ্গা জায়েয হওয়ার কারণ, এর মাধ্যমে সফরটি সহজসাধ্য হওয়া এবং কষ্ট লাঘব করা সম্ভব। আর দ্বিতীয়টি যেমন, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়া, যোহরের সালাত ফরয হওয়ার কারণ। কিন্তু এর কোন গ্রহণযোগ্য উপযোগিতা আমাদের বিবেক স্থির করতে পারে না। সূর্য পশ্চিম আকাশে যাওয়া বা না যাওয়ার সাথে সালাত ফরয হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট নয়।

২. শর্ত ও রুকন : তন্মধ্যে শর্ত হচ্ছে, যার অস্তিত্বের উপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তবে তা বস্তুটির অভ্যন্তরীণ কোন কিছু নয় বরং বাইরের বিষয়। অথবা যার অস্তিত্ব নিশ্চিত হলে বস্তুটি পাওয়া যেতে হবে এমনটি নয়, তবে তা না পাওয়া গেলে বস্তুটি নেই এমনটি বলা যাবে। যেমন, সালাতের জন্য অযু। বিয়েতে দু'সাক্ষীর উপস্থিতি। বেচা-কেনায় বিক্রিত বস্তু ও তার দাম নির্ধারণ।

হানাফী আলিমগণের নিকট রুকন হচ্ছে, যার অস্তিত্বের উপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল, আর সে বস্তুটি মূল বস্তুর অংশ বা অঙ্গ হয়ে থাকে। যেমন, রুকু সালাতের রুকন; কেননা তা এর একটি অঙ্গ। অনুরূপভাবে সালাতে কেরআত পাঠ সালাতের রুকন; এটি সালাতের একটি মৌলিক অঙ্গ। প্রস্তাব ও গ্রহণ এ দু'টি কোন চুক্তির ক্ষেত্রে রুকন; কেননা এ দু'টির মাধ্যমেই চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য মাযহাবে রুকন বলা হয়, যার উপর কোন কিছুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল, যদিও সেটি সে বস্তুর বাইরের অংশ হয়।

৩. মানে' বা বাধা : যার অস্তিত্ব বা উপস্থিতি হুকুম প্রদানে বাধা প্রদান করে অথবা যা সবব-এর কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। প্রথমটির উদাহরণ, যাকাতের ক্ষেত্রে ঋণ থাকা হানাফীদের নিকট যাকাত ওয়াজিব করাকে বাধা প্রদান করে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ, কিসাসের জন্য হত্যা হচ্ছে কারণ, এ কারণের কার্যকারিতা নষ্ট করে পিতা হওয়া। যদি হত্যাকারী পিতা হয় তবে তা কিসাসকে কার্যকর করতে দেয় না।

৪. সহী, ফাসেদ ও বাতিল : তন্মধ্যে সহীহ হচ্ছে শরী'আতের নির্দেশ মোতাবেক হওয়া। যেসব কাজে শরী'আত নির্ধারিত রুকন, শর্ত পুরোপুরি পাওয়া যাবে তাই সহীহ হিসেবে ধর্তব্য হবে। ফকীহগণ বলেন, ইবাদাতের ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার অর্থ, শরী'আতের চাহিদা মোতাবেক এমনভাবে হওয়া যাতে তার সংঘটিত হওয়ার দাবি আর না থাকে। আর মু'আমালাতের ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার অর্থ, শরী'আতের প্রভাব

www.waytojannah.com

তার মধ্যে পড়া, যেমন, চুক্তি সহীহ হওয়া অর্থ শরী'আতের প্রভাব তাতে পড়া। যেমন বেচা-কেনার মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন। বিয়ের মাধ্যমে সম্ভোগের সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া।

আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে ইবাদাত হয় সহীহ, নতুবা সহীহ নয় (ফাসিদ বা বাতিল)। আর যেসব ইবাদাত সহীহ নয়, সেগুলোতে বাতিল ও ফাসিদ ইবাদাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এভাবে ইবাদাতের প্রকারভেদ কেবল দুটি। অনুরূপভাবে মু'আমালাতেও হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবে ফাসিদ এবং বাতিলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু হানাফী মাযহাব এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। অতএব হানাফী মাযহাবে মু'আমালাতের প্রকার তিনটি। কর্মটিতে যখন তার যাবতীয় রুকন ও শর্ত পাওয়া যাবে তখন তাকে সহীহ বা বিশুদ্ধ বলা হবে। নতুবা তাকে গাইরে সহীহ বা বিশুদ্ধ নয় বলা হবে। বিশুদ্ধ নয় এমন কর্ম বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণ বিবিধ হতে পারে।

যদি মূল চুক্তিতে কোন গলদ থাকে অর্থাৎ যার উপর ভিত্তি করে কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে যদি তাতেই সমস্যা থাকে, অথবা সে বস্তুর কোন রুকন তথা অঙ্গে সমস্যা থাকে যেমন, চুক্তি সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে সমস্যা থাকে বা চুক্তি সম্পাদনকারীদ্বয়ের মধ্যে কোন সমস্যা থাকে, যেমন কোন পাগল বা শিশুর বেচাকেনা, অথবা চুক্তিকৃত বস্তু তথা পণ্যে কোন সমস্যা থাকে তবে সেটাকে বাতিল বলা হবে।

পক্ষান্তরে যদি চুক্তির কোন রুকন ও মূল অংশে সমস্যা না হয়ে কোন গুণাগুণের মধ্যে সমস্যাটি হয়, যেমন চুক্তির কোন শর্তে সমস্যা হয় এমতাবস্থায় এটাকে ফাসিদ বলা হবে। এর কারণে এ ধরনের লেন-দেনের সাথে কিছু বিধি-বিধান জড়িত হয়ে পড়ে। যেমন, অজানা মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় বা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোন শর্ত জুড়ে দেয়া। উদাহরণত, বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রির পর বিক্রিত বস্তু থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু সময় উপকৃত হওয়ার শর্ত আরোপ করা। এ সব অবস্থায় ফাসিদ বেচাকেনার ক্ষেত্রে যদি বিক্রিত বস্তু কব্জা করা হয় তবে তা অন্যায় মালিকানা বিবেচিত হবে। আর ফাসিদ বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে মাহর ওয়াজিব হবে, বিয়ে ভেংগে গেলে ইদ্দত পালন করতে হবে। আর যদি স্ত্রী সহবাস হয়ে থাকে তবে সন্তানের পিতৃত্ব সাব্যস্ত হবে।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, বাতিল হলো, ইবাদাত ও মু'আমালাতের মধ্যে শরী'আতের নির্দেশের বিরোধিতা করে এমন সব কর্ম করা যার সাথে শর'য়ী কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে না। সেটি শরী'আত নির্ধারিত নিয়ম-নীতির মূলে আঘাত হানবে, আর ফাসেদের ক্ষেত্রে তাশরী'আত নির্ধারিত কোন শাখা-প্রশাখা আক্রান্ত করবে; যা সেই বস্তুটিকে পূর্ণতা দানে বাধা প্রদান করবে এবং নষ্ট করতে বাধ্য

www.waytojannah.com

করবে। এভাবে এটি পুরো কর্মকাণ্ডটিকে সহীহ ও বাতিলের মাঝামাঝি অবস্থানে নিয়ে যায়। মৌলিক বিষয়াদি পূর্ণ হওয়ায় সেটিকে বাতিলও বলা যাচ্ছে না, আবার অন্যান্য দিকে সমস্যা থাকায় সেটিকে সহীহও বলা যায় না। আলিমগণ ফাসাদ-এর চারটি কারণ নির্ধারণ করেছেন। অজ্ঞতা, ধোঁকা বা ধোঁকার সম্ভাবনা, জোর-জবরদস্তি এবং নিষিদ্ধ শর্ত।[৬০]

৫. আদা, কাদা ও ই'আদাহ : (আদায় করা, কাযা করা ও পুনরায় করা)

কোন কাজ তার নির্দিষ্ট সময়মত হওয়াকে আদা বলে। যেমন, যোহরের সালাত তার সময়ে আদায় করা।

আর কোন কাজ তার সময়েই দ্বিতীয়বার করাকে ই'আদাহ্ বলে। যেমন, যোহরের সালাত আদায় করার পর আবার তা জামাতের সওয়াব হাসিলের জন্য পুনরায় আদায় করা।

আর কোন কাজ তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পরে করাকে কাযা (কাদা) বলে।

দ্বিতীয়ত: মাযহাবভিত্তিক পরিভাষাসমূহ

১. হানাফী মাযহাবের পরিভাষা

- ظاهر الرواية (যাহিরুর রিওয়াহ্) : এ পরিভাষাটি দ্বারা সাধারণত হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ তিন ইমাম আবূ হানিফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ-এর মতামতের মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

- الإمام ইমাম আবূ হানিফা।

- الشيخان (আশ-শাইখান) : ইমাম আবূ হানিফা ও আবূ ইউসুফ।

- الطرفان (আত্-তারাফান) : ইমাম আবূ হানিফা ও মুহাম্মাদ।

- الصاحبان (আস-সাহিবান) : আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ।

- الثاني। (দ্বিতীয়) : এ পরিভাষা দ্বারা সাধারণত ইমাম আবূ ইউসুফ-কে বোঝানো হয়।

الثالث (তৃতীয়) : এ পরিভাষা দ্বারা ইমাম মুহাম্মাদ-কে বোঝানো হয়।

- له (তার মত) বলতে ইমাম আবূ হানিফার মত বোঝানো হয়ে থাকে।

- لهما ، عندهما ، مذهبهما (তাদের দুজনের মত, মাযহাব) ইত্যাদি দ্বারা সাহিবাইন আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মত বোঝানো হয়।

- أصحابنا বলতে সাধারণত ইমাম আবূ হানিফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদকে বোঝানো হয়।

---

৬০. মুস্তাফা আহমাদ আয-যারকা, আল-মাদখালুল ফিকহী আল-আম, প্যারা, ৩৭১-৩৭৬।

www.waytojannah.com

- المشايخ হানাফী মাযহাবের পরিভাষায় এ শব্দটি দ্বারা সে ফকীহ্দেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ইমাম আবূ হানিফার সাক্ষাত পাননি।

ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর সঙ্গীরা ظاهر الرواية (যাহিরুর রিওয়ায়াহ্)-এ যে মতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তা দ্বারাই ফাতাওয়া দেয়া হয়। যদি তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ ঘটে, তবে সাধারণত এবং বিশেষ করে ইবাদাতের অধ্যায়ে আবূ হানিফার মতই গ্রহণ করা হয়। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতকে কোন কারণ ব্যতীত প্রাধান্য দেওয়া হয় না। আর সেই কারণগুলো হচ্ছে, ইমামের দলীল দুর্বল হওয়া, অথবা মু'আমালাতে ইমামের মত অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মত হওয়ায় (যেমন : মুযারা'আ ও মুসাক্বা অধ্যায়ে সাহিবাইন তথা আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতকে প্রাধান্য দেয়া) অথবা সময় ও যুগের ভিন্নতা থাকা।

বিচার, সাক্ষ্য ও উত্তরাধিকারের বিষয়গুলোতে আবূ ইউসুফের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে তার মত দ্বারা ফাতাওয়া দেয়া হয়। আর ذوى الأرحام -এর মাসআলাতেই ইমাম মুহাম্মাদের মত দ্বারা ফাতাওয়া দেয়া হয়। ইমাম যুফারের মত দ্বারা শুধুমাত্র ১৭টি মাসআলাতে ফাতাওয়া দেয়া হয়।[৬১]

যদি ইমাম আবূ হানিফার কোন মত না পাওয়া যায়, তবে পর্যায়ক্রমে আবূ ইউসুফ, অতঃপর মুহাম্মাদ, অতঃপর যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদের মত দ্বারা ফাতাওয়া দেয়া হয়।

যদি কোন মাসআলাতে ক্বিয়াস এবং ইসতিহ্সান দুটিই থাকে, তবে শুধুমাত্র ২২টি মাসআলা ব্যতীত বাকি সকল মাসআলাতেই সাধারণত ইসতিহসানের মতটি গ্রহণ করা হয়।

যদি কোন মাস্আলা যাহিরুর রিওয়াতে না থাকে এবং অন্য কোন বর্ণনাতে থাকে, তবে তা-ই গ্রহণ করা হবে।

যদি ইমাম হতে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়াত পরস্পর বিরোধী হয়, তবে অধিক শক্তিশালী দলীল অনুযায়ী মত গ্রহণ করা হয়।

যদি ইমাম ও তাঁর সঙ্গীদের নিকট হতে কোন মতই পাওয়া না যায়, তবে পরবর্তী ফকীহ্রা যে মতে একমত হয়েছেন, সে মত গ্রহণ করা হয়। যদি তাঁরাও মতবিরোধ করেন, তবে বেশির ভাগ ফকীহদের মত গ্রহণ করা হয়।

কোন মাস্আলায় যদি কারও নিকট হতে কোন মতই বর্ণিত না হয়, তবে মুফতী সে মাস্আলাতে ভালভাবে গবেষণা ও ইজতিহাদ করে ফাতাওয়া দিবেন, নিজের

---

৬১. ইব্ন আবেদীন: রাদ্দুল মুহতার (১/৬৫-৭০, ৪/৩১৫)। আরও দেখুন: ইবন্ আবেদীন: রিসালাতুল মুফতী, মাজমু' রাসায়েল ইব্ন আবেদীন, (১/৩৫-৪০)।

www.waytojannah.com

মনগড়া কোন কথা বলতে পারবেন না। এ অবস্থায় মুফতীকে আল্লাহ্‌র ভয় করতে হবে এবং জানতে হবে যে, কোন দলীল ব্যতীত ফাতাওয়া দেয়া অত্যন্ত ভয়ংকর এবং তা শুধুমাত্র অজ্ঞ-জাহেলরাই করে থাকে।

المتون - বলতে হানাফী মায্হাবের গ্রহণযোগ্য মুতূন বা কিতাবসমূহ বোঝানো হয়, যেমন: মুখতাসারুল-কুদূরী, বিদায়া, নিকায়া, আল-মুখতার, আল-বিকায়া, আল-কান্‌য, আল-মুলতাকা ইত্যাদি। এ গ্রন্থসমূহ ظاهر الرواية (যাহিরুর রিওয়াত)-এর মতসমূহ এবং গ্রহণযোগ্য মতসমূহই বর্ণনা করা হয়েছে।

যদি কোন মাস্আলাতে একটি মতকে সহীহ (صحيح) বলা হয় এবং অপর আরেকটি মতের উপর ফাতাওয়া (به يفتى) বলা হয়, তবে متون (মুতূন)-এর কিতাবসমূহে যে মত এসেছে, সে মতই গ্রহণ করা হয়। যদি এ কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে কোন মত না আসে, তবে যে মতের উপর ফাতাওয়া (به يفتى) সে মতই গ্রহণ করা হয়। কেননা, الفتوى শব্দটি الأشبه , الأصح , الصحيح ইত্যাদি শব্দ হতে অধিক শক্তিশালী।

যদি কোন মাস্আলাতে দুটি সহীহ (صحيح) মত থাকে, তবে যেকোন একটি দ্বারাই ফাতাওয়া ও বিচার করা যাবে। তবে এ সহীহ্ মতদ্বয়ের মধ্যে যে মতটি সময় ও যুগোপযোগী, অথবা যে মতটি ওয়াক্‌ফ বা দরিদ্রদের জন্য বেশি কল্যাণকর অথবা যে মতটির দলীল বেশি শক্তিশালী সে মতটি অগ্রাধিকার পাবে।

به يفتى - শব্দটি الفتوى عليه হতে অধিক শক্তিশালী, কেননা, প্রথম শব্দটি দ্বারা ফাতাওয়া শুধুমাত্র এ মতের উপরই সীমাবদ্ধ এরূপ বোঝায়। আর الأصح শব্দটি صحيح হতে এবং الأحوط শব্দটি الاحتياط হতে শক্তিশালী।

দুর্বল বর্ণনার উপর আমল করা জায়েয নয়, যদিও সেটি একমাত্র নিজস্ব ব্যাপারেই হোক না কেন, চাই সে মুফতী হোক কিংবা কাযী। তবে মুফতীর কাজ হচ্ছে শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া। পক্ষান্তরে কাযী বা বিচারক সেটাকে মানতে অপরকে বাধ্য করে। এ জন্যই ইমাম আবূ হানিফা বলেন, إذا صح الحديث فهو مذهبي বা "যখন হাদীস বিশুদ্ধ প্রমাণিত হবে সেটাই আমার মাযহাব বলে বিবেচিত হবে।" তবে মানুষের উপর সহজ করার স্বার্থে দুর্বল কথার উপর আমল করা জায়েয।

হানাফীদের নিকট বিভিন্ন মত থেকে মিলিয়ে কোন মাসআলায় বিধান দেয়া অবৈধ। অনুরূপভাবে হানাফী মাযহাবের পছন্দনীয় মত অনুসারে তাকলীদ করে কোন আমল করার পর সেটা থেকে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। সুতরাং যদি কেউ হানাফী মাযহাব মত এক-চতুর্থাংশ মাথা মসেহ করার পর যোহরের সালাত আদায় করল।

তারপর তার মনে হলো যে, মালেকী মাযহাবে পুরো মাথা মসেহ করার কথা বলা হয়েছে সুতরাং তার সালাত বাতিল করে তাকে আবার পড়তে হবে। এমনটি করার কোন সুযোগ নেই। •

তবে কোন কোন হানাফী আলিম আমল করার পর তাকলীদ করা জায়েয মনে করে থাকেন। যেমন কেউ এমনভাবে সালাত আদায় করল যে, তার মনে হচ্ছিল সেটি তার মাযহাব মতে বিশুদ্ধ হয়েছে। পরক্ষণে সে জানতে পারে যে, তার মাযহাব মোতাবেক তার সালাতটি বিশুদ্ধ হয়নি। তবে অন্য মাযহাব মোতাবেক তার কাজটি শুদ্ধ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কোন হানাফী আলিমের মতে সে ঐ মাযহাবের তাকলীদ করে তার আমলটি শুদ্ধ করে নিতে পারে। এভাবে সে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়েছে বলে ধরে নিতে পারে। ফাতাওয়া আল-বাযযাযিয়্যায় এসেছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ একবার কোন বাথরুমে গোসল সেরে জুমার সালাত আদায় করেন। পরে তাকে জানানো হয় যে, বাথরুমের কূপে মৃত ইঁদুর রয়েছে। তখন ইমাম আবূ ইউসুফ বললেন, তাহলে আমরা আমাদের ভাই মদীনাবাসীদের মত গ্রহণ করতে পারি যাতে বলা হয়েছে, 'যখন দুই কলসী (দুইশত সত্তর লিটার) পানি হবে তখন তাতে কোন নাপাকী থাকবে না।'[৬২]

কোন কোন হানাফী আলিম মত দিয়েছেন যে, যদি মুকাল্লিদ অন্য মাযহাব অনুসারে; কিংবা দুর্বল বর্ণনা, অথবা দুর্বল মত অনুসারে বিচার করে, তার বিচার প্রয়োগ হবে। অন্য কেউ সেটা বাতিল করতে পারবে না।

ইবনে আবেদীন (মৃ. ১২৫২ হি.) এর হাশিয়া (رد المحتار على الدر المختار) গ্রন্থটি হানাফী মাযহাবের সর্বশেষ তাহকীক ও তারজীহ-এর গ্রন্থ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

হানাফী মাযহাবের আলিমগণ তাদের মুজতাহিদ ইমামদেরকে কয়েকভাগে ভাগ করেছেন :

এক. 'মুজতাহিদ ফিদ-দ্বীন'। এটি ঐ সমস্ত ফকীহ আলিমদের গুণ যারা স্বয়ং উদ্ভাবিত মৌল উসূল ও নীতিমালার আলোকে সমগ্র দ্বীনের উপর ইজতিহাদ করে গেছেন। তাদের যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। ফলে তারা মূলনীতি কিংবা শাখা-প্রশাখা কোন ক্ষেত্রেই অন্যের তাকলীদ করেন নি। বরং তারা নিজস্ব যোগ্যতার আলোকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর ইজতিহাদ করে মাসআলা বের করেছেন এবং উম্মতের নির্ভরযোগ্য আলিমগণ তাঁদের ইজতিহাদকে সমর্থন করেছেন। এ পর্যায়ের মুজতাহিদকে

---

৬২. আশ-শা'রানী, আল-মীযান, ১-৫৪-৬৩; ইবনুল কাইয়্যেম, ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন, ২/২৬০-২৭৪।

www.waytojannah.com

Contents

মুজতাহিদে মুতলাক, মুজতাহিদে মুস্‌তাকিল, মুজতাহিদ ফিস শরী'আহও বলা হয়। যেমন, আবূ হানিফা, মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদ ইবন হাম্বল রাহেমাহুমুল্লাহ।

দুই. 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব'। এটি ঐ সমস্ত ফকীহ আলিমদের গুণ যারা নিজেরা ইজতিহাদের মৌল উসূল আবিষ্কার করেন নি। বরং অন্য কারো আবিষ্কৃত মৌল-উসূলকে গ্রহণপূর্বক সেগুলোর উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ইজতিহাদ করে গেছেন। এ জাতীয় মুজতাহিদদেরকে মুজতাহিদ ফিল ফিকহ বলা হয়। যেমন, ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ, আবূ মুতী আল-বালাখী প্রমুখ।

তিন. 'মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল। এটি ঐ সমস্ত ফকীহ আলিমের গুণ যারা উসূল কিংবা ফুরূ এর ক্ষেত্রে নতুন ইজতিহাদের কোন প্রয়োজন মনে করেন নি। বরং পূর্ববর্তীদের উদ্ভাবিত উসূল ও ফুরূ-এর উপর নিজেরা আমল করতেন এবং সেসব উসূল ও ফুরূ-এর নিরিখে নব উত্থাপিত কোন মাসআলার ফয়সালা দিতেন। যেমন, ইমাম তাহাবী, আল-খাসসাফ, আবুল হাসান আল-কারখী, কাযীখান প্রমুখ।

চার. 'আসহাবুত তাখরীজ'। এটি সেসব মুজতাহিদের গুণ, যারা কোন ইমামের উসূল ও ফুরূ-এর উপর পূর্ণ পারদর্শিতা ও বিচক্ষণতা অর্জনের মাধ্যমে ইমাম থেকে বর্ণিত কোন অস্পষ্ট বাক্যের গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ কিংবা ইমাম কর্তৃক বর্ণিত দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণের উপর গবেষণা ও মতামত দিয়ে থাকেন। যেমন, ইমাম আবূ বকর আর-রাযী।

পাঁচ. 'আসহাবুত তারজীহ'। এটি সে সকল মুজতাহিদের গুণ যারা ইমামদের থেকে বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনা কিংবা অভিমতের উপর গবেষণা করে কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য তা নির্ধারণ করেন। যেমন, আবুল হাসান আল-কুদূরী।

ছয়. 'আসহাবুত তাময়ীয'। এটি তাদের গুণ যারা সংশ্লিষ্ট ইমামগণ থেকে বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলোর উপর গবেষণা করে একাধিক মতামতের মধ্যে কোন্‌টি খুব বেশি শক্তিশালী, কোন্‌টি বেশি শক্তিশালী, কোন্‌টি শক্তিশালী আর কোন্‌টি দুর্বল তা নির্ধারণ করে থাকেন। যেমন, বিকায়া গ্রন্থকার, কানযুদদাকায়েক গ্রন্থকার, প্রমুখ।

২. মালিকী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ

মালিকী মাযহাবে অন্যান্য মাযহাবের মতই কিছু কিছু মাস্‌আলাতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। মুফতী এ মতগুলোর মধ্যে যে মতটি কল্যাণকর, তা দ্বারাই ফাতাওয়া দেয়। আর যে মুফতী নয় বা ইজতিহাদের শর্ত পূরণ করতে পারেনি, সে المتفق عليه। বা ঐকমত্য অথবা মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত, অথবা অগ্রগামী ফকীহ্ দ্বারা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত দ্বারা ফাতাওয়া দেয়।

www.waytojannah.com

যদি কোন মতকেই প্রাধান্য দেওয়া না যায় অথবা راجح, কিনা তা জানা না যায়, তবে কারো কারো মতে সে কঠোর মতটি গ্রহণ করবে। আবার কারো মতে, সে সহজ মতটি গ্রহণ করবে, কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহজ-সরল দ্বীনসহকারে প্রেরিত হয়েছেন। আবার কারো মতে, সে তার ইচ্ছামত যে কোন মত গ্রহণ করতে পারবে; কেননা সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব দেয়া যায় না।[৬৩]

মালিকী মাযহাবের কিতাবসমূহের মধ্যে যে বর্ণনাগুলো অগ্রাধিকার পাবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : ইমাম মালেক মুদাওয়ানা গ্রন্থে যে মত পোষণ করেছেন, তা অধিক শক্তিশালী। অতঃপর মুদাওয়ানা গ্রন্থে ইবনে কাসেম যে মত পোষণ করেছেন, তা মুদাওয়ানা গ্রন্থের অন্যান্য মত হতে শক্তিশালী। কেননা, ইবনে কাসেম ইমাম মালেকের মাযহাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর অন্যান্য ফকীহগণ মুদাওয়ানা গ্রন্থে যে মত পোষণ করেছেন, তা অন্যান্য গ্রন্থে ইবন কাসেমের মত অপেক্ষা শক্তিশালী। আর যদি কোন মাস্'আলা মুদাওয়ানাতে না পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য গ্রন্থে যেতে হবে।

- المذهب বলতে মালেকী মাযহাব বোঝানো হয়।

- المشهور বলতে মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত বোঝানো হয়। আর তা দ্বারা বোঝা যায় যে, মাযহাবের এ সম্পর্কে কোন মতবিরোধ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে المشهور বলতে যে মতের সমর্থনকারীদের সংখ্যা বেশি।

- قيل كذا ، اختلف في كذا ، في كذا قولان فأكثر ইত্যাদি দ্বারা বোঝা যায় যে, মাযহাবে এ সম্পর্কে কয়েকটি মত আছে।

- روايتان বলতে ইমাম মালেক হতে দুই বর্ণনা আছে বলে বোঝা যায়। মালেকী মাযহাবের গ্রন্থকারদের নিয়ম হচ্ছে যে, ফাতাওয়া হবে বিখ্যাত মতের উপর অথবা মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতের উপর। অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত বা অপরিচিত মতামত তথা দুর্বল মতামত অনুসারে ফাতাওয়া দেয়া যাবে না এমনকি নিজে ব্যক্তিগতভাবেও কেউ আমল করতে পারবে না। বরং যদি অন্যের মত এ ব্যাপারে শক্তিশালী হয় তবে সেটা দুর্বল মতের উপর প্রাধান্য পাবে।[৬৪]

তালফীক বা একই ইবাদাতে দুই মাযহাবের দু'টি মত নিয়ে একটি ভিন্ন মত তৈরি করা মালেকী মাযহাবের মিসরী আলিমদের নিকট নিষিদ্ধ। তবে তাদের মাগরিব ইউনিয়নভুক্ত আলিমদের নিকট জায়েয।[৬৫]

---

৬৩. আবূ যাহরা, মালিক, পৃ. ৪৫৭।

৬৪. দাসূকী, হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশ-শারহুল কাবীর লিদ দারদীর, ১/২০।

৬৫. প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

আল্লামা শাইখ খলীল (মৃ. ৭৬৭ হি.)-এর গ্রন্থ এবং এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারীদের দ্বারা গঠিত তার মাদ্রাসাটিই বিভিন্ন মত বর্ণনা ও প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে মালেকী মাযহাবে বিবেচিত।

৩. শাফে'য়ী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ থেকে দশোর্ধ বেশ কিছু মাস্আলাতে দুই বা ততোধিক মত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বেচা-কেনার ক্ষেত্রে দেখার সুযোগ সংক্রান্ত মাসআলার এক বর্ণনায় জায়েয, অপর বর্ণনায় নাজায়েয বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ যদি তার কাছে থাকা সম্পদের সমান হয় তবে তাকে যাকাত দিতে হবে কিনা? তদ্রূপ, কোন দেউলিয়াগ্রস্ত লোক তার কাছে অপরের কোন ঋণ আছে বলে স্বীকার করলে, সে ব্যক্তি কর্জদাতাদের কাতারে শামিল হবে কি না? অনুরূপভাবে কেউ যদি কাউকে স্ত্রীর ব্যাপারে ধোঁকা দেয়, যেমন বিয়ের সময় তাকে যে বংশের বলা হয়েছিল পরবর্তীতে তার বিপরীত প্রমাণিত হয়, তখন সে কি বিয়ে ভংগ করার ক্ষমতা লাভ করবে নাকি বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে? ইত্যাদি।[৬৬] এ সমস্ত মাসআলাতে তিনি বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে দু'ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি সম্ভবত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করছিলেন। সুতরাং যখনই ইমাম শাফে'য়ীর দু'ধরনের মত পাওয়া যাবে তখন তার মাযহাবের প্রথম যুগের মাসআলা অন্বেষণকারী আলিমদের মত অনুসারে ফাতাওয়া দিতে হবে।[৬৭] নতুবা এ ব্যাপারে মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আর যদি কোন মাসআলাতে ইমাম শাফে'য়ীর সাথীদের ভিন্ন ভিন্ন দিক বর্ণিত হয়ে থাকে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়ে থাকে তবে সেখানে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ যা প্রাধান্য দিয়েছেন সেটা অনুসারে ফাতাওয়া দিবে। তারপর যারা বেশি জানে বলে স্বীকৃত তাদের মতামত অনুসারে ফাতাওয়া গৃহীত হবে, তারপর যারা বেশি পরহেযগার তাদের প্রাধান্য দেয়া মত অনুসারে ফাতাওয়া হবে। আর যদি তাদের থেকে কোন মতের প্রাধান্য বর্ণিত না থাকে তবে যা বুওয়াইতী, রবী আল-মুরাদী এবং মুযানী ইমাম শাফে'য়ী থেকে বর্ণনা করেছেন সেটি অগ্রাধিকার পাবে।

ইমাম আবূ যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন-নাওয়াবীই (নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) সত্যিকার অর্থে শাফে'য়ী মাযহাবের মতামতের লেখক হিসেবে বিবেচিত। তিনি এ মাযহাবটিকে পরিমার্জিত করেছেন এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত কি হবে তা তার গ্রন্থ মিনহাজুত তালেবীন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাই শাফে'য়ীদের নিকট সেটিই ধর্তব্য বিবেচিত

---

৬৬. আবূ যাহরা, আশ-শাফে'য়ী, পৃ. ১৭২-১৭৫।

৬৭. প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

হয়েছে। এমনকি তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ যেমন, রাওদাতুত তালেবীনও অনুরূপ গ্রহণযোগ্য। তারপর যাকারিয়্যা আল-আনসারীর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলীর মত। সুতরাং ফাতাওয়া হবে ইমাম নাওয়াবীর মিনহাজ গ্রন্থের মতানুসারে, রামলীর নিহায়াতুল মুহতাজ, ইবন হাজার হাইসামীর তুহফাতুল মিনহাজ, তারপর যা শাইখ যাকারিয়্যা আল আনসারী বর্ণনা করেছেন, সে অনুসারে।

মনে রাখতে হবে যে, ইমাম শাফে'য়ীর মতামতকে বলা হয় أقـوال এবং তাঁর সাথীদের মতামতকে বলা হয় أوجـه। আর ইমাম শাফে'য়ীর মাযহাব বর্ণনায় বর্ণনাকারীদের ভিন্ন ভিন্ন মতকে طرق বলা হবে। সুতরাং শাফে'য়ী মাযহাবে মতামতের বিভিন্নতার তিনটি নাম রয়েছে। একটি হচ্ছে أقـوال যা ইমাম শাফে'য়ীর দিকে সম্পর্কযুক্ত। আর الأوجه যা শাফে'য়ী মাযহাবের ফকীহগণ ইমাম শাফে'য়ীর নিয়মনীতি ও মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গবেষণা করে নির্ধারণ করেছেন। পক্ষান্তরে الطرق বলা হবে মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন অবস্থানে থাকাকে।

- الأظـهر বলতে ইমাম শাফে'য়ীর দু বা ততোধিক শক্তিশালী মতের মধ্যে যেটি স্পষ্ট সেটি বোঝানো হবে। যার বিপরীতে 'ظاهر' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- المشـهـور বলতে ইমাম শাফে'য়ীর দুই বা ততোধিক মত, যেগুলোর মধ্যকার মতবিরোধ তেমন শক্তিশালী নয়, সেগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ মত বোঝানো হয়ে থাকে। এর বিপরীত মতকে বলা হয় غـريـب।

الأظـهر এবং المشـهـور এ দু'টি ইমাম শাফে'য়ী থেকে বর্ণিত মতামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- الأصـح দ্বারা ইমাম শাফে'য়ীর সঙ্গীগণ তার কথা ও মাযহাবের মূলনীতির ভিত্তিতে যে কয়েকটি শক্তিশালী মত বের করেছেন, তার মধ্যে বিশুদ্ধ মত-কে বোঝানো হয়। এর বিপরীত মতকে বলা হয় صحيح।

- الصـحـيـح দ্বারা বোঝানো হবে, যেখানে দুই বা ততোধিক أوجه রয়েছে। কিন্তু শাফে'য়ীদের মধ্যে এ ব্যাপারে খুব শক্তিশালী মতবিরোধ ছিল না। এর বিপরীত মতকে বলা হবে, ضـعـيـف।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, صحـيـح ও أصـح দুটিই ইমাম শাফে'য়ীর সঙ্গীগণ থেকে বর্ণিত মতামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- المذهـب বলে দু' বা ততোধিক طرق থেকে নেয়াকে বোঝায়, যা মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন বর্ণনাকে নির্দেশ করে। যেমন কেউ কোন মাসআলাতে দু'টি মত বর্ণনা করল বা পূর্ববর্তীদের থেকে দু'টি وجـه বর্ণনা করল, কেউ সে দু'টির

www.waytojannah.com

Contents

একটির সত্যতাকে অকাট্যভাবে উপস্থাপন করল, তখন অকাট্যভাবে উপস্থাপিত মতটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হতে পারে আবার তা নাও হতে পারে, তখন المذهب। বলা হলে বোঝা যাবে যে, এটিই মাযহাবে ফাতাওয়া দেয়া মত।

- النص। বা ইমাম শাফে'য়ীর সুস্পষ্ট বাণী। এর বিপরীতে কখনও কখনও দুর্বল وجه বা কোন সুস্পষ্ট মতের উপর ভিত্তি করে কিয়াস করে দেয়া মত থাকতে পারে। তবে কখনও কখনও نص বা শাফে'য়ীর সুস্পষ্ট বাণীর বিপরীতেও ফাতাওয়া হয়ে থাকে।

- الجديد। এটি ইমাম শাফে'য়ীর পুরাতন মাযহাবের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এটি তিনি মিসরে অবস্থানকালে যে সমস্ত ফাতাওয়া কিংবা গ্রন্থ লিখেছেন সেগুলোর প্রতি দিকনির্দেশ করে। এগুলোর বর্ণনাকারী হলেন আল-বুওয়াইতী, আল-মুযানী, রবী আল-মুরাদী, হারমালাহ, ইউনুস ইবন আবদিল আ'লা, আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর আল-মাক্কী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল হাকাম প্রমুখ। প্রথম তিনজন থেকে প্রচুর বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে বাকীদের থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

- القديم। এটি ইমাম শাফে'য়ীর পুরাতন মাযহাব, যা তিনি ইরাকে অবস্থানরত অবস্থায় তার গ্রন্থ الحجة। এ লিখেছিলেন বা ফাতাওয়া দিয়েছিলেন। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আয-যা'ফরানী, কারাবীসী, আবূ সাওর প্রমুখ। ইমাম শাফে'য়ী তাঁর এ সমস্ত মত প্রত্যাহার করেছেন। তিনি এগুলো দিয়ে ফাতাওয়া জায়েয করেননি। তবে তাঁর সাথীরা ১৭টি মাসআলায় এ পুরাতন মাযহাব অনুসারে ফাতাওয়া দিয়েছেন।

যদি কোন মাসআলায় নতুন ও পুরাতন দু'টি মত থাকে তখন নতুনটির উপরই আমল করতে হবে। তবে ১৭টি মাসআলা এর ব্যতিক্রম।

যদি নতুন মাযহাবেও দু'টি মত থাকে তবে সর্বশেষটি অনুসারে আমল করতে হবে। আর যদি সর্বশেষ কোন্‌টি তা জানা সম্ভব না হয় তখন যদি ইমাম শাফে'য়ী এর কোন একটির উপর আমল করেছেন বলে প্রমাণিত হয় তখন অপরটি অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে বা অপরটির উপর প্রাধান্য পাবে।

- قيل বলা হলে মতটি দুর্বল বিবেচিত হবে। যার বিপরীত صحيح বা أصح হবে।

- الشيخان। বললে রাফে'য়ী এবং নাওয়াবীকে বোঝানো হবে।

- ইবন হাজার বলেন, মাযহাবের দুর্বল বর্ণনার উপর আমল করা যাবে না। কোন মাসআলাতে تلفيق তথা বিভিন্ন ইমাম বা মাযহাবের মত নিয়ে এসে একটি নতুন

www.waytojannah.com

পদ্ধতি দাঁড় করানো যাবে না। যেমন, কেউ কুকুরের খাওয়া অবশিষ্ট পানির পবিত্রতার উপর ইমাম মালেকের মত গ্রহণ করল, আর শাফে'য়ীর মাযহাব অনুসারে মাথার একাংশ মসেহ করল এবং সে অনুসারে একটি সালাত আদায় করল। এটি বৈধ নয়।

তবে কোন মাসআলায় পুরোপুরি অন্য মাযহাব অনুসরণ করা জায়েয। এমন কি যদি আমল করার পরও তা করে। যেমন কেউ কোন একটি ইবাদাত চার মাযহাবের কোন মাযহাব অনুসারে আমল করল, যে মাযহাব অনুসারে সেটি শুদ্ধ। এমতাবস্থায় তার এ কাজটি বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। এটি পুনরায় তাকে আদায় করতে হবে না। এমনটি কোন এক মাযহাব থেকে অপর মাযহাবে গমন করাও সিদ্ধ, যদিও তা আমলটি সম্পন্ন করার পরও হয়।[৬৮]

৪. হাম্বলী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ

ইমাম আহমদ্ ইবন হাম্বলের মাযহাবের মাসায়েলগুলোতে বহু মতামত পাওয়া যায়। এর কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ইমাম আহমদ প্রথমে নিজের মতামতের ভিত্তিতে কোন ফাতাওয়া দেওয়ার পর কোন হাদীসে তার বিপরীত দেখলে সে মতেও ফাতাওয়া দিতেন। মাঝে-মধ্যে তিনি প্রশ্নকারীর অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন রকম ফাতাওয়া দিতেন। আরেকটি কারণ হলো কিছু কিছু মাস্আলাতে সাহাবাদের মতপার্থক্য।

ইমাম আহমদের মাযহাবের আলিমগণ এ সমস্ত মত ও বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বা অগ্রাধিকার প্রদানে দু'টি মতে বিভক্ত হয়েছেন। কোন কোন আলিম দু'টি মত বর্ণনাকেই গুরুত্ব দিতেন। তাদের মতে এর মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে যে প্রশস্ততা রয়েছে তা ব্যাপকভাবে ফুটে উঠবে। পক্ষান্তরে অপর আলিমগণ সেসব মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। তারা তারিখ অনুযায়ী কিংবা দুটি মতের মধ্যে মূল্যায়ন করে দলীল-প্রমাণের দিক থেকে যেটি শক্তিশালী সেটা অনুসারে অথবা ইমামের কথা ও তাঁর মাযহাবের রীতি-নীতি অনুসারে প্রাধান্য দিতে চাইতেন। যদি প্রাধান্য দেয়া সম্ভব না হয় তবে মাযহাবে দু'টি মত আছে স্বীকৃত হয়ে যায়। ফলে মুকাল্লিদের পক্ষে যেটি স্পষ্ট প্রমাণিত হবে সেটি গ্রহণ করতে পারে। কাযী আলাউদ্দিন আলী ইবন সুলাইমান আস-সা'দী আল-মারদাওয়ী এ দ্বিতীয় মতটি অনুসারে তার গ্রন্থে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত নির্ধারণের চেষ্টা চালিয়েছেন।[৬৯]

---

৬৮. বুজাইরমী আল-খতীব, ১/৫১।

৬৯. আবূ যাহরা, ইবনে হাম্বল ১৮৯-১৯৩; আল-বাহুতী, মুকাদ্দামাতু কাশ্‌শাফুল কানা': ১/১৭-১৯; ইবনে বাদরান, আল-মাদখালু ইলা মাযহাবি আহমাদ, পৃ. ২০৪।

www.waytojannah.com

Contents

- شيخ বা شيخ الإسلام দ্বারা হাম্বলীদের নিকট আবুল আব্বাস আহমদ তাকীয়ুদ্দীন ইব্‌নে তাইমিয়্যাহ্ আল-হাররানী (মৃ. ৭২৮ হি.) বোঝানো হয়।

ইবন তাইমিয়্যাহ্‌র আগের যুগের হাম্বলী ফকীহ যেমন, ফুরু', ফা'এক, ইখতিয়ারাত গ্রন্থের প্রণেতাদের নিকট شيخ বলতে মুগনী, মুক্‌নি', কাফী, 'উমদা, মুখতাসারুল হিদায়া প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক আল্লামা মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে কুদামা আল-মাক্বদিসী (মৃ. ৬২০ হি.)-কে বোঝানো হয়।

- الشيخان : হাম্বলী মাযহাবের সাধারণত পূর্বোল্লিখিত মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইব্‌নে কুদামা এবং المحرر فى الفقه গ্রন্থের লেখক মাজ্‌দুদ্দীন আবুল বারাকাত ইবনে তাইমিয়্যাহ (মৃ. ৬৫২ হি.)-কে الشيخان বলা হয়।

- الشارح (আশ-শারেহ্) : এ পরিভাষাটি দ্বারা শামসুদ্দীন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইব্‌নে আবী উমর আল-মাকদিসী (মৃ. ৬৮২ হি.)-কে নির্দেশ করা হয়। তিনি মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবনে কুদামার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র ছিলেন। হাম্বলীরা যেখানেই قال فى الشرح বলে থাকে, তবে তা দ্বারা তার গ্রন্থ الشرح الكبير (যার অপর নাম الشافى شرح المقنع) বোঝানো হয়ে থাকে।

হাম্বলীদের নিকট গ্রহণযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আল-মুগনী, আশ-শারহুল কাবীর, বুহুতি রচিত কাশ্‌শাফুল কিনা' ও শারহু মুন্তাহাল-ইরাদাত গ্রন্থদ্বয়। আর সৌদী আরবের বিচারকার্য ও ফাতাওয়ায় গ্রহণযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে বুহুতী রচিত গ্রন্থদ্বয়, শারহুয-যাদ, শারহুদ-দালীল ইত্যাদি।

- القاضى বলতে কাযী আবূ ইয়া'লা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল ফার্‌রা (মৃ. ৪৫৮ হি.)-কে বোঝানো হয়ে থাকে।

- أبوبكر হলেন ইমাম আহমাদ ইব্‌নে হাম্বলের ছাত্র আবূ বক্‌র আল-মারর়ূযী (মৃ. ২৭৪ হি.)।

- وعنه অর্থ ইমাম আহমদ হতে বর্ণিত। نصاً অর্থ এটি ইমাম আহমাদ থেকেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

www.waytojannah.com

ফিকহ্-এর মাদরাসাসমূহ, এর উৎপত্তি ও বিকাশ

• কূফা ভিত্তিক মাদরাসাসমূহ ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী

কূফা ভিত্তিক প্রাথমিক মাদরাসাসমূহ ও তার বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আদেশে ইরাক এলাকায় পত্তন হয়েছিল নতুন শহর কূফা ও বসরা। সাহাবায়ে কিরামের এক জামা'আত এ নতুন শহর কূফায় বসবাস করতে থাকেন। আমীরুল মু'মিনীন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ফকীহুল উম্মাহ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে কূফার মুফতি, মু'আল্লিম ও প্রশাসক নিয়োগ করেন। সেখানে তাঁর দশ বছর অবস্থানকালে স্থানীয় জ্ঞানপিপাসু সবাই তাঁর সান্নিধ্যে এসে জ্ঞান পিপাসা নিবারণের মহা সুযোগ লাভ করেন।

চতুর্থ খলীফা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর শাসনামলে (৩৫-৪০ হি.) ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল কূফা। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে ফকীহ সাহাবীগণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা, এ দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের শিক্ষাধারার মাধ্যমে এখানে ইলমে দ্বীনের চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং কূফা অন্যতম দ্বীনী কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে এখানকার অনেক মুজতাহিদ তাবিঈ খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হচ্ছেন :

১. আলকামাহ ইবন কাইস আন-নাখ'য়ী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২ হি.)। তিনি ছিলেন ইরাকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি উমর, উসমান এবং আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বিশিষ্ট ও প্রধান শাগরিদ ও আচার-আচরণে তাঁর প্রতিচ্ছবি। তাঁর জন্ম রাসূলের যুগে হওয়ায় তাঁকে মুখাদরাম বলা হয়।

২. মাসরূক ইবন আজদা' রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৩ হি.)। তিনি উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আয়েশা (রা) প্রমুখ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁদের ফিকহেরও এক বিরাট অংশ তিনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩. আবীদাহ ইবন আমর আস-সালমানী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯২ হি.)। তিনি রাসূলের যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে রাসূলের দর্শন লাভ করেন নি। আলী ও আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার শাগরিদ।

www.waytojannah.com

৪. আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ আন-নাখ'য়ী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৫ হি.)। আলকামাহ এর ভাতিজা। কূফার বিশিষ্ট আলিম। মু'আয, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর শাগরিদ।

৫. শুরাইহ্ ইবন হারিস আল-কিন্দী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৮/৮০ হি.)। নবীযুগে জন্ম। উমর, আলী ও আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর শাগরিদ। দ্বিতীয় খলীফার যুগে কূফায় কাযী পদে নিযুক্ত হন। অব্যাহতভাবে ষাট বছর কাযীর পদে বহাল থেকে গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

৬. ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আন-নাখ'য়ী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৫ হি.)। ইরাকের বিশিষ্ট ফকীহ আলকামাহ, মাসরূক, আসওয়াদ ও আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শাগরিদ ছিলেন।

৭. সা'য়ীদ ইবন জুবাইর রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৫ হি.)। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ছাত্র ছিলেন। ইরাকের সর্বজনস্বীকৃত ফকীহ।

৮. আমর ইবন শুরাহ্বীল রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪ হি.)। তাবিঈদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। আলী, আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আয়েশা ও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শাগরিদ ছিলেন।

৯. আব্দুর রাহমান ইবন আবি লায়লা রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৩ হি.)। কাযী ও ফকীহ। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শাগরিদ ছিলেন।

১০. আমির আশ-শা'বী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৪ হি.)। তিনি কূফার ফকীহ ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন।

১১. হাম্মাদ ইবন আবি সুলায়মান রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১২০ হি.)। ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ। ইবরাহীম আন-নাখ'য়ীর বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম আবূ হানিফার বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন।

এদের হাতেই কূফার ফিকহ মাদরাসার পত্তন হয়েছিল। পরবর্তীতে যে মাদরাসার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা ইমাম আবূ হানিফা নু'মান ইবন সাবেত রাহেমাহুল্লাহকে দেখতে পাই।

এ মাদরাসার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

এখানে কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি গবেষণা ভিত্তিক ফিকহী মতবাদ যা 'রায়' নামে খ্যাত তার প্রসার ঘটে। তাছাড়া এখানকার আলিমগণ এমন বহু মাসআলার উত্তরও দিতেন যা এখনো ঘটেনি। কারণ, এখানকার শহরগুলোতে সব ধরনের মানুষের সমাবেশ ঘটত। যাদের সমস্যার অন্ত নেই, সুতরাং এখানকার আলিমগণ সে সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতেন।

www.waytojannah.com

পরবর্তী মাদরাসাসমূহ ও তার বৈশিষ্ট্য

কূফা ভিত্তিক পরবর্তী মাদরাসাসমূহ বেশির ভাগই ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ কেন্দ্রিক। সে সময়ে কূফায় আরো বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফার মত তাদের ছাত্রগণ তাদের মতামতকে তুলে ধরতে সমর্থ হননি। তাই পরবর্তী মাদরাসাসমূহের মূল স্থপতি হিসেবে আমরা ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহর কথাই এখানে আলোচনা করব।

ইমাম আবূ হানিফা (র) (৭০/৮০-১৫০হি.) ও তাঁর ফিকহ

মুজতাহিদ ইমামগণের শিরোমণি ছিলেন ইমাম আবূ হানিফা আল-কূফী রাহেমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন একাধারে কুরআন বিশেষজ্ঞ, হাফিযে হাদীস, শ্রেষ্ঠতম মুজতাহিদ, ফকীহ, শ্রেষ্ঠ কালাম শাস্ত্রবিদ এবং যুগের সবার সেরা আলিমে দ্বীন ও কামিল অলী। মহান আল্লাহ প্রদত্ত তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সুখ্যাতির কারণে সমসাময়িক ইসলামী ব্যক্তিত্বগণের উপর তাঁর প্রাধান্য ছিল ঈর্ষার বিষয়। কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য বলে, তিনি নিঃসন্দেহে তাবিঈগণের মধ্যে শামিল।[৭০]

ইলমে দ্বীনের প্রসিদ্ধ নগরী কূফায় তিনি এক ধনাঢ্য, ইসলামী ঐতিহ্যের অধিকারী সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৭১] ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কূফা নগরী প্রথম হিজরী শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই ইসলামী উলূমের প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়েছিল। বহু বদরী সাহাবাসহ প্রায় পনের শত সাহাবায়ে কিরাম কূফায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ফকীহুল উম্মাত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে কূফায় মু'আল্লিম নিয়োগ করেন। দশ বছরের বেশি কাল তিনি কূফায় অবস্থান করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তা'লীম ও তারবিয়াতের ফলে কূফার ঘরে বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহের সমাবেশ ঘটে এবং ইলমে দ্বীনের ব্যাপক চর্চা প্রসার লাভ করে। আলী মুরতাযা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কূফা নগরীকে দারুল খিলাফত হিসেবে নির্বাচনের ফলে সেখানে ইলমে দ্বীনের আরও ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। এবং কূফা হয়ে উঠে ইলমের শ্রেষ্ঠ মারকায, আলেমে দ্বীনের মিলনকেন্দ্র ও বিচরণভূমি। সাহাবাগণের সাহচর্যে এসে অগণিত তাবিঈ এখানে ইলমে দ্বীন হাসিল করেন।

আলী ও আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন, আলকামা ইবন কায়স নাখ'য়ী (মৃ. ৬২ হি.), মাসরূক ইব্ন আজ্দা

---

৭০. ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম খন্ড), সম্পাদনা বোর্ড, ইফাবা ও আইম্মায়ে আরবা'আ।

৭১. প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা যাহিদ কাওসারী (র) ৭০ হিজরী প্রমাণ করেছেন। দেখুন, السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

www.waytojannah.com

(মৃ. ৬৩ হি.), 'আমর ইব্ন শুরাহবীল আল-হামাদানী (মৃ. ৬৪ হি.), শুরাইহ্ ইব্ন হারিস আল-কিন্দী (মৃ. ৮৭ হি.), আব্দুর রহমান ইবন আবি লায়লা (মৃ. ৮৩ হি.), আবীদাহ্ ইবন আমর আস-সালমানী (মৃ. ৯২ হি.), আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ নাখ'য়ী (মৃ. ৯৫ হি.), ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আন-নাখ'য়ী (মৃ. ৯৫ হি.), সুলায়মান ইবন রাবী'য়া আল-বাহিলী, যায়দ ইবন সাওহান, সুয়াইদ ইবন গাফালাহ্, হারিস ইবন কাইস, আব্দুর রহ্মান ইবন ইযায়ীদ নাখ'য়ী, আব্দুল্লাহ ইবন উতবাহ্ ইবন মাসউদ, সালামাহ ইবন সুহাইব, মালিক ইবন আমির, হুমাম ইবন হারিস, ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া নাখ'য়ী, রাবী' ইবন খাইসামা, উত্বা ইবন ফারকাদ, শারীক ইবন হাম্বল, শাকীক ইবন সালামাহ, উবাইদ ইবন নাদলাহ।[৭২]

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সাক্ষাৎ ছাত্র এবং সেকালের অনন্য শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ও ফকীহ তাবিঈ ইমাম আমির আশ-শা'বী রাহেমাহুল্লাহ ছিলেন ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর প্রধান উস্তাদ। আল্লামা হাফিয যাহাবীর মতে, هو أكبر شيخ أبى حنيفة "তিনি ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর শ্রেষ্ঠ উস্তাদ।"[৭৩] আমির আশ-শা'বী' ৪৮ জন সাহাবী থেকে রীতিমত হাদীস শিক্ষা করেন। এছাড়াও তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর খিদমতে প্রায় দশ মাস অবস্থান করে হাদীসে গভীর ইলম লাভ করেন। শা'বী-এর মৃত্যু পর্যন্ত ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ তাঁর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। উস্তাদের মৃত্যুর পর ১০০ হিজরীতে তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাম্মাদ ইবন আবি সুলায়মান-এর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর মৃত্যু (১২০ হি.) পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল তাঁর নিকট গভীর মনোনিবেশ সহকারে ইলম হাসিল করেন। উস্তাদের ওফাতের পর ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হাম্মাদ রাহেমাহুল্লাহ-এর ইলমী হালকায় সম্পৃক্ত থাকাকালেই ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ ইলমী মারকায বাসরা, মক্কা মু'আয্যামাহ, মদীনা মুনাওয়ারার শ্রেষ্ঠ উলামা-ই-কিরামের সাথে সাক্ষাৎ করে ইলমী ফায়দা হাসিল করেন। প্রকৃতপক্ষে সে কালের শ্রেষ্ঠ আলিমগণের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ইলমী আলোচনা হয়েছে। ইমামের শ্রেষ্ঠ উস্তাদগণ হলেন—

- হাম্মাদ ইবন আবি সুলায়মান (মৃ. ১২০ হি.)
- আমির ইবন শুরাহবীল* হিমইয়ারী আল-কূফী (মৃ. ১০৩ হি.)
- আলকামা ইবন মারসাদ আল-কূফী (মৃ. ১০৪ হি.)

---

৭২. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কে'য়ীন, ১/২৫।

৭৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খন্ড।

* আলমুনজিদ ফিল আলামে শারাহীল বলে উল্লেখ রয়েছে (পৃ. ৩৩৩), তবে আল-ইকমাল গ্রন্থে শুরাহবীল বলে উল্লেখ রয়েছে।

www.waytojannah.com

- সালিম ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর মাদানী (মৃ. ১০৬ হি.)
- হাকাম ইবন কুতায়বা আল-কূফী রাহেমাহুল্লাহ
- ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস আল-মাক্কী (মৃ. ১০৭ হি.)
- সুলায়মান ইবন ইয়াসার মাদানী (মৃ. ১০৭ হি.)
- আসিম ইবন ইয়াসার মাদানী (মৃ. ১০৭ হি.)
- আসিম ইবন আবিন নাজূদ আল-কূফী রাহেমাহুল্লাহ
- সালামাহ্ ইবন কুহাইল আল-কূফী (মৃ. ১২৩ হি.)
- আলী ইবন আকমার আল-কূফী
- আতা ইবন আবি রাবাহ আল-মাক্কী (মৃ. ১১৪ হি.)
- যিয়াদ ইবন আলফাহ আল-কূফী
- হায়সামা ইবন হাবীব
- আল-বাকির মুহাম্মদ ইবন আলী (মৃ. ১১৪ হি.)
- আদী ইবন সাবিত আনসারী
- আতিয়্যা ইবন সা'য়ীদ আওফী
- আবূ সুফিয়ান সা'দী
- আবূ উমায়্যাহ্ আবদুল করীম
- আবূ মুযারিফ আল-বাসরী
- ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ আল-আনসারী
- হিশাম ইবন উরওয়া আল-মাদানী
- নাফি' মাওলা ইবন উমার আল-মাদানী (মৃ. ১২০ হি)
- আমর ইবন দীনার আল-মাক্কী
- আবদুর রহমান ইবন হরমুয আল-আ'রাজ আল-মাদানী (মৃ. ১১৭ হি.)
- আবূ ইসহাক আস-সাবি'য়ী-আল-কূফী (মৃ. ১২৭ হি)
- মুহারিব ইবন দিসার আল-কূফী (মৃ. ১২৬ হি.)
- মুহাম্মদ ইবন দিসার আল-কূফী
- মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির
- ইবন শিহাব যুহরী আল-মাদানী (মৃ. ১২৪ হি.)
- আবূ যুবাইর আল-মাক্কী (মৃ. ১২৭ হি.)
- সিমাক ইবন হারব আল-কূফী
- কায়স ইবন মুসলিম আল-কূফী
- ইয়াযীদ ইবন সুহায়ব আল-কূফী
- আব্দুল আযীয-আল-কূফী

www.waytojannah.com

- আব্দুল্লাহ ইবন দীনার আল-মাদানী (মৃ. ১২৭ হিঃ)
- আবূ যুবায়র মুহাম্মদ মুসলিম আল-মাক্কী
- মানসূর ইবন মিহরান। এছাড়াও অনেক তাবিঈ।[৭৪]

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ হাম্মাদ ইবন আবি সুলায়মান রাহেমাহুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর উস্তাদের হালকায়ে দারসের স্থলাভিষিক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর দারস ও তদবীরের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আলিম ছাত্রগণ তাঁর দারসে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তৎকালে অন্য কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহর এত সংখ্যক ছাত্র ছিল না। মক্কা মু'আয্যামাহ্, মদীনা মুনাওওয়ারা, দামেশ্‌ক, বাসরা, কূফা, ওয়াসিত, মসুল, জাযীরা, রিক্কা, রামাল্লাহ, মিসর, ইয়ামেন, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়ায, কিরমান, ইসফাহান, হালওয়ান, হামাদান, দাগমান, তাবারিস্তান, জুরজান, সারাখস্, নীসাপুর, বুখারা, সামারকন্দ, তিরমিয, বল্‌খ, কুহিস্তান, খাওয়ারিজম, সিজিস্তান, মাদইয়ান, হিমস ইত্যাদি এলাকার হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইমাম আবূ হানিফার দারসে শরীক হন এবং কুরআন, হাদীস, ফিকহ্ ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।[৭৫]

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ তাঁর ছাত্রদেরকে বর্তমান যুগের মত গতানুগতিক সবক পড়াতেন না। বরং ইলমী আলোচনা-পর্যালোচনা অনুশীলনের ন্যায় পাঠ দান করতেন। যে বিষয়টি আলোচনাধীন হতো, তা তিনি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন এবং এ বিষয়ে শর'য়ী নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। ব্যাপক পর্যালোচনা হতো। প্রত্যেক ছাত্রই নিজ নিজ মতামত ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। এ বিষয়ে সকলে তাঁদের মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার পেতেন। এ আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক দীর্ঘ দিন চলতো। অবশেষে সার্বিক দিকের উপর গভীর চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ পূর্বক ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতেন। যা সে ইলমী পর্যালোচনা ও অনুশীলনের ফলাফল হত এবং বিশ্লেষণমূলক ও সন্তোষজনক হতো। তাঁর এ অভিমত এত সুন্দর হতো যে, সবাই তা গ্রহণে বাধ্য হতেন।

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর ছাত্রদের মধ্যে বহু সংখ্যক কুরআন বিশেষজ্ঞ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বিচারক ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যেঃ

- কাযী আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (মৃ. ১৮২ হি.)
- মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি.)

---

৭৪. ইবনে হাজার আল-মাক্কী, আল-খাইরাতুল হিসান; আস-সাইমারী, আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি।

৭৫. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ১ম খন্ড, সম্পাদনা বোর্ড, ইফাবা।

www.waytojannah.com

- যুফার ইবন হুযায়ল আম্বারী (মৃ. ১৫৮ হি.)
- হাম্মাদ ইবন আবূ হানিফা (মৃ. ১৭৬ হি.)
- হাসান ইবন যিয়াদ (মৃ. ২০৪ হি.)
- আবূ ইসমাহ্ নূহ্ ইবন মরিয়ম আল-জামি' (মৃ. ১৭৩ হি.)
- কাযী আসাদ ইবন আমর আবূ মূতী
- হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ বালখী
- ফযল ইবন মূসা (মৃ. ১৯২ হি.)
- মুগীরা ইবন মিকসাম
- যাকারিয়া ইবন আবূ যায়দা
- আসাদ ইবন উমার (মৃ. ১৮৮ হি.)
- মিস'আর ইবন কুদাম
- সুফিয়ান সাওরী
- মালিক ইবন মিগওয়াল
- ইউসুফ ইবন খালিদ সিমতী (মৃ. ১৮৯ হি.)
- ইউনুস ইবন আবূ ইসহাক,
- দাউদ আত-তাঈ (মৃ. ১৬০ হি.)
- আফিয়া ইবন ইয়াযীদ (মৃ. ১৬০ হি.)
- মিন্দাল ইবন আলী (মৃ. ১৬০ হি.)
- হাসান ইবন সালিহ
- আবূ বকর ইবন আয়্যাশ
- ঈসা ইবন ইউনুস
- আলী ইবন মুসায়ের (মৃ. ১৮৯ হি.)
- হাফস ইবন গিয়াস (মৃ. ১৯৪ হি.)
- ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া ইবন আবূ যায়িদা (মৃ. ১৮২ হি.)
- আবুল আসিম নাবীল (মৃ. ২১২ হি.)
- জারীর ইবন আব্দুল হামীদ
- আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক, (মৃ. ১৮১ হি.)
- ওয়াকী ইবন জাররাহ (মৃ. ১৮৭ হি.)
- হাববান ইবন আলী (মৃ. ১৭২ হি.)
- আবূ ইসহাক ফাযারী
- ইয়াযীদ ইবন হারুন (মৃ. ২০৬ হি.)

www.waytojannah.com

Contents

- আব্দুর রায্যাক ইবন ইবরাহীম
- আব্দুর রায্যাক ইবন হাম্মাম আস-সান'আনী
- আব্দুর রহমান আল মুক্রী
- হায়সাম ইবন বাশীর
- কাসিম ইবন মা'আন (মৃ. ১৭৫ হি.)
- আলী ইবন আসিম
- ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ আল-কাত্তান (মৃ. ১৯৮ হি.)
- জাফর ইবন আওন
- ইবরাহীম ইবন তাহমান (মৃ. ১৬৯ হি.)
- হামযা ইবন হাবীব আয-যাইয়্যাত (মৃ. ১৫৮ হি.)
- ইয়াযীদ ইব্ন রাফি'
- যুবায়র
- ইয়াহইয়া ইব্ন-ইয়ামান
- খারিজা ইবন মুসআব
- মুস'আব ইবন কুদাম
- রাবীয়া ইবন আব্দুর রহমান রাঈ আল-মাদানী রাহেমাহুল্লাহ প্রমুখ।[৭৬]

• হিজায ভিত্তিক মাদরাসাসমূহ ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী

তাবিঈদের মাদরাসাসমূহ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ হতে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত মদীনা তাইয়্যেবাই ছিল মুসলিম জাহানের বড় শিক্ষায়তন। এ সময় খলিফাতুল মুসলিমীন ও আমিরুল মুমিনীনগণসহ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, যায়েদ ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ। তবে তাবিঈদের যুগে এ মাদরাসা উৎকর্ষ লাভ করেছে নিম্নবর্ণিত তাবিঈগণের মাধ্যমে।

১. সা'য়ীদ ইবন মুসাইয়্যাব আল-মাখযূমী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৫ হি.)। তাবিঈদের মধ্যে প্রখ্যাত আলিম ও ফকীহ। তাঁর সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি সাইয়্যেদুত তাবিঈন উপাধিতে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর জামাতা ও তাঁর ইলমের ধারক, বাহক।

---

৭৬. ড. মুস্তফা হাসান আস-সিবা'য়ী, আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'য়ীল ইসলামী।

www.waytojannah.com

২. উরওয়া ইবন যুবাইর রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৫ হি.)। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার আপন ভাগ্নে এবং তাঁর খাস শাগরিদ। তৃতীয় খলীফা উসমানের খিলাফতকালে তাঁর জন্ম।

৩. আবূ বকর ইবন আবদুর রাহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম আল-মাখযূমী আল-কুরাশী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৪ হি.)। বহু হাদীস বর্ণনাকারী ও শ্রেষ্ঠ ফকীহ।

৪. ইমাম আলী ইবন হুসাইন যায়নুল আবেদীন রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৪ হি.)। অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বিধায় যায়নুল আবেদীন বা ইবাদতকারীগণের শোভা উপাধিতে ভূষিত হন। ইমাম যুহরী বলেন, আমি তাঁর তুলনায় অধিক জ্ঞানী ফকীহ কাউকে দেখি নি।

৫. আব্দুল্লাহ ইবন উৎবাহ ইবন মাসউদ রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৮ হি.)। আয়েশা, আবূ হুরায়রা এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এর বিশিষ্ট শাগরিদ।

৬. মুসলিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৬ হি.)। তিনি ছিলেন আয়েশা, আবূ হুরায়রা এবং আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর বিশিষ্ট শাগরিদ।

৭. সুলায়মান ইবন ইয়াসার রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৭ হি)। তিনি ছিলেন মাইমূনাহ, আয়েশা, আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, যায়দ ইবন সাবিত প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের ছাত্র ও উঁচুস্তরের ফকীহ।

৮. নাফি' রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৭ হি.)। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আযাদকৃত দাস। তিনিও আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আয়েশা ও আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের বিশিষ্ট ছাত্র।

৯. মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয-যুহরী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১২৪ হি.)। তিনি ছিলেন হাদীসের বিশিষ্ট বর্ণনাকারী। আবদুল্লাহ ইবন উমর ও আনাস ও সা'য়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-এর শাগরিদ।

১০. মুজাহিদ ইবন জাবর রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৭ হি.)। তিনি ছিলেন মক্কাবাসী। তিনি ইবন আব্বাস, মু'আয ও সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর শাগরিদ।

১১. ইকরিমাহ রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৭ হি.) তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর আযাদকৃত দাস ছিলেন এবং তার ইলমের ধারক ও বাহক। বিখ্যাত তাফসীরবিদ।

১২. আতা ইবন আবী রাবাহ রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৪ হি.) তিনি ছিলেন মহা বিদ্বান ও হাফিযে হাদীস। আয়েশা, আবূ হুরায়রা এবং আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর শাগরিদ।

www.waytojannah.com

এ সমস্ত বিদগ্ধ আলিম ও ফকীহদের হাতেই মদীনা মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। তাদের ইলম ও আমলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ফিকহই ছিল পরবর্তী হিজায ভিত্তিক আলিম ও ফকীহগণের মূলশক্তি।

এ মাদরাসার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই মাদরাসার ফকীহগণ তাদের মাসআলার উত্তর কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক দিতেন। তাছাড়া তারা যে ঘটনা সংঘটিত হয়নি সেসব ব্যাপারে মুখ খুলতেন না। তাদের সময়ে জাল হাদীসের বিস্তার মদীনা বা মক্কায় খুব বেশি প্রসার লাভ করেনি। ফলে তারা অনেকটাই স্বাভাবিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তাবিঈ পরবর্তী মাদরাসাসমূহ

তাবিঈ পরবর্তী মাদরাসাসমূহের মধ্যে হিজাযে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাদরাসা হচ্ছে ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ-এর মাদরাসা। পরবর্তী বেশ কয়েকজন ইমাম তাঁর এ মাদরাসা থেকেই জ্ঞান লাভ করে আলিম ও বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এ জন্য সর্বপ্রথম আমরা ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহর আলোচনা করব। তারপর হিজায ভিত্তিক অন্যান্য বিখ্যাত আলিমের কথা আলোচন করব।

১) ইমাম মালিক ও তার ফিকহ (৯৩-১৭৯ হিজরী)

"ইমাম মালিক ইবন আনাস রাহেমাহুল্লাহ ছিলেন দারুল হিজরত" তথা মদীনা তাইয়্যেবার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। মদীনা শরীফেই ৯৩ হিজরীতে তাঁর জন্ম। অবশ্য ৯৫ হিজরীতে জন্ম বলেও বর্ণিত আছে। মদীনা তাইয়্যেবাতেই তিনি জ্ঞান সাধনা করেন এবং ১৭৯ হিজরীতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ তাঁর থেকে ইলমী ফায়দা হাসিল করেন।

মদীনা মুনাওয়ারার প্রখ্যাত মুজতাহিদ রাবীতুর রায় রাহেমাহুল্লাহ হতে ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ ইলমে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া শ্রেষ্ঠ ফকীহ তাবী'য়ীনে কিরাম থেকেও তিনি ইলম হাসিল করেন। অধিকাংশ হাদীসই তিনি ইমাম যুহরী রাহেমাহুল্লাহ থেকে শুনেছেন এবং মুখস্থ করেছেন। এ ছাড়া ইমাম নাফি' রাহেমাহুল্লাহ থেকেও তিনি অনেক হাদীস শুনেছেন। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। বছরের পর বছর পরম্পরায় ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ ইলম ও হাদীস অর্জনে নিমগ্ন ছিলেন। যার কারণে অবশেষে তিনি "আলিমুল মাদীনা" (عالم المدينة) উপাধিতেও ভূষিত হন। সারা বিশ্বে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট ফিকহ ও হাদীস শ্রবণের জন্য মদীনায় সমবেত হন। ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ মসজিদে নববীতেই হাদীসের দারস প্রদান

www.waytojannah.com

করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে মসজিদে নববীতে কখনো উচ্চস্বরে কথা বলতেন না তিনি। তিনি ছিলেন একজন হাফিযে হাদীস ও ফকীহ।[৭৭]

ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ ঐ সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ হতে ইলম হাসিল করেন, যাঁরা সত্যবাদিতা ও তাকওয়া, মেধা ও ইলমে ফিকহে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে-রাবি'আতুর রায়, নাফি' মাওলা ইবন উমার, ইবন শিহাব যুহরী, যায়দ ইবন আসলাম, আমির ইবন আব্দুল্লাহ, নাঈম ইবন আব্দুল্লাহ, হুমাইদ আত-তাওয়ীল, সা'য়ীদ মাকবারী, সালামাহ ইবন দীনার, শারীক ইবন আব্দুল্লাহ, সালিহ ইবন কায়সান, সাফওয়ান ইবন সুলাইম, আবূয্ যিনাদ, মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির, আব্দুল্লাহ্ ইবন দীনার, আবদু রাব্বিহ ইবন সা'য়ীদ, ইয়াহইয়া ইবন আবূ উমার, আব্দুর রহমান ইবন কাসিম, আইউব সাখতিয়ানী, সাওর ইবন যায়দ, আবূ আবালাহ মাকদাসী, হিশাম ইবন উরওয়াহ, ইয়াযীদ ইবন মুহাজির, আবূয যুবায়র মাক্কী, ইবরাহীম ইবন উকবা, হুমাইদ ইবন কায়স আল-আ'রাজ আল-মাক্কী, দাউদ ইবন হুসাইন, যিয়াদ ইবন সা'দ, যায়দ ইবন রাবাহ্, সুহাইল ইবন আবূ সালিহ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবূ বকর, আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ রাহেমাহুমুল্লাহ্ প্রমুখ।[৭৮]

ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ মদীনা তাইয়্যেবায় আজীবন কাটিয়েছেন। জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণ ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। কয়েকবার ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও ইলমী আলোচনা হয়েছে। অসংখ্য ছাত্র তাঁর থেকে ইলমী ফায়দা অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে—ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক, লাইস ইবন সা'দ, শু'বা, সুফিয়ান সাওরী, ইবন জুরাইজ, ইবন উয়াইনাহ্, ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ আল-কাত্তান, ইবন মাহদী, আবূ আসিম আল নাবীল, আব্দুর রহমান আল-আওযা'য়ী রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।[৭৯]

ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ ইলমে ফিকহ ও হাদীসে সমভাবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর মত মুরসাল হাদীস গ্রহণ করেন। ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ, ইমাম আবূ হানিফা ও অপরাপর মুজতাহিদগণের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী তাঁর মাযহাবের নীতিমালা গ্রহণ করেন। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ছিল তাঁর মাযহাবের মৌল নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও তিনি

---

৭৭. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত; ফাতাওয়া ও মাসাইল, ১ম খন্ড।

৭৮. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৪৯; ফাতাওয়া ও মাসাইল, ১ম খন্ড।

৭৯. কাযী আতহার হুসাইন, আয়িম্মায়ে আরবা'আহ ১/৮৯৮।

www.waytojannah.com

মদীনাবাসীগণের আমল এবং মাসালিহে মুরসালাকেও তাঁর ফিকহের নীতিমালায় গ্রহণ করেছেন। যেমন ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ ইসতিহ্সানকে, ইমাম শাফে'য়ী ইসতিসহাবকে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য ইমাম শাফে'য়ীর পরবর্তীতে অনেক মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ মদীনাবাসীদের আমলকে হুজ্জাত হিসেবে গ্রহণের জন্য ইমাম মালিকের সমালোচনা করেছেন। এ সমালোচনাকারীদের মধ্যে ইমাম ইবন হাযম রাহেমাহুল্লাহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবন হাযম রাহেমাহুল্লাহ তাঁর الإحكم فى أصول الأحكام গ্রন্থে এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও দলীলসম্মত সমালোচনা করেছেন। المحلى কিতাবে ইবন হাযম রাহেমাহুল্লাহ-এ বিষয়ের প্রতিবাদ করতে ক্রটি করেন নি। উল্লেখ্য যে, ইবন হাযম রাহেমাহুল্লাহ ইলমী বিষয়ে সর্বদাই তাঁর বিরোধীদের সমালোচনায় কঠোর ছিলেন।[৮০]

ইমাম মালিকের উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে—

১. আল-মুওয়াত্তা (الموطا) পৃথিবী খ্যাত গ্রন্থ। এটি ইমাম মালিকের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। মতপার্থক্য থাকলেও হানাফী ও শাফে'য়ী মাযহাবের অনেক আলিম এ গ্রন্থের শরাহ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) লিখেছেন। অবশ্য কেউ কেউ মুওয়াত্তার সমালোচনা করেছেন, যা ছিল অবান্তর ও অবাস্তব। আবার কেউ কেউ 'সুনান ইবনে মাজাহ' এর পরিবর্তে 'মুওয়াত্তা'কে সিহাহ সিত্তাহ' এর মধ্যে শামিল করেছেন। অবশ্য ব্যাপক ভাবে মুরসাল হাদীস গ্রহণের কারণে অধিকাংশ মুহাদ্দিস মুওয়াত্তাকে সিহাহ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত করেননি।[৮১]

২. رسالته إلى ابن وهب فى القدر (রিসালাতুহু ইলা ইবন ওহাব ফিল কাদর) এটি মূলত একখানা চিঠি, যা তিনি ইবন ওহাবকে লিখেছিলেন। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল কাদর বা তাকদীর সংক্রান্ত।

৩. كتاب النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر (কিতাবুন নুজূম-ওয়া হিসাবু-মাদারিয্ যামান ওয়া মানাযিলিল কামার) এ গ্রন্থখানা চাঁদের হিসাব-নিকাশ ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত। গ্রন্থখানার বর্তমানে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪. رسالة مالك فى الأقضية (রিসালাতু মালিক ফিল আকদিয়া) এটিও একখানা চিঠি, যা তিনি বিভিন্ন বিচারকদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। এতে বিচার-ফয়সালা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্থান পেয়েছিল।

৫. رسالته إلى أبى غسان محمد بن مطرف فى الفتوى (রিসালাতুহু ইলা আবী গাস্সান মুহাম্মদ ইবন মুতাররাফ ফিল ফাতওয়া) এটি একটি চিঠি। ফাতওয়া বিষয়ে তিনি আবূ গাস্সান মুহাম্মদ ইবন মুতাররাফকে লিখেছিলেন।[৮২]

---

৮০. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত।

৮১. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত।

৮২. ফাতাওয়া মাসাইল, ১ম খন্ড।

www.waytojannah.com

৬. رسالته إلى هارون الرشيد المشهورة في الأدب والمواعظ (রিসালাতুহু ইলা হারুনুর রাশীদ আল-মাশহুরাহ্ ফিল আদাবি ওয়াল মাওয়াইয) খলীফা হারুনুর রশীদকে লেখা একটি চিঠি। এতে ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ খলীফাকে বিভিন্ন শিষ্টাচার ও উপদেশ দিয়েছিলেন।

৭. التفسير لغريب القرآن (আত্-তাফসীরু লি-গারীবিল কুরআন) পবিত্র কুরআনের জটিল ও অপরিচিত শব্দাবলী ও বিষয়াদির তাফসীর এতে সন্নিবেশ করা হয়।

৮. كتاب السير (কিতাবুস সিয়ার) জীবনী বিষয়ক একখানা রিসালা-ছোট পুস্তক।

৯. رسالته إلى الليث في إجماع المدينه (রিসালাতুহু ইলাল লাইস ফী ইজমাইল মাদীনাহ্) এটিও একটি চিঠি, যা তিনি ইমাম লাইস রাহেমাহুল্লাহ-কে মদীনার বিভিন্ন ফিকহী বিষয়ে ইজমার (ঐকমত্যের) বিষয়ে লিখেছিলেন।

ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ সম্পর্কে সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ্ রাহেমাহুল্লাহ বলেন- "মালিক সহীহ হাদীস ব্যতীত বর্ণনা করতেন না এবং নির্ভরযোগ্য রাবী ব্যতীত কারো হাদীস তিনি বর্ণনা করতেন না।"

ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'য়ীদ আল-কাত্তান রাহেমাহুল্লাহ বলেন, "ইমাম মালিক হাদীসের একজন ইমাম ছিলেন।"

ইমাম মালিকের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপসংহারে আমরা তাঁর সাথে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর একটি সাক্ষাৎকার বর্ণনা করে শেষ করবো, যা আল্লামা কাযী 'ইয়াদ রাহেমাহুল্লাহ 'মাদারিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তা হলো "একদিন মদীনা শরীফে ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানিফার সাক্ষাৎ হয়েছিল। দীর্ঘ সময় তাঁরা ইলমী আলোচনা ও পর্যালোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তারপর ইমাম মালিক ঘর্মাক্ত অবস্থায় বের হয়ে আসলেন। লাইস ইবন সা'দকে বললেনঃ আমি ইমাম আবূ হানিফার সাথে মুনাযারা ও মুনাকাশায় (পরস্পর আলোচনা ও বিতর্ক) ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছি। হে মিসরী (ইবন সা'দ) "নিঃসন্দেহে তিনি (আবূ হানিফা) একজন মস্ত বড় ফকীহ।"[৮৩]

২) ইমাম শাফে'য়ী ও তাঁর ফিকহ (মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ্-শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ (১৫০-২০৪ হি.)

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস ইবন আব্বাস ইবন শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ। তিনি বংশ পরম্পরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ায় গাযা (গাযযায়) প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। দু'বছর বয়সে মায়ের সাথে মক্কা মুকাররমায় চলে আসেন। এখানেই তিনি

৮৩. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

Contents

শৈশব ও কৈশোর জীবন কাটান। দশ বছর বয়স পর্যন্ত ইলমে লুগাত ও কবিতা পড়েন। আরবী সাহিত্য ও ভাষার ইমাম আসমায়ী স্বয়ং হুযায়ল গোত্রের কবিতা ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ থেকে শুদ্ধ করে নিতেন। তারপর ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ মক্কার মুফতী মুসলিম ইবন খালিদ আয-যানজীর নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি মদীনা তাইয়্যেবা চলে আসেন এবং ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ-এর নিকট প্রত্যক্ষভাবে 'মুওয়াত্তা' অধ্যয়ন করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তারপর ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ ইয়ামেনের একটি প্রদেশে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশি দিন চাকুরী করতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হলো। ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ-এর হস্তক্ষেপে ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভ করেন। এরপর ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট হাদীস ও ফিকহে হানাফী অধ্যয়ন করেন এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ-এর ছাত্রদের লিখিত পান্ডুলিপিসমূহ সংগ্রহ করেন। বাগদাদ থেকে ফেরার পথে স্বীয় উস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন, خرجت من بغداد وقد حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير "ইমাম মুহাম্মদ-এর ইলম থেকে এক উটের বোঝা পরিমাণ ইলম নিয়ে আমি বাগদাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করছি।"

বাগদাদ থেকে ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ সরাসরি মক্কা মুকাররমায় আসেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। এ সময় তিনি ইলমী সফরে হিজায ও বাগদাদও গমন করেন। অবশেষে ১৯৯ হিজরীতে তিনি স্থায়ীভাবে মিসরে বসবাস শুরু করেন। মিসরেই তিনি তাঁর মাযহাব প্রবর্তন করেন। ২০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ ও ইজতিহাদী মাসাইল দুনিয়ার আনাচে-কানাচে এমনভাবে ছড়িয়ে দেন যে, এর ফলশ্রুতিতে তাকে 'নাসিরুস সুন্নাহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ মক্কা, মদীনা ও বাগদাদ ইত্যাদি এলাকার বহু ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস হতে ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মুসলিম ইবন খালিদ আয-যানজী, মালিক ইবন আনাস, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর ছাত্র), মুহাম্মদ ইবন আলী শাফে'য়ী, সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, ইবরাহীম ইবন সা'দ, সা'য়ীদ ইবন সালিম, ইসমাঈল ইবন উলাইয়্যাহ, ইসমাঈল ইবন জা'ফর রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ থেকে অসংখ্য ছাত্র ইলমে ফিকহ ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন হাসান ইবন মুহাম্মদ বাগদাদী, ইমাম আহমাদ

www.waytojannah.com

Contents

ইবন হাম্বল বাগদাদী, ইবন ইয়াহইয়া মিসরী, ইউনুস আব্দুল আ'লা, ইউসুফ ইবন ইয়াহইয়া, সুলায়মান ইবন দাউদ রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।[৮৪]

অপরাপর মুজতাহিদ ইমামের ন্যায় ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ-এর মাযহাবের উসূল ছিল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এছাড়াও তিনি 'ইসতিসহাব' উসূল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপক হারে 'খবরে ওয়াহিদ'-এর উপর আমলের কারণে তাঁর মাযহাবের পরিসীমা অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছিল বটে তবে মুরসাল হাদীসের উপর আমল পরিত্যাগের কারণে তাঁর মাযহাব সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এ কারণে তিনি সমালোচিত হন।

'মুসনাদে শাফে'য়ী' ও 'সুনানে শাফে'য়ী' ব্যতীত হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর কোন গ্রন্থ আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'মুসনাদে শাফে'য়ী' আবুল আব্বাস আসাম্ম রাহেমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। 'সুনানে শাফে'য়ী' ইমাম তাহাবী হানাফী রাহেমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। এ দু'টি গ্রন্থ তাঁর শিষ্যগণই সংকলন করেছেন যেমনিভাবে মুসনাদে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেননি বরং তাঁর শিষ্যগণই তা সংকলন করেছেন। ইজতিহাদী কাজে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর মত সার্বিকভাবে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি আলাদাভাবে হাদীসের দরস দিতে পারতেন না।

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ হাদীস রিওয়ায়েতের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন তাঁর 'আল-উম্ম' (الأم) ও আর-রিসালাহ (الرسالة) গ্রন্থে। এ গ্রন্থদ্বয়ে সুন্নাহ সম্পর্কে উচ্চাঙ্গের আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ তাঁর সম্পর্কে যথার্থ বলেছিলেন, إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي "মুহাদ্দিসগণকে হাদীস সম্পর্কে কিছু বলতে হলে ইমাম শাফে'য়ীর ভাষায় বলতে হবে।"[৮৫]

৩) ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ (১৬৪-২৪১ হিজরী) ও তাঁর ফিকহ

ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ-এর পুরো নাম ও উপাধি : আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বল আশ-শায়বানী রাহেমাহুল্লাহ। তিনি ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওখানেই প্রতিপালিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হন। ১৬ বছর বয়সে প্রথমেই তিনি হাদীস অন্বেষণে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইলমে হাদীস অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এছাড়াও বাগদাদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর কূফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামেন, সিরিয়া ইত্যাদি স্থানের বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও

৮৪. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত; ফাতাওয়া ও মাসাইল, ১ম খণ্ড।

৮৫. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

ফকীহগণ থেকে হাদীস ও ফিকহ-এর জ্ঞান হাসিল করেন। তারপর তিনি হাদীস সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। পরিশেষে তিনি কোন প্রকার মতপার্থক্য ছাড়া যুগের একজন সর্বসম্মত 'ইমামে হাদীস' বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ-এর নিকট ইলমে ফিকহ অর্জন করেন এবং ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ তাঁর নিকট ইলমে হাদীস অধ্যয়ন করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহেমাহুল্লাহ ইমাম আহমাদ-এর ছাত্র ছিলেন।[৮৬]

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ইমাম আবূ ইউসুফ, ইসমাঈল ইবন উলাইয়্যা, হুসায়ম ইবন বাশীর, হাম্মাদ ইবন খালিদ আল-খাইয়্যাত, মানসুর ইবন সালামাহ, আল-কুযাই, মুজাফ্ফর ইবন মুদরিক, উসমান ইবন উমার ইবন ফারিস, আবূ নযর হাশিম ইবন কাসিম, আবূ সা'য়ীদ মাওলা বনী হাশেম, মুহাম্মদ ইবন ওয়াসিত, মুহাম্মদ ইবন আবূ আদী, মুহাম্মদ ইবন জা'ফর গুনদর, ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ আল-কাত্তান, আবূ দাউদ তায়ালিসী, ওয়াকী ইবন জাররাহ, আবূ উসমান, সুফিয়ান ইবন উয়াইনা, মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ী প্রমুখ রাহেমাহুমুল্লাহ।

ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ-এর অসংখ্য ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হল :

সালিহ ও আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, হাম্বল ইবন ইসহাক, হাসান ইবন সাব্বাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক সাগানী, আব্বাস ইবন মুহাম্মদ দূরী, মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ মুনাদী, হাতিম রাযী, আবূ যুর'আহ দামিশকী, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ বাগাবী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, আবুল কাসিম বাগাভী রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।[৮৭]

ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ তাকওয়ার অধিকারী, হকের উপর অটল ও অবিচল, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত, উচ্চমানের এক ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি খালকে কুরআন (কুরআন সৃষ্ট)[৮৮] মতবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মু'তাযিলাদের মুকাবিলা করেন এবং নানাবিধ কষ্ট ও নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেন। ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর মত বন্দী জীবন কাটান এবং শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেও সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকেন। ইমাম আহমদ রাহেমাহুল্লাহ-এর মর্যাদা

---

৮৬. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত; ফাতাওয়া ও মাসাইল, ১ম খণ্ড।

৮৭. হুসনুত তাকাদী।

৮৮. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হচ্ছে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। আল্লাহ্‌র বাণী বা কথা যেহেতু আল্লাহ্‌র একটি গুণ, সেহেতু তা সৃষ্ট নয়। মহান আল্লাহ্ যেমন, তাঁর গুণও তেমন। সুতরাং কুরআনকে সৃষ্ট বলা যাবে না। পক্ষান্তরে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা কুরআনকে সৃষ্ট বস্তু মনে করত, যা ছিল সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা।

www.waytojannah.com

সম্পর্কে উম্মাতের উলামায়ে কিরামের অকুণ্ঠ সাক্ষ্য বিদ্যমান। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ বলেন : خرجت من بغداد وما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل "আমি বাগদাদে আহমাদ ইবন হাম্বল-এর চেয়ে মর্যাদাশীল অধিক জ্ঞানী, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও অধিক মুত্তাকী আর কাউকে রেখে যাইনি।" ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ ২৪১ হিজরীতে বাগদাদে মারা যান।

অপরাপর মুজতাহিদ ইমামের মত তাঁর মাযহাবের উসূল ছিল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। তবে তিনি হাদীস ও সুন্নাহকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, "কোন ব্যক্তি বিশেষের অভিমতের চেয়ে দুর্বল হাদীস আমার নিকট অধিক উত্তম।"

সাহাবায়ে কিরামের রায় ও ফাতওয়াকে তিনি সমধিকভাবে অনুসরণ করতেন। কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের একাধিক অভিমত পাওয়া গেলে তবে তাতেও তাঁর একাধিক মত পাওয়া যেত। এ কারণে কোন কোন মনীষী তাঁকে মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মধ্যে শামিল করেননি। যেমন হাফিয ইবন আব্দুল বার রাহেমাহুল্লাহ তাঁর الانتقاء গ্রন্থে আবূ হানিফা, মালিক ও শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ-এর জীবনী বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ-এর জীবনী বাদ দিয়েছেন। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী রাহেমাহুল্লাহ اختلاف الفقهاء গ্রন্থে ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ-এর নাম উল্লেখ করেননি। তবে একথা সত্য যে, নিঃসন্দেহে ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ একজন মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহ ছিলেন। যদিও হাদীসের প্রতি তিনি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন।[৮৯]

হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে 'মুসনাদে আহমাদ' ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ-এর অমর কীর্তি। তিনি তাঁর সংগৃহীত ও মুখস্থ সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই ও নির্বাচন করে চল্লিশ হাজার হাদীস দিয়ে তাঁর সংকলনকে সাজিয়েছেন। এতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের সংকলন ও বিন্যাস নীতি অনুসরণ করেন নি। তাঁর সংকলিত মুসনাদ-এর মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। কেউ কেউ এতে বর্ণিত সকল হাদীসকে হুজ্জত ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করেছেন। পক্ষান্তরে একদল মুহাদ্দিস তাঁর মুসনাদে সহীহ, যাঈফ এমনকি মাওযূ সকল প্রকার হাদীস রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী রাহেমাহুল্লাহ স্বীয় الموضوعات গ্রন্থে 'মুসনাদে আহমদ' থেকে অনেকগুলো হাদীসকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন এবং কোন কোনটিকে মাওযূ- জাল বলে সাব্যস্ত করেছেন। হাফিয ইরাকী রাহেমাহুল্লাহও প্রায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যাহোক, মুহাদ্দিসগণের

৮৯. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

মতে "মুসনাদে বর্ণিত সকল হাদীস হুজ্জত নয়।"[৯০] তবে মুসনাদে আহমাদ নিঃসন্দেহে হাদীসের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর গ্রন্থ।

● স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মাদরাসাসমূহ

উপরে বর্ণিত মাদরাসাসমূহ বাদে আরও কয়েক ধরনের মাদরাসা ছিল, যাদের অধীন কিছুও মাযহাবও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অনুসারীগণ অবশিষ্ট না থাকায় সে সমস্ত মাদরাসার মতবাদসমূহ তুলনামূলক ফিকহ্ চর্চার সময় উপরোক্ত চার মাযহাবের বর্ণনার সময় উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

ক. ইমাম আওযায়ী-এর মাযহাব

ইমাম আব্দুর রাহমান ইবন আমর ইবন ইয়াহমুদ আদ-দামেশকী আল-আওযায়ী রাহেমাহুল্লাহ ৮৮ হিজরীতে বা'লাবাক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আতা ইবন আবী রাবাহ, যুহরী ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নিকট তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। হাদীস অধ্যয়নের পর তিনি নিজস্ব ফিকহী চিন্তাধারা মুতাবিক ফাতাওয়া দিতে শুরু করেন এবং স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রবর্তক বলে পরিগণিত হন। তাঁর গবেষণা পদ্ধতি অনেকটাই মুহাদ্দিসগণের অনুরূপ ছিল। তিনি কিয়াস পছন্দ করতেন না। ১৫৭ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়।[৯১]

সিরিয়াবাসীদের মধ্যে আওযায়ী রাহেমাহুল্লাহর মাযহাব প্রচলিত ছিল। তিনি সিরিয়ার কাযীও ছিলেন। স্পেনে যখন উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আওযায়ীর মাযহাবও সেখানে প্রসার লাভ করে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তথায় এই মাযহাবের খুব প্রসার ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে শাফে'য়ী মাযহাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিরিয়া হতে এবং মালিকী মাযহাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পেন হতে তার মাযহাবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খ. ইমাম সুফিয়ান ইবন সা'য়ীদ আস-সাওরী

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ সুফিয়ান ইবন সা'ঈদ আস-সাওরী আল-কূফী ৯৭ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরায় ১৬১ হিজরীতে মারা যান। তিনি একজন মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। হাদীস ও অন্যান্য যাবতীয় দ্বীনী জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। ইবন খাল্লিকান বলেন, লোকেরা বলত যে, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সময়ে তিনি ছিলেন মানুষের মাথা। তারপর ইবন আব্বাস, তারপর শা'বী, তারপর সুফিয়ান আস-সাওরী। তবে তাঁর মাযহাব খুব বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। খলীফা মানসূর তাঁকে বিচারক

---

৯০. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত; ফাতাওয়া ও মাসাইল, ১ম খণ্ড।

৯১. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/১০৭।

www.waytojannah.com

নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর কিতাব পত্রাদি টাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেলেন। তিনি 'আল-জামেউল কাবীর, আল-জামেউস সাগীর এবং কিতাবুল ফারায়েয নামীয় গ্রন্থগুলো রচনা করেন।[৯২]

গ. লাইস ইবন সা'দ আল-মিসরী

ইমাম লাইস ইবন সা'দ ইবন আবদির রাহমান আল-মিসরী। কারও কারও মতে তাঁর পূর্বসূরীগণ মূলত পারস্যের ইস্পাহান নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তবে সেটা সমর্থিত হয়নি। ৯৪ হিজরীতে মিসরের কালকাশান্দাতে তাঁর জন্ম হয়। জ্ঞানার্জনের জন্য হিজায, ইরাকসহ বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। মক্কাতে তিনি ইবন শিহাব যুহরী থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে ইবন আবি মুলাইকা থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। তারপর ইমাম আবূ হানিফার মৃত্যুর পর ১৬১ হি.সনে ইরাক গমন করেন। সেখানে ইমাম মালিক-এর উস্তাদ রাবী'আর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন মাসআলায় তাঁর সাথে মতবিনিময় করেন। তারপর তিনি মিসরে ফিরে যান। তিনি ইমাম মালিককে খুব সম্মান করতেন। তিনি ইমাম মালিক ও তাঁর ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতে পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর প্রাত্যহিক সময়কে চারভাগে ভাগ করে পরিচালনা করতেন। গভর্নর ও বিচারকদের কর্মকাণ্ডকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাচাই বাছাই করতেন। যদি তা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত প্রমাণিত হত, তিনি তা খলীফার কাছে লিখে জানাতেন। অনুরূপভাবে তিনি হাদীসেরও দারস দিতেন। তাছাড়া মানুষের মাসআলা-মাসায়েলের জন্যও সময় নির্ধারণ করে রাখতেন। এমনকি মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যও তাঁর দিনের একটি সময় নির্ধারিত ছিল।

তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার দলীল গ্রহণ করতেন। ইমাম মালিক মদীনাবাসীদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কোন কোন মাসআলায় প্রাধান্য দিতেন কিন্তু ইমাম লাইস সেগুলোতে বিরোধিতা করতেন। তবে তিনি আহলে মদীনার কিরাআতকে প্রাধান্য দিতেন। হিজরী ১৭৫ সনে মিসরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর উপযুক্ত ছাত্রের অভাবে তাঁর মাযহাব প্রসার লাভ করেনি। ইমাম শাফে'য়ী বলেন, 'লাইস ইবন সা'দ ইমাম মালিক থেকেও বড় ফকীহ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ছাত্ররা তাঁকে সেভাবে তুলে ধরতে পারে নি'।

ঘ. ইমাম তাবারী-এর মাযহাব

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর ইবন ইয়াযীদ আত-তাবারী আল-বাগদাদী ২২৪ হিজরীতে তাবারিস্তানের আমল নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন শহরে গিয়ে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। রবী' ইবন সুলাইমান রাহেমাহুল্লাহ-এর নিকট তিনি শাফে'য়ী

৯২. খতীব আল-বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩।

www.waytojannah.com

ফিক্‌হ, ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা ও ইবন আবদুল হিকাম-এর নিকট মালিকী মাযহাব এবং আবূ মুকাতিল এর নিকট হানাফী ফিকহ শিক্ষা করেন। দেশ-বিদেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি কুরআনে হাফিয, হাদীসে দক্ষ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের রীতিনীতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইতিহাস ও তাফসীর খুবই প্রসিদ্ধ। পরবর্তী ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ তাঁর প্রণীত ইতিহাস ও তাফসীরকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'তাহযীবুল আসার' তাঁর লিখিত একটি হাদীসগ্রন্থ। তাছাড়া 'ইখতিলাফুল ফুকাহা' তাঁর রচিত একটি প্রসিদ্ধ ফিকহী গ্রন্থ। ৩১০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে মাযহাবের ধারক বা 'মুজতাহিদে মুতলাক' আলিমদের পরিসমাপ্তি ঘটে। তার মৃত্যুর পর আর কেউই 'মুজতাহিদে মুতলাক' হওয়ার দাবি করেননি।[৯৩]

ইমাম ইবন জারীর তাবারী খুব মেধাবী, প্রতিভাবান ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি তাঁর মাযহাবের ফিক্‌হী কিতাব 'লতীফুল কাউল', 'কিতাবুল বাসিত', 'কিতাবুল হুক্কাম ওয়াল মুহাদির ওয়াস সিজিল্লাত' ইত্যাদি নিজেই রচনা করেছেন।

ইমাম ইবন জারীর তাবারীর মাযহাব পূর্বাঞ্চলের কোন কোন দেশে প্রচলিত হয়। নিম্নোক্ত ছাত্রগণ তার মাযহাবের উপর কিতাব রচনা ও তার মাযহাব প্রচার করেছিলেন:

১. আলী ইব্‌নে আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ দাওলাবী: তিনি কিতাবু আফআলুন্নবী ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখেছেন।

২. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইব্‌নে মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবী সাল্‌জ আল-কাতিব।

৩. আবুল হাসান আহমদ ইব্‌নে ইয়াহ্‌ইয়া আল মনজাম আল-মুতাকাল্লিম: তিনি কিতাবুল মাদখাল ইলা মাযহাবিত তাবারী, কিতাবুল ইজমা ফীল ফিকহ্ আলা মাযহাবিত তাবারী, কিতাবুর রাদ্দ আলাল মুখালিফীন ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

৪. আবুল হাসান আদ্-দাকীকী হালওয়ানী।

৫. আবুল ফর্‌জ আল-মা'নী ইবনে যাকারিয়া আন-নহরওয়ানী: তিনি হাফিযে হাদীস ও তাবারী মাযহাবে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

তাবারী মাযহাব হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অতঃপর আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব চতুষ্টয়ের মাঝে তা বিলীন হয়ে যায়।[৯৪]

---

৯৩. ইবনে খিল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান, ১/৬২৫; যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/২০৭; ইবনুল ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব, ১/২৮৫; ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওআক্কে'য়ীন ৩/৭২।

৯৪. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/২৬৭।

www.waytojannah.com

• যাহেরী ফিকহের মাদরাসা ও তার গতি-প্রকৃতি

এ মাযহাবের প্রবর্তক বলে প্রসিদ্ধ আবূ সুলাইমান দাউদ ইবন আলী আল-খালফ আল-ইস্পাহানী রাহেমাহুল্লাহ ২০০ বা ২০২ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহ, আবূ সাওর ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহদের নিকট তিনি জ্ঞানার্জন করেন। প্রথম দিকে তিনি শাফে'য়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে নিজেই একটি স্বতন্ত্র মতের ধারক-বাহক হন। যা পরবর্তীতে যাহেরী মাযহাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার মাযহাবের ভিত্তি কুরআন ও হাদীসের যাহের বা প্রকাশ্য অবস্থা থেকে নেয়া হয়েছে বলে তাকে যাহেরী মতবাদ বলা হয়। তিনি কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট অর্থের উপর আমল করতেন। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বা প্রকাশ্য আয়াতে যদি কোন সমাধান না পাইতেন, তবে তিনি ইজমার উপর আমল করতেন। তিনি কিয়াস মোটেই মানতেন না। কোন ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও ইজমা-এ তিনটিতে সুস্পষ্ট বিধান না পেলে তিনি সেটাকে মুবাহ বা বৈধ বলে মনে করতেন। ২৭০ কিংবা ২৭৫ হিজরীতে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইমাম দাউদ আয-যাহিরী অনেক কিতাব লিখেছেন। যেমন, কিতাবু ইবতালিল কিয়াস, কিতাবু ইবতালিত তাকলীদ, কিতাবু খবরিল ওয়াহিদ, কিতাবু খবরিল মুওজিবে লিল ইলম, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুল খুসূস ওয়াল উমুম, কিতাবুল মুফাসসার ওয়াল মুজমাল ইত্যাদি।

ইমাম দাউদ আয-যাহেরীর মাযহাব তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ এবং আবুল হাসান আব্দুল্লাহ্ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুফলিস প্রচার করেন। আবুল হাসান আব্দুল্লাহ্ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থের লেখক আবূ মুহাম্মদ আলী ইবন আহমাদ ইবন সা'য়ীদ ইবন হাযম আল-আন্দালুসী রাহেমাহুল্লাহ এই মাযহাবের সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি ৪৫৬ হিজরীতে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর এ মাযহাব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

পঞ্চম শতাব্দীর পর আপামর মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে শুধু পূর্বোল্লিখিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব চতুষ্টয় বাকী থাকে। অন্যান্য মাযহাবের লোকেরা এই চার মাযহাবের লোকদের সাথে ক্রমান্বয়ে মিশে যায়। তবে এদের মতামত ও দলীল-প্রমাণাদি এখনও ফিকহে ইসলামীর এক বিশাল ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ফুকাহাদের ইখতিলাফ বা মতবিরোধের কারণসমূহ

ইখতিলাফ শব্দটির অর্থ অমিল, বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য ইত্যাদি। মত, পথ, ভাষা, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ যে কোনও রকমের বৈপরীত্য বোঝানোর জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

www.waytojannah.com

তবে মত ও চিন্তাগত অমিলের ক্ষেত্রেই 'ইখতিলাফ' শব্দটির ব্যবহার সমধিক। রাগিব আল-ইস্পাহানী 'ইখতিলাফ' এর সংজ্ঞায় বলেন, "ইখতিলাফ অর্থ একজন অপরজন হতে স্বতন্ত্র গতিবিধি বা পৃথক মত অবলম্বন করা।"[৯৫]

ইখ্‌তিলাফ বা মতানৈক্যের প্রকারভেদ

মুসলিম জাতির মধ্যে বিদ্যমান ইখ্‌তিলাফ মৌলিকভাবে দুই প্রকার ঃ

ক. ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইখ্‌তিলাফ,

খ. শাখাগত বিধি-বিধানের মধ্যে ইখ্‌তিলাফ।

ফিকহ্ শাস্ত্রে ইখতিলাফ বা মতানৈক্যের স্বরূপ

আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যই হলো মুসলিম জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এই ইবাদত ও আনুগত্যের একমাত্র উপায় হলো কুরআন ও সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় আমি রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে গোমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাব[৯৬] ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"[৯৭]

তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মৌলিক আকায়েদ (তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি) ও মৌলিক আহকাম (সালাত, সাওম ফরয হওয়া) ইত্যাদি যাবতীয় আলোচনা কুরআন ও হাদীসে সর্বসাধারণের বোধগম্য, সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে খুঁটিনাটি আহকাম ও বিধানগুলো বর্ণিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন ও দ্বার্থবোধক ভাষায়, যা চিন্তা-ভাবনা, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তদ্রূপ কালের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান কুরআন ও হাদীসে আলোচিত হয়নি। সুতরাং এসকল ক্ষেত্রে শরীয়তের সমাধান পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতিমালার আলোকে শরীয়ত নির্দেশিত পথে ইজতিহাদ ও চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সকল আহকাম ও বিধান আহরিত হয়েছে তারই নাম ফিক্হ শাস্ত্র।

যেহেতু মেধা, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণ সমপর্যায়ের ছিলেন না বরং প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের মাঝে তারতম্য ছিল। সেই সাথে তাদের মাঝে ইজতিহাদের প্রয়োগ ও পদ্ধতিগত পার্থক্যও বিদ্যমান ছিলো সেহেতু ফিকহী মাসায়েলের সমাধানের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে এবং সেটাই ছিলো স্বাভাবিক।

---

৯৫. আর-রাগিব আল ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত, ধাতু خلف।

৯৬. সহীহ মুসলিমঃ ১২১৮, ইবনে মাজাহ্ : ৩০০৪।

৯৭. এ দ্বিতীয় অংশটুকু সহীহ বর্ণনায় এসেছে, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ২/৮৯৯, হাদীস নং ১৫৯৪, মুস্তাদরাকে হাকিম, ১/১৭১, ১৭২।

www.waytojannah.com

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইজতিহাদে তাঁদের এই স্বাভাবিক মতান্তর কখনই সামান্যতম মনান্তরে পর্যবসিত হয়নি। বরং তাঁদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিলো পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। পরমত সহিষ্ণুতা ছিলো তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেননা, নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর উপর নিজেদের এবং উম্মতের আমল প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করাই ছিলো তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য।

তবে এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন ও হাদীসই যদি হয়ে থাকে ফিক্হ শাস্ত্রের অভিন্ন উৎস তাহলে মুজতাহিদ আলিমদের মতপার্থক্যের কারণ কি? কুরআন-হাদীসের অভিন্ন উৎস থেকে অভিন্ন ফিক্হ শাস্ত্র গড়ে তোলা কি সম্ভব নয়?

এ প্রশ্ন অবশ্য নতুন নয়। বিশেষত ইসলামী জ্ঞান যাদের গভীর ও পরিপক্ক নয়, এ প্রশ্ন যুগে যুগে তাদের বিব্রত করেছে। বিভ্রান্তও করেছে যথেষ্ট। পাশ্চাত্যের সুযোগ-সন্ধানী অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও এ প্রশ্নটাকে কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে বার বার। তবে আমাদের মহান পূর্বসূরী আলিমগণ এর সন্তোষজনক জবাব দিয়ে এসেছেন। এমন কি এ প্রসঙ্গে মূল্যবান বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়।[৯৮]

আলোচ্য প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেয়ার পূর্বে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

প্রথমত, ইমামদের ফিক্হ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্যের স্বরূপ কি? দ্বিতীয়ত, এ মতপার্থক্য নিন্দনীয় না প্রশংসনীয়, তৃতীয়ত, এ মতপার্থক্য কি নব উদ্ভুত না সাহাবা যুগ থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে? চতুর্থত, ফিক্হ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও ইমামদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেমন ছিল?

ইমামদের ফিক্হ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্যের স্বরূপ

আগেই বলা হয়েছে যে, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আকায়েদ ও আহকাম সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো সহজ-সরল ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, যা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষেও একান্ত সহজ। যেমন, তাওহীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ

৯৮. তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল্লামা শা'রানী রচিত আল-মীযানুল কুবরা, কাশফুন নি'মাহ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রচিত রাফউল মালাম 'আনিল আইম্মাতিল আ'লাম। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রচিত আল-ইনসাফ ফী সাবাবিল ইখতিলাফ। ডক্টর মুস্তফা সাঈদ আল-খীন রচিত আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাওয়াইদিল উসূলিয়্যাহ ফী ইখতিলাফিল আয়িম্মাহ। শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া রচিত "ইখতিলাফুল আয়িম্মাহ"। কাজী আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী রচিত "বিদায়াতুল মুজতাহিদ: ডক্টর আবুল ফাতাহ রচিত দিরাসাত।"

www.waytojannah.com

Contents

وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ "তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। তিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়।"[৯৯] অনুরূপভাবে আহকাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ 'তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।'[১০০]

তদ্রূপ কিছু আহকাম এমন বিপুল সূত্র পরম্পরায় সুপ্রমাণিত যে, তাতে ভিন্নমতের কোন অবকাশ নেই। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে ইমাম মুজতাহিদদের মাঝে কোন মতভিন্নতা নেই। বরং ভিন্নমত প্রকাশকারী ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডী থেকেই বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে শরী'আতের অমৌলিক কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো চিন্তা ও বিশ্লেষণসাপেক্ষে, কিংবা খবরে ওয়াহিদ তথা একটি মাত্র সূত্রে প্রাপ্ত। বলা বাহুল্য যে, এ দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। তদুপরি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা শুধু উত্তম-অনুত্তমের মতপার্থক্য। অর্থাৎ কোন বিষয়ের দু'টি দিকই জায়েয, তবে কোন্ দিকটি উত্তম সে সম্পর্কেই শুধু মতপার্থক্য হালাল হারাম বা জায়েয না-জায়েয ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতপার্থক্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

মোটকথা, শরী'আতের মৌলিক, দ্ব্যর্থহীন ও স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়গুলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। দ্ব্যর্থবোধক ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ অমৌলিক কতিপয় বিষয়ের মাঝে তাঁদের মতপার্থক্য সীমিত ছিল এবং সেটার বেশির ভাগই ছিল উত্তম-অনুত্তমের মতপার্থক্য। হালাল হারাম বা জায়েয না-জায়েযের সংখ্যা খুবই কম।

ইমামদের মধ্যে ইখতিলাফের পরিমাণ ও পর্যায়

ইসলামী শরী'আতের লাখো মাসাইলের মধ্যে মতভেদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। বরং যেসব মাস'আলায় মতভেদ হয়েছে তার তুলনায় অবিসংবাদিত মাসাইলের পরিমাণ অনেক বেশি। কোন কোন মনীষীর ভাষ্য অনুযায়ী ফিকহী মাসাইলের তিন-চতুর্থাংশেই ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। কেবল এক-চতুর্থাংশের মধ্যেই মতভেদ ঘটেছে এবং তাতেও প্রত্যেক ফকীহের পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, সমাজনীতি প্রভৃতি ফিকহী অধ্যায়ের এক-একটিতে চোখ বুলালে অতি সহজেই উপরোক্ত দাবির যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়।

---

৯৯. সূরা আল-বাকারাহ : ১৬৩।

১০০. সূরা আল-বাকারাহ : ৪৩।

www.waytojannah.com

যেমন, সালাত। এর যে বিপুল সংখ্যক মাসাইল থেকে গোণা কয়েকটি মাসাইল ছাড়া অধিকাংশ মাসাইলই এমন, যাতে সমস্ত ফকীহ্ একমত। সালাতে হানাফী মাযহাব অনুসারে আরকান-আহ্কাম তেরটি ফরয। এ তেরটি ফরয অন্যান্য মাযহাবেও স্বীকৃত। হাঁ, তারা এতদসঙ্গে ফরয হিসেবে তা'দীলে আরকানকেও যোগ করেন, যা হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম স্বীকার করেন না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই ইখতিলাফটুকুরও বিশেষ কোন প্রভাব নেই। কেননা হানাফী মাযহাবেও তা'দীলে আরকান ওয়াজিব, কার্যত যা ফরযেরই মত অবশ্য পালনীয়। কাজেই প্রকৃত প্রস্তাবে সালাতের ফরযসমূহে ইখতিলাফ নেই বললেই চলে।

হানাফী মাযহাব অনুসারে সালাতে চৌদ্দটি ওয়াজিব আছে। এতেও যা ইখতিলাফ, তা অনেকটা দৃষ্টিভঙ্গিগত। যেমন উপরিউক্ত তা'দীলে আরকানের বিষয়টা। এমনভাবে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে সালাত শেষ করাকে অন্যান্য ইমাম ফরয বলেন বটে, কিন্তু হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুসারে এটি ওয়াজিব, যা কার্যক্ষেত্রে তাঁদের ফরযেরই মত অবশ্য পালনীয়।

হানাফী মাযহাব অনুসারে সালাতের সুন্নাত ২২/২৩ টির মত। এক্ষেত্রে ইখতিলাফ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা বেশি হলেও যে সকল সুন্নাত সম্পর্কে মতভেদ নেই সেগুলোই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এমনিভাবে যেসব কারণে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায় বা মাকরূহ হয় তারও অধিকাংশে কোন মতভেদ নেই।

অপরাপর বিষয় অপেক্ষা সালাত সংক্রান্ত মাসাইলের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তুলনামূলকভাবে ইখতিলাফের পরিমাণও এক্ষেত্রে বেশি। তারপরও দেখা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রেও ইখতিলাফী মাসাইল সংখ্যাগরিষ্ঠ তো নয়ই, বরং অবিতর্কিত মাসাইল অপেক্ষা অনেক কম। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ইসলামী শরী'আতে ইখতিলাফী মাসাইলের হার কেমন।

উপরের আলোচনায় আরও একটা বিষয়ে ধারণা মেলে যে, ইসলামের মৌল বিষয়ে ইখতিলাফ কম হয়েছে বরং শাখাগত বিষয়ের মধ্যেও সুন্নাত-মুস্তাহাব অপেক্ষা ফরয-ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ কম। আবার ফরয-ওয়াজিবের মতভেদও অনেকটা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত, কার্যক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য নেই। সুন্নাত ও মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে যেসব ইখতিলাফ আছে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ইখতিলাফ কেবল পদ্ধতিগত। অর্থাৎ মূল বিষয়টা যে সুন্নাত তা নিয়ে কোন মতভেদ নেই, কিন্তু পদ্ধতি কোন্টা উত্তম সে নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সূরা ফাতিহার শেষে 'আমিন' বলা সুন্নাত। এটা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু 'আমিন' উচ্চঃস্বরে বলা হবে না, নিম্ন স্বরে? এ সম্পর্কে ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে। এমনিভাবে আযানে 'তারজী' করা না

www.waytojannah.com

করা, দু'আ কুনুত রুকুর আগে, না পরে, জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া হবে কি হবে না, ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি, না এগারটি কি বারটি প্রভৃতি বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে প্রকৃত অর্থে তা পরস্পর বিরোধী মতামত নয়, অর্থাৎ এমন নয় যে, এক ফকীহের দৃষ্টিতে যেটা সহীহ্ অপর ফকীহের কাছে সেটা বাতিল। বরং উভয়ের নিকটই উভয় মত প্রমাণসিদ্ধ; পার্থক্য কেবল এই যে, একজনের দৃষ্টিতে এক পদ্ধতি, অন্য জনের দৃষ্টিতে অন্য পদ্ধতি উত্তম উত্তম। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহেমাহুল্লাহ একেই اختلاف التنوع। (পদ্ধতিগত মতভেদ) নামে অভিহিত করেছেন।

তবে স্বল্প সংখ্যক হলেও এমন কিছু মতবিরোধও আছে, যার একমতের দৃষ্টিতে বিপরীত মত সম্পূর্ণ ভুল, যেমন শরীর থেকে রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হবে কি হবে না, ভুল সংশোধনের জন্য কথা বললে তাতে সালাত ফাসিদ হবে কি হবে না, পানাহার দ্বারা সাওম ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব কিনা, নাবালকের সম্পদে যাকাত ফরয কিনা প্রভৃতি। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহেমাহুল্লাহ এ জাতীয় মতভেদকে اختلاف التضاد। (পরস্পর বিরোধী মতভেদ) নামে অভিহিত করেছেন। এ জাতীয় মতভেদ খুব কম সংখ্যক মাসাইলেই দেখা দিয়েছে। আর এরূপ মতভেদও যেহেতু দলীল-প্রমাণ নির্ভর, তাই অহেতুক বাক-বিতণ্ডারূপে এর নিন্দা করার সুযোগ নেই। অনুসারীদের পক্ষে উভয় মতই সমান মর্যাদার দাবি রাখে।[১০১]

ফকীহদের এ মতপার্থক্য কি বৈধ?

পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে মতভেদ কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সেটা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে শাখাগত বিষয়ে মতভেদ এমনই একটা ব্যাপার যা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এই বাস্তবতার কারণে এ জাতীয় মতভেদের সুযোগ রাখা হয়েছে, বরং ইসলামে একে প্রশংসিত সাব্যস্ত করা হয়েছে। নিম্নে শাখাগত বিষয়ে ইখতিলাফ বা মতান্তরের বৈধতার কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো,

১. কুরআন ও হাদীসের কোন কোন বক্তব্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কোথাও একাধিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা অনুসরণের জন্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য, তা নির্ণয় করার প্রয়োজন রয়েছে। কোথাও দুই বক্তব্যের মধ্যে দৃশ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রেও আমলের পন্থা নির্ণয় অপরিহার্য। এসব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে মতভেদ ঘটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী। অবশ্যম্ভাবী এ মতভেদ সম্পর্কে তিনি বে-খবর ছিলেন না। মতভেদ যদি তাঁর কাছে নিন্দনীয়ই হত,

---

১০১. ইফাবা, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৬৩৩।

www.waytojannah.com

তবে শরী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধান তিনি সুস্পষ্টরূপে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে কেন বর্ণনা করলেন না? কোন কোন বিধান কেন এমনভাবে বিবৃত করলেন, যা অনুসরণ করার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে, আবার ব্যাখ্যার অনিবার্য ফল হচ্ছে মতভেদ, কিন্তু সে মতভেদ করা যাবে না। এই সুকঠিন আবর্তের মধ্যে বান্দাদেরকে কেন নিক্ষেপ করলেন, যেখানে শরী'আতকে সহজ করে দেওয়াই তাঁর অভিপ্রায়, সঙ্কটে ফেলা তাঁর ইচ্ছা নয়? আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের জন্য যা সহজ আল্লাহ্ তাই চান যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না।"[১০২] বস্তুত 'সহজীকরণ' ও সুবিধাদানের উদ্দেশ্যেই তিনি জেনে শুনে উপযুক্তরূপে বিধান বিবৃত করেছেন, যাতে মানুষ এর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে। ফলে এতে মতভেদ দেখা দিবে এবং জ্ঞান চর্চার দুয়ার খুলে যাবে। ফলে মানুষের জন্য নানা রকমের সুবিধা বের হয়ে আসবে। অতএব পরিষ্কার বলা যায় যে, কুরআন ও সুন্নায় এ জাতীয় ভাষ্য, অর্থাৎ একাধিক অর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ, অস্পষ্ট বাক্যের ব্যবহার ইত্যাদিই প্রমাণ করে যে, ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ সম্পূর্ণ জায়িয।

২. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে কিয়াস ও ইজতিহাদ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিয়াস অর্থ-নস (কুরআন-সুন্নাহ্) এ বর্ণিত বিধানের 'ইল্লত' বা কারণ এর ভিত্তিতে অন্যত্র অনুরূপ বিধানের প্রয়োগ। কিন্তু কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সকল বিধানের কারণ পরিষ্কার নয়। ফকীহকে তা গবেষণা করে উদ্ধার করতে হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তাতে মতভেদ দেখা দেয়। এক ফকীহ্ যেটাকে বিধানের কারণ মনে করেন, অন্য ফকীহের মতে কারণ সেটা নয়, বরং অন্য কিছু। উদাহরণস্বরূপ সমজাতীয় দ্রব্যের সুদ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপ্রসিদ্ধ বাণীটি উল্লেখযোগ্য। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ বিক্রি করবে সমপরিমাণ হারে এবং নগদ নগদ। যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা বেশি চাবে সে সুদে লিপ্ত হল। এ ক্ষেত্রে গ্রহীতা ও দাতা সমান (গুনাহ্গার)।"[১০৩] এ হাদীসে ছয়টি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে। এতে বেচাকেনার ক্ষেত্রে নিয়ম বলা হয়েছে যে, সমান সমান করে বেচাকেনা করতে হবে, বেশি-কম করা যাবে না। বেশি-কম করলে সেটা সুদ হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বিধানের কারণ কি? এই ছয়টি জিনিসের মধ্যে এমন কি আছে, যে কারণে লেনদেনে কমবেশি করলে সেটা সুদ হবে? এবং সে কারণ অন্যান্য যেসব বস্তুতে খুঁজে পাওয়া যাবে তাতেও কি একই

---

১০২. সূরা আল-বাকারাহ : ৮৫।

১০৩. মুসলিম, হাদীস নং ৪০৪০, নাসায়ী, হাদীস নং ৪৫৭৯, আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩৪৭, তিরমিযী, হাদীস নং ১২৪০।

www.waytojannah.com

বিধান প্রযোজ্য হবে? বিষয়টি হাদীসে পরিষ্কার নয়। ফলে ফুকাহায়ে কিরামকে গবেষণা করতে হয়েছে, কিন্তু সকলের গবেষণার ফল অভিন্ন হয়নি। এক এক ফকীহ্ এক এক রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং সে হিসেবে অপরাপর বস্তুতে কোন্‌টা সুদী দ্রব্য এবং কোন্‌টা সুদী নয়, তা নির্ণয়েও মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কিয়াস ও ইজতিহাদ করলে মতবিরোধ তার অনিবার্য ফল। মতবিরোধ নিন্দনীয় হলে কিয়াসকেও নিষিদ্ধ করা হতো। কিন্তু তা করা হয়নি, বরং কুরআন-সুন্নাহ্ কিয়াসকে অনুমোদন করেছে, কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছে। এমন কি কিয়াসকে শরী'আতের চতুর্থ দলীলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর কিয়াসের এহেন মর্যাদাই প্রমাণ করে যে, ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদও সম্পূর্ণ বৈধ। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ্ কিয়াসের আদেশ দিয়ে প্রকারান্তরে মতভেদকেই বৈধ করেছে এবং মতভেদের দ্বার উন্মোচন করেছে।

৩. ফুকাহায়ে কিরামে মতভেদ যে বৈধ, কুরআন মাজীদে তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে সূরা হাশরের এই আয়াত : "তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখেছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে।"[১০৪] ঘটনা হয়েছিল এই যে, বানূ নাদীর অভিযানকালে সাহাবায়ে কিরামকে যখন তাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কেউ মনে করলেন, এ বাগান তো মুসলিমদেরই হাতে আসবে কাজেই ভাল গাছগুলো রেখে দিলেন। অন্যরা মনে করলেন, ভালগুলো কাটা উচিত। তাতে শত্রুর অন্তর্দাহ বেশি হবে। কাজেই তাঁরা নির্বিচারে সব কেটে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এই যে মতভেদ হলো, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তা অপছন্দ হয়নি বরং তিনি উভয় দলের কার্যক্রমকে সমর্থন করেছেন এবং উভয় দলের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং শাখাগত বিষয়ে সঠিক চিন্তাভাবনা প্রসূত মতভেদ বৈধ হওয়ার পক্ষে এর চেয়ে পরিষ্কার দলীল আর কি হতে পারে?

৪. ফিকহী ইখ্‌তিলাফ যে বৈধ, বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়। এ স্থলে বিশেষভাবে দু'টো হাদীস পেশ করা যাচ্ছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : "বিচারক যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করে এবং সে তাতে পৌঁছুতে সক্ষম হয়, তবে তার দ্বিগুণ সাওয়াব আর চেষ্টা করেও যদি তার ভুল হয়ে যায়, তবে তার এক গুণ সাওয়াব।"[১০৫] এ হাদীসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইজতিহাদ তথা নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা চালানোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং এমনকি

---

১০৪. সূরা আল-হাশর, ৫।

১০৫. বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫২, মুসলিম, হাদীস নং ৪৪৬২।

www.waytojannah.com

Contents

ভুল হলেও একটি সাওয়াব লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। একই বিষয়ে যখন দুই ফকীহ্ আপন জ্ঞান ও মূলনীতির আলোকে গবেষণায় রত হয় তখন উভয়ের যেমন অভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি এটাও সম্ভব এবং বাস্তব ব্যাপার যে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং প্রত্যেকের কাছে আপন সিদ্ধান্ত মনে হয় যা থেকে সরে আসা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় অবস্থায় যে মতভেদের সৃষ্টি হয় সেটা কি তাদের অবৈধ তৎপরতা এবং সেজন্য তারা তিরস্কারের উপযুক্ত? হাদীস বলছে, না সেটা বৈধ তো বটেই, এমনকি কারও সিদ্ধান্ত যদি ভুলও, তবে তিনিও একটি সাওয়াবের অধিকারী হবেন।

৫. অন্য বর্ণনাটি হচ্ছে, বনু কুরাইযা অভিযানকালে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ ছিল, "বানু কুরাইযায় না পৌঁছে কেউ আসর পড়বে না।" পথেই সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। এমনকি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ারও আশংকা দেখা দেয়। একদল বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দ্রুত গমনই চেয়েছেন। সালাত কাযা করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। সুতরাং তারা পথেই সালাত আদায় করে নিলেন। অপর দল বললেন, না, আমরা বরং তাঁর আদেশই পালন করবো। ওয়াক্ত চলে গেলেও আমরা বানু কুরাইযা না পৌঁছে সালাত আদায় করবো না। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু কোন দলকেই তিরস্কার করেন নি।"[১০৬]

৬. মতভেদ বৈধ হওয়ার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের ইজ্‌মা। বিভিন্ন মাস'আলায় তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। পরিশেষে কখনো ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এবং কখনও বিরোধ থেকেই গিয়েছে। ইসলামী ফিকহে এটা কোন বিরল বিষয় নয়। এরূপ মতভেদের ফিরিস্তিও কম দীর্ঘ নয়। কিন্তু কখনও কোন সাহাবী এরূপ আপত্তি তোলেন নি যে, এক কিতাব ও এক নবীর অনুসারী হয়ে আমাদের মধ্যে এ মতভেদ কেন? বরং একজন সাধারণ সাহাবী থেকে নিয়ে খুলাফায়ে রাশিদীন পর্যন্ত সকল স্তরের সাহাবীর মধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ ঘটেছে। যাঁরা নিজেরা কোন মতামত প্রকাশ করেন নি তাঁরাও এর বৈধতার পক্ষে মৌন সম্মতি প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের মতভেদের কয়েকটি নমুনা পেশ করা গেল :

ক. আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মীরাসে দাদাকে সর্বাবস্থায় পিতার স্থানে গণ্য করতেন, কিন্তু উমর ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য করতেন।[১০৭]

---

১০৬. বুখারী, হাদীস নং ৯৪১, মুসলিম, ৪৫৭৭।

১০৭. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/২৫৮।

www.waytojannah.com

খ. মুমূর্ষু অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে সে স্ত্রী মীরাস পাবে কিনা? উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মনে করতেন-পাবে, এমন কি স্বামীর মৃত্যু যদি স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরেও হয়, কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত হচ্ছে স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে সে স্ত্রী মীরাস পাবে না।[১০৮]

গ. তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত কখন শেষ হবে? ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- এর মতে তৃতীয় হায়িযের পর যখন গোসল করবে তখন ইদ্দত সমাপ্ত হবে। যায়দ ইব্ন সাবিত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- এর মত হচ্ছে তৃতীয় হায়িয শেষ হতেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।[১০৯]

উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের চারজনের পক্ষ থেকেই ফিকহী মাস'আলায় মতভেদ ঘটেছে। আর চারজন হচ্ছে ইসলামের এমন অবিসংবাদিত নেতা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওসীয়াত অনুযায়ী উম্মত যাঁদের অনুসরণ করতে বাধ্য। তিনি বলেছেন, "তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত ও আমার সত্যাশ্রয়ী হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা তা সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো এবং দাঁতে কামড়ে ধরো।"[১১০]

সুতরাং এটা বুঝতে হবে যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের নিকট ফিকহী মাস'আলায় মতভেদ অবৈধ হলে কিছুতেই তাঁদের দ্বারা তা ঘটত না। বস্তুত তাঁদের মতভেদ পরবর্তী ফুকাহায়ে কিরামের জন্য একটা আশ্বাস বাণী, যাতে নিয়মতান্ত্রিক চিন্তা-গবেষণার জন্য ইজতিহাদের পথে চলতে গিয়ে কখনও মতবিরোধের সম্মুখীন হলে তাঁরা বিচলিত না হন; বরং এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনদের মধ্যেও এ জাতীয় মতভেদ ঘটেছে এবং এটা যে বৈধ, তাঁরা তাঁদের কার্যক্রম দ্বারা তা পরিস্ফুট করে গেছেন।

৭. সুস্থ বুদ্ধি বিবেক ও সুষ্ঠু যুক্তিরও দাবি যে, ফিকহী ইখ্‌তিলাফ বৈধ। কেননা ইসলাম এক পরিপূর্ণ দ্বীন। তার বিধান ও অনুশাসন মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। ইসলামী বিধানের মৌল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। এ উৎসের বাণীমালা সীমিত। কিন্তু জীবনের পরিধি সুবিশাল। তার সম্ভাব্য চাহিদা, সমস্যা ও অবস্থার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সীমিত বাণীর ভেতর জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রের বিধানাবলী সংক্ষিপ্ত মূলনীতি আকারেই দেয়া হয়েছে। এখন সন্ধানী গবেষকের কাজ হচ্ছে সেই মূল হতে শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটিয়ে ইসলামী মহীরুহের পরিপূর্ণতা ফুটিয়ে তোলা।

---

১০৮. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হাজাওয়ী আল-ফাসী, আল-ফিকরুস-সামী, ২/৩২৮।

১০৯. প্রাগুক্ত।

১১০. আবূ দাউদ, হাদীস নং ৯৮৮৫।

www.waytojannah.com

মূল হতে শাখায় উত্তরণের যে নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা সেটাই **ক্বিয়াস ও ইজতিহাদ।** এজন্য মূলের কারণ অনুসন্ধান করে তার ভিত্তিতে মূল ও শাখার সাযুজ্য বিধান বা মূলের নিরিখে ঘটনা প্রবাহের পর্যবেক্ষণ, অতঃপর মূলের অনুরূপ বিধান তাতে আরোপ, জ্ঞানজগতের এ এক অসাধারণ ও জবরদস্ত কর্মানুষ্ঠান। জ্ঞানগত যোগ্যতা ও মননশীলতার বৈচিত্র্য হেতু 'কারণ' নির্ণয় সাযুজ্য বিধানের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটা অতি স্বাভাবিক। তা ছাড়া কুরআন সুন্নাহর মূলপাঠ (نص) এর মর্মোদ্ধারে ও সুন্নাহর শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে বিবিধ-কারণপ্রসূত ইখ্‌তিলাফও ইজতিহাদের উপর অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহে স্পষ্টরূপে বর্ণিত নয়, এ জাতীয় মাসায়েলের বিশাল অঙ্গনে ইখ্‌তিলাফ বিলকুল নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন ইখ্‌তিলাফ যদি অবৈধ হয়, তবে ইজতিহাদের উপরও নিষেধাজ্ঞা চলে আসে। কেননা ইখ্‌তিলাফহীন ইজতিহাদ সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা। আর ইজতিহাদকে নিষিদ্ধ করতে 'ইজতিহাদলব্ধ' মাসায়েলের বিলোপ সাধন করলে দ্বীনের সার্বজনীনতা নিমিষেই ঘুচে যাবে। আর তখন আল্লাহ্‌র বাণী, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"-এই ঘোষণার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বস্তুত ফিকহী ইখ্‌তিলাফ যে বৈধ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও ক্বিয়াস সব রকমের দলীল-প্রমাণই এর বৈধতা স্বীকার করে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইখ্‌তিলাফ কারও কারও কাছে মন্দ বিবেচিত হলেও এর অন্তর্নিহিত কল্যাণ অনিঃশেষ।

মতপার্থক্য হওয়ার মধ্যে উম্মতের কল্যাণ নিহিত

অকাট্য যুক্তির আলোকে ওলামায়ে কিরাম দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ফকীহদের আলোচ্য মতপার্থক্য হচ্ছে উম্মতের রহমত ও কল্যাণের উৎস। ফকীহদের ইজতিহাদ ভিত্তিক ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য মূলত উম্মতকে প্রশস্ততা দান করেছে। বিভিন্ন মাযহাব যেন বিভিন্ন রাজপথ ও মহাসড়ক এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সবগুলি সহকারে প্রেরিত হয়েছেন, যাতে একমাত্র মুজতাহিদ ইমামদের সাথে হক ও সত্যের সম্পৃক্তির কারণে উম্মতের জন্য সংকট ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি না হয়। শরী'আতকে উদার সহজ করার জন্যই মানুষকে সাধ্যাতীত কিছুর নির্দেশ দেয়া হয়নি।

মোটকথা, মাযহাবের ইখতিলাফ হচ্ছে উম্মতের জন্য এক বিরাট নিয়ামত, অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা ও কাজ থেকে সাহাবা ও তাঁদের উত্তরসুরিগণ ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব উদ্ভাবন করেছেন, সেগুলো অভিন্নমুখী বিভিন্ন জনপথতুল্য। তবে আকায়েদ বিষয়ে ইজতিহাদের চেষ্টা নিঃসন্দেহে গোমরাহীরই

www.waytojannah.com

নামান্তর। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথই হল অভ্রান্ত। আহকাম বিষয়ক ইখতিলাফের ক্ষেত্রেই শুধু এই রহমত প্রযোজ্য।[১১১]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন তাইমিয়্যার বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে শরীয়তের যে সকল মূলনীতি ও বিধান নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো সকল নবীর অভিন্ন 'দ্বীন' সমতুল্য। তা লঙ্ঘনের অধিকার নেই কারো। এগুলো যে গ্রহণ করবে সে নির্ভেজাল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরাই হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। পক্ষান্তরে শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মতপার্থক্যগুলো হচ্ছে বিভিন্ন নবীর নিজস্ব 'বচন ও কর্ম' সমতুল্য যা শরীয়তভুক্ত রূপে স্বীকৃত। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেন, 'যারা আমাকে পাওয়ার সাধনা করবে তাদের আমি অনেক পথের দিশা দিব।'[১১২]

একটু পরে আল্লামা ইবন তাইমিয়াহ্ আরও বলেন, 'ওলামা, মাশায়েখ ও শাসকগণ তাদের মাযহাব, কর্মপন্থা ও শাসননীতি প্রবর্তনের দ্বারা যদি প্রবৃত্তির পরিবর্তে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকেন এবং সাধ্যমত পূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রতিপালকের মিল্লাত তথা কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে সেটা হবে বিভিন্ন নবীর বিভিন্ন শরীয়ত ও কর্মপন্থার সমতুল্য। কাজেই প্রত্যেক নবী যেমন নিজস্ব শরীয়ত ও পন্থানুযায়ী এক আল্লাহর ইবাদত করার দ্বারা সাওয়াবের অধিকারী হয়েছেন, তদ্রূপ মুজতাহিদ ইমামগণও আল্লাহ্র ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসরণ সত্ত্বেও সাওয়াবের অধিকারী হবেন।'[১১৩]

মতপার্থক্য দ্বারা উম্মতের কল্যাণ লাভ হওয়ার কিছু নমুনা

(এক) যুগ ও পরিস্থিতির চাহিদা পূরণার্থে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে আপন মাযহাবের পরিবর্তে অন্য মাযহাব অনুসরণের পথ ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। বলাবাহুল্য যে, মাযহাবের বিভিন্নতা না থাকার ক্ষেত্রে এই সহজতা লাভ করা সম্ভব হতো না। যেমন, হানাফী মাযহাবে নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহের জন্য নব্বই বছর অপেক্ষা করার শর্ত রয়েছে, যার ফলে বহু মুসলিম নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। এই সংকটাবস্থা দূর করার জন্য কোন কোন হানাফী আলিম মালিকী মাযহাব মুতাবিক মাত্র চার বছর সময়সীমার ফতোয়া দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, মতপার্থক্যের পরিবর্তে সকল ইমামের ইজতিহাদ যদি নব্বই বছর সময়সীমার সিদ্ধান্তে উপনীত হতো, তাহলে মুসলিম নারীদের কি পরিমাণ দুর্গতি হতো?

১১১. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ১/ ২০৯।
১১২. ইবনে তাইমিয়্যাহ, মাজমুউ' ফাতাওয়া, ১৯/১১৭।
১১৩. প্রাগুক্ত, ১৯/১২৬।

www.waytojannah.com

কাসেম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবি বকর তাই বলেছেন, 'আল্লাহ্ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের মতপার্থক্যের মাধ্যমে উম্মতের অশেষ কল্যাণ করেছেন। কেননা, যে কোন সাহাবীর আমল অনুসরণের সুযোগ লাভকারী ব্যক্তি অবশ্যই প্রশস্ততা অনুভব করবে এবং ভাববে যে, তার চেয়ে উত্তমজন এ আমলটি করে গেছেন।'[১১৪]

খলীফা ওমর ইবন আব্দুল আযীয রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের মাঝে মতভিন্নতা না হওয়া পছন্দনীয় নয়। কেননা, তাঁদের অভিন্ন মত হলে শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে মানুষ সংকীর্ণ অবস্থায় নিপতিত হতো। যেহেতু তাঁরা সকলেই অনুসরণীয় ইমাম, সেহেতু তাঁদের যে কোন একজনের মত অনুসরণের প্রশস্ততা রয়েছে প্রত্যেকের জন্য।'[১১৫]

আল্লামা ইবন কুদামাহ বলেন, ইমামদের ইখতিলাফ রহমতস্বরূপ আর তাঁদের ঐকমত্য প্রমাণ স্বরূপ। অর্থাৎ, কোন বিষয়ে তাঁরা মতভিন্নতা পোষণ করলে পরবর্তীদের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে যে কোন একটি মত অনুসরণ করার। পক্ষান্তরে কোন বিষয়ে তাঁরা সর্বসম্মত হলে তার বাইরে যাওয়ার কারও অধিকার নেই।

(দুই) শরীয়তে ইজতিহাদ ও চিন্তা গবেষণার পথ খোলা থাকার বরকতেই ইসলামী ফিক্হ আজ এত প্রশস্ততা লাভ করেছে। আর ওলামায়ে কিরামও কুরআন ও হাদীসে ইজতিহাদ করার মাধ্যমে অশেষ সাওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ লাভ করেছেন।

(তিন) ইমামদের মতভিন্নতার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে আমল তরকের ব্যাপারে উম্মত শংকিত ও সতর্ক হয়। অন্য দিকে চূড়ান্ত হতাশা থেকে উম্মত মুক্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে কোন একদিকে সকলের অভিন্ন মত হলে গোটা উম্মত হয়ত হতাশা কিংবা ঔদাসীন্যের শিকার হয়ে পড়তো। খ্যাতনামা তাবিঈ আব্দুল্লাহ্ ইবন উতবা ইবন মাসউদ ইখ্তিলাফের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আমার এটা আকাঙ্ক্ষা নয় যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ যদি ইখ্তিলাফ না করতেন! কেননা (যেসব বিষয়ে মতবিরোধ ঘটেছে তার) কোনও একটি বিষয়ে তাঁরা যদি একমত হয়ে যেতেন তবে কোনও ব্যক্তি সেটা অনুসরণ না করলে সে সুন্নাত লংঘনকারী সাব্যস্ত হত। পক্ষান্তরে তাঁদের ইখ্তিলাফের ক্ষেত্রে কেউ কারও মত ত্যাগ করে অন্যের মত গ্রহণ করলে তাতে সে সুন্নাতেরই অনুসারী থাকে।[১১৬]

---

১১৪. ইবনু আবদিল বার, জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদলিহী, ২/৮০।

১১৫. প্রাগুক্ত।

১১৬. সুনান দারেমী, ১/১৫১।

www.waytojannah.com

Contents

(চার) মতভিন্নতা ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয় ফতোয়া প্রদানের কারণ হয়। যেমন মদখোর ও অন্যান্য কবীরা গুনাহকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু দাবা খেলা হানাফী মাযহাবে কবীরা গুনাহ হলেও শাফে'য়ী ও মালিকী মতে তা নয়। ফলে দাবা খেলায় জড়িতদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ধরনের আরো বহু 'কল্যাণ ও রহমত'-এর কারণেই ইমামদের মতভিন্নতাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। মুসলিম জাহানের প্রথম মুজাদ্দিদ খলিফা উমর ইবন আব্দুল আযীযকে অনুরোধ করা হল, ফকীহদের মতপার্থক্য দূর করে সকলকে অভিন্ন পথে ও অভিন্ন মতে একত্র করুন। জবাবে তিনি বললেন, ما يسرني أنهم لم يختلفوا 'তাদের মতভিন্নতা না থাকাটা আমার খুশির কারণ নয়।' শুধু তাই নয়, বরং সকল প্রদেশে তিনি এই মর্মে ফরমান পাঠিয়ে দিলেন যে, স্থানীয় ফকীহ ও মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিলে তথাকার অধিবাসীরা সেই আলোকেই আমল করবে।[১১৭]

তদ্রূপ ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ্কে খলীফা আল মনসুর একবার জানালেন, আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, আপনার সংকলিত মুআত্তার অনুলিপি সকল প্রদেশে এই ফরমানসহ পাঠিয়ে দেব যে, এখন থেকে সকলকে এই কিতাব মতেই আমল করতে হবে। কিন্তু ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ খলীফাকে নিষেধ করে বললেন, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হাদীসের উপর মানুষের আমল শুরু হয়েছে। সুতরাং সকলকে নিজ নিজ পছন্দ করা মত অনুযায়ী আমল করতে দিন।[১১৮]

---

১১৭ প্রাগুক্ত।

১১৮. অনেকে নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে ফকীহদের ইখতিলাফ ও মতভিন্নতাকে নিন্দনীয় প্রমাণ করতে চেয়েছেন, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ। "আর তারা ইখতিলাফ করতেই থাকবে তবে আপনার প্রতিপালক যাদের রহম করবেন (তারা নয়।) (আর আপনি তাদের এই ইখতিলাফের কারণে বিচলিত হবেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত পূর্ণ হবেই যে, আমি জিন ও ইনসান উভয়কে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করব।" [সূরা হূদ: ১১৮-১১৯] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. "আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। আর মতানৈক্য করো না।" [আলে ইমরান : ১০৩] আরো ইরশাদ হয়েছে, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পরস্পর ইখতিলাফ করেছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি পৌঁছার পর, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" [আলে ইমরান : ১০৫]

এর জবাবে আল্লামা কুরতুবী বলেন, "আলোচ্য আয়াতে শরীয়তের অমৌলিক বিষয়ে ইখতিলাফ হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। কেননা, মূলত তা ইখতিলাফ নয়। (নিন্দনীয়) ইখতিলাফ তো হলো, যা একতা ও সম্প্রীতি অসম্ভব করে তোলে। মাসায়েল সংক্রান্ত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য, সেটা শরীয়তের বিভিন্ন বিধান ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটন ছাড়া আর কিছু নয়। সমাধান করতে গিয়ে সাহাবাগণও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কিন্তু পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় ছিলো পূর্ণ মাত্রায়।" [কুরতুবী, আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন, ৪/১৬৯] ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, ইখতিলাফ দু'প্রকার- হারাম ও জায়েয। কুরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত কোন বিষয়ে ইখতিলাফ

www.waytojannah.com

এই নীতি অনুসরণ করেই আমাদের পূর্বসুরি আলিমগণও মৌলবিধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব মত প্রয়োগ করেননি, বরং সর্বসম্মতভাবে কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বাণী অবিচলভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। সাধারণ আমল ও মু'আমালাতের ক্ষেত্রেই শুধু তাঁরা ইজতিহাদ-ইস্তিম্বাতের আশ্রয় নিয়েছেন এবং বিভিন্নমুখী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কেননা, এ সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর বাণী ছিল প্রচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক।

বলাবাহুল্য যে, এই ইজতিহাদ ভিত্তিক মতভিন্নতার কারণে পরস্পরকে তাঁরা অভিযুক্ত করেননি। কেননা, যে বিষয়গুলোকে শরীয়ত প্রচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক রেখেছে সেগুলোতে ইজতিহাদ প্রয়োগ করে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ছিলো আল্লাহর নির্দেশ। সে নির্দেশই সকলে পালন করেছেন পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে। কুরআন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াসই ছিল তাদের ইজতিহাদের বুনিয়াদ। ক্ষেত্রবিশেষে তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতম ব্যত্যয়ও ঘটাতে পারেনি। বরং ইখলাস ও উদারতার অবস্থা তো ছিলো এই যে, অন্যের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম হওয়া মাত্র প্রসন্নচিত্তে তা মেনে নিয়েছেন। এমন কি শিক্ষক হয়েও ছাত্রের যুক্তি ও মতামত মেনে নিতে কোন কুণ্ঠা ছিল না তাঁদের। তাঁদের মধ্যে যেমন ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ,[১১৯]

করা হারাম। পক্ষান্তরে চিন্তা ও উদ্ভাবন সাপেক্ষ বিষয়ে ইখতিলাফ শুধু বৈধ-ই নয়, স্বাভাবিকও বটে। আর এই প্রথমোক্ত ইখতিলাফকেই কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াতগুলো পেশ করে বলেন, 'ফকীহদের মতপার্থক্যপূর্ণ প্রায় সব বিষয়েই এমন, যার স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন-না-কোন দলিল আমি পেয়েছি।" [ইমাম শাফেয়ী রচিত আর রিসালাহ] আল্লামা মুহাম্মদ রাশীদ রেযা ইখতিলাফের দ্বিপক্ষীয় প্রমাণাদি উল্লেখপূর্বক লিখেছেনঃ 'বোধ, বুদ্ধি ও মতামতের বিভিন্নতা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়।' আল্লাহ বলেন, 'আর এরা ইখতিলাফ করতেই থাকবে, তবে আপনার প্রতিপালক যাদের রহম করবেন (তারা নয়। তাদের ইখতিলাফের কারণে আপনি বিচলিত হবেন না। কেননা,) তিনি এজন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন।' তাই ইসলাম (ইখতিলাফ মাত্রেরই নিন্দা না করে) শুধু বিভেদাত্মক ইখতিলাফের নিন্দা করেছে। [ফাওয়ায়েদু কিতাবিল মুগনী ওয়াশ শারহিল কাবীর, পৃ. ১২]

১১৯. যেমন, ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ীর মধ্যকার পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, ইমাম শাফেয়ী রাহেমাহুল্লাহ একবার ইমাম আবূ হানিফার কবরের নিকট ফজরের সালাত আদায় করেন। তাঁর মতে ফজরে দো'আ 'কুনূত' পড়া আবশ্যক হলেও তিনি সেদিন এই বলে কুনূত পড়া বাদ দিলেন যে, এই কবরবাসী (ইমাম) আবূ হানিফা ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না। তাই আমি আজ তার আদব রক্ষা করতে চাই। অনেকের মতে সেদিন তিনি উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েননি। কেননা, আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ অনুচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন। [আওজাযুল মাসালেক, ১ ; ১০৩] অনুরূপভাবে ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহকে শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন- তাকে বরণ করতেই হবে। কেননা, তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের তাওফীক (ঐশী দান) প্রাপ্তদের অন্যতম। [আওজাযুল মাসালেক, ১:৮৮] এমনকি ইমাম আবূ হানিফার ছাত্রদের প্রতিও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবনত। তিনি বলেছেন, 'কেউ ফিক্হ অর্জন করতে চাইলে সে যেন ইমাম আবূ হানিফার শিষ্যদের সাহচর্য গ্রহণ করে। কেননা, কুরআন-সুন্নাহর মর্ম তাদের সহজ-আয়ত্তে এসেছিল। আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ বিন হাসানের গ্রন্থসমগ্রের কল্যাণেই শুধু আমি ফকীহ হতে পেরেছি।' [দুররুল মুখতার, ১/৩৫, রাদ্দুল মুহতার, ১/৩৫] এ ছাড়া শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ

www.waytojannah.com

Contents

ও মুহাদ্দিসগণও বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম সাহেবের জীবনচরিতও রচনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ইমাম আবূ হানিফার মূল্যবান জীবনচরিত রচনা করেছেন, عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان নামে। তাছাড়া বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ অন্য মাযহাবের টীকা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচনা করেছেন, যা প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ আলাদা পথের পথিক নন। উৎস তাদের এক এবং লক্ষ্যও তাদের অভিন্ন। যেন তারা একই মায়ের অনেক সন্তান, শারীরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই মাতৃগর্ভে যাদের জন্ম এবং একই মাতৃকোলে যারা প্রতিপালিত এবং একই নাড়ীর বন্ধনে যারা আবদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ :

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) আমাকে বলেছিলেন, যেহেতু হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে আপনারা শ্রেষ্ঠ সেহেতু আমার অজানা কোন হাদীস আপনার সংগ্রহে থাকলে তা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। সেজন্য প্রয়োজন হলে সুদূর বসরা বা সিরিয়া সফর করতেও আমি তৈরি আছি। [আদাবুশ-শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু, পৃ. ৯৫, বায়হাকী, মানাকিবুশ-শাফেয়ী, ১/১৫৪, ৪৭৬]

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর প্রতি ইমাম আহমদের সশ্রদ্ধ অনুভূতির একটি উদাহরণঃ এক হাদীসে এসেছে, إن الله يبعث في رأس كل مائة سنة رجلا يعلم الناس دينهم 'প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় আল্লাহ এমন এক ব্যক্তি পাঠান যিনি মানুষকে দ্বীন শিক্ষাদান করেন।' এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, প্রথম শতাব্দীতে সেই মানুষটি ছিল উমর বিন আব্দুল আযীয। আর দ্বিতীয় শতাব্দীতে হলেন ইমাম শাফেয়ী রাহেমাহুল্লাহ। চল্লিশ বছর ধরে তাঁর জন্য আমি দো'আ ও ইস্তিগফার করছি। [ইমাম রাযী, মানাকিবুশ-শাফে'য়ী, পৃ. ৬০] পুত্র আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে ইমাম আহমদ বলেন, প্রিয় পুত্র! পৃথিবীর জন্য ইমাম শাফেয়ী হলেন সূর্যতুল্য এবং মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির আরোগ্য।[ইমাম রাযী বিরচিত মানাকিবুশ শাফেয়ী, পৃ. ৬০-৬১] ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 'ফিক্হ তালাবদ্ধ ছিল। ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে আল্লাহ সে তালা খুলেছেন।' [ইমাম রাযী বিরচিত মানাকিবুশ শাফেয়ী, পৃ. ৬১, ইমাম বায়হাকী রচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী, ২/২৫৮] তিনি আরও বলেন, 'ইলমের আলোচনায় ইমাম শাফে'য়ীর চেয়ে কম ভুল আর কারো নেই। তদ্রূপ সুন্নাতে রাসূল অনুসরণেরও তার সমকক্ষ কেউ নেই। [ইমাম বায়হাকী, মানাকিবুশ-শাফেয়ী, ২/২৫৮, ইমাম রাযী, মানাকিবুশ শাফে'য়ী, পৃ. ৬১] এ ছাড়া আবূ উসমানের প্রতি ইমাম আহমদের ভালবাসার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, তিনি ইমাম শাফে'য়ীর পুত্র ছিলেন। [বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইবনে আবি হাতেম রাযী রচিত আদাবুশ শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহ, ইমাম বায়হাকী রচিত মানাকিবুশ শাফেয়ী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী এবং হিলইয়াতুল আওলিয়ার ইমাম শাফেয়ী অধ্যায় দেখা যেতে পারে।]

আবূ মানসুর আল-বাগদাদী বলেন, ইমাম শাফে'য়ী ইমাম মালিকের খিদমতে থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ইমাম মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর খিদমতে ছিলেন। ইবনে আবদুল হাকাম বলেন, ইমাম শাফে'য়ী ইমাম মালিকের কোন উদ্ধৃতি এভাবে দিতেন, আমাদের উস্তাদ মালিক বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলতেন, 'ইলম ও ফিক্হ শাস্ত্রে ইমাম মালিক সংকলিত কিতাবের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন কিতাব পৃথিবীতে নেই। হাদীসের সনদ আলোচনা হলে সকলের মাঝে ইমাম মালিকের অবস্থান হবে নক্ষত্রতুল্য। ইমাম মালিক ও সুফিয়ান সাওরী না হলে হিজাযের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেতো। [ইমাম রাযী রচিত মানাকিবুশ শাফেয়ী, পৃ. ৪৯] অন্যদিকে ইমাম মালিক ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে বলতেন, 'শাফেয়ীর চেয়ে মেধাবী কোন কোরাইশী তরুণ আমার কাছে আসেনি। [ইমাম রাযী রচিত মানাকিবুশ শাফেয়ী, পৃ. ৫৮] ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানিফার প্রতি ইমাম সুফিয়ান সাওরী অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন, এক মজলিসে এক হাদীস শুনে ভাবাতিশয্যে ইমাম শাফেয়ী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ফলে তার মৃত্যুর ভুল সংবাদ বলাবলি শুরু হল। ইমাম সুফিয়ান সাওরী তা শুনে বললেন, সত্যি তার মৃত্যু হয়ে থাকলে যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষকে আমরা হারালাম। ফিক্হ ও ফতোয়া সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করা হলে সুফিয়ান সাওরী রাহেমাহুল্লাহ ইমাম শাফেয়ীকে দেখিয়ে বলতেন, এঁকে জিজ্ঞাসা করো। [ইমাম রাযী, মানাকিবুশ শাফে'য়ী, পৃ. ৫৮-৫৯] ইমাম আবূ হানিফার দরবার থেকে কেউ আসলে সুফিয়ান সাওরী বলতেন, তুমি

www.waytojannah.com

তেমনি তাদের মধ্যে পরস্পরের মতের প্রতিও ছিল অত্যন্ত সম্মানবোধ।[১২০]

মোটকথা, সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী ফকীহদের মাঝে ইজতিহাদগত মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও পরমতসহিষ্ণুতা ছিল পূর্ণ অটুট। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, 'সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও পরবর্তীদের আমল বিষয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য ছিল। যেমন, সালাতে সূরা ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া না পড়া, কিংবা উচ্চস্বরে বা অনুচ্চস্বরে পড়া। তদ্রূপ ফজরে কুনূত পড়া না পড়া। রক্তমোক্ষণ বা নাকে রক্তক্ষরণ ও বমনকে অযু ভঙ্গের কারণ মনে করা না করা, ইত্যাদি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা একে অপরের পিছনে 'ইকতিদা' করতেন। যেমন ইমাম আবূ হানিফা, শাফে'য়ী ও অন্যরা ইমাম মালিকসহ মাদানী ইমামদের পিছনে ইকতিদা করতেন। অথচ তাঁরা উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে কোনভাবেই বিসমিল্লাহ পড়তেন না।[১২১]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'ফকীহ' এর কাছ থেকে এসেছো। একসাথে হজ্জ পালনকালে সুফিয়ান সাওরী ইমাম আবূ হানিফার পিছনে চলতেন। আর কোন মাসআলা পেশ হলে তিনি নীরব থাকতেন। ইমাম সাহেবই জবাব দিতেন। [আওজাযুল মাসালেক] ইমাম সুফিয়ান সাওরী স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, আবূ হানিফার সাথে তাঁর যথেষ্ট মতপার্থক্যও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা একে অন্যের প্রতি অতুলনীয় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

১২০. যেমন, ইমাম নাসাফী বলেন, আমাদের ও অন্যান্য ইমামের ফিকহী মাযহাবের (বিশুদ্ধতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলবো, আমাদের মাযহাবই সঠিক, তবে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্রতিপক্ষের মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নির্দ্বিধায় বলবো যে, আমাদের আকীদা-ই হক এবং প্রতিপক্ষের আকীদা না-হক। অর্থাৎ ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার সুনিশ্চিত দাবি করা সম্ভব নয়। কেননা, প্রমাণ সেখানে প্রচ্ছন্ন, দ্ব্যর্থবোধক কিংবা অদৃঢ়মূল। পক্ষান্তরে আকীদার ক্ষেত্রে প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ, দ্ব্যর্থহীন ও সুদৃঢ়মূল। সুতরাং ভিন্নমতের কোনই অবকাশ নেই। [আদ-দুররুল মুখতার, ১/৩৩] অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে কিংবা রক্তমোক্ষণ করালে অযু ভেঙ্গে যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, যাদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অযু ভাঙ্গে না তাদের পিছনে কি আপনি সালাত আদায় করবেন? জবাবে তিনি বললেন, কেন নয়? ইমাম মালিক ও ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের পিছনে কেন সালাত আদায় করব না? (তাঁদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অযু ভঙ্গ হয় না)। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ একবার হাম্মামখানায় গোসল করে সালাতের ইমামতি করলেন। পরে জানা গেল যে, হাম্মামখানার কুয়ায় মরা ইঁদুর পড়ে আছে। হানাফী মাযহাব মতে পানি নাপাক বিধায় সালাত দোহরানো দরকার, কিন্তু লোকজন চলে যাওয়ায় তা সম্ভব ছিল না। তখন তিনি বললেন, সংকট মুহূর্তে আমরা আমাদের মাদানী ভাইদের (মদীনাবাসী ইমামদের) এই মত অনুসরণ করবো যে, দু'মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাক পড়লে তা নাপাক হয় না। [আল ইনসাফ ৭১] ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, 'মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে কাউকে তোমরা মতের বিপরীত আমল করতে দেখলে তাকে বাধা দিও না।' [আবূ নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৬৮] তিনি আরো বলেন, 'ফকীহদের মতভেদ রয়েছে এমন ক্ষেত্রে কোন ভাইকে আমি যে কোন মত গ্রহণে বাধা দেই না। [খতীব আল-বাগদাদী, আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/৬৯]

১২১. শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১/৩৩৫।

www.waytojannah.com

তবে মতান্তর থেকে মনান্তর বা পরস্পরের নিন্দাবাদকে আল্লাহর রাসূল ভাল চোখে দেখেন নি। তিরস্কার করেছেন। তদ্রূপ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আলিমের শরণাপন্ন না হয়ে ইজতিহাদ করাকেও তিনি পছন্দ করেননি। যেমন, সাহাবী ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এক সফরে আমাদের এক সাথীর মাথা ফেটে যায়। পরবর্তীতে তার গোসল ফরয হলে তিনি এ অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয আছে কি-না জানতে চাইলেন। সাথীরা না-বাচক উত্তর দিলে বাধ্য হয়ে তিনি গোসল করলেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হলো। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কঠিন তিরস্কার করে বললেন, قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذا لم يعلموا ؟ إنما شفاء العى السؤال 'তাকে তারা খুন করেছে। আল্লাহ তাদের খুন করুন। জানা না থাকলে তারা জিজ্ঞাসা করে নিল না কেন? জিজ্ঞাসাই তো হল অজ্ঞতার একমাত্র ঔষধ।"[১২২]

মোটকথা, ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদী মতপার্থক্য নববী যুগেও ছিল। পরবর্তীতে সাহাবা যুগেও ছিল। বরং পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মতপার্থক্য সাহাবা যুগেও অমীমাংসিত ছিল। যেমন, গোসলে মেয়েদের মাথার খোপা খোলা না খোলা, গর্ভবতী নারী বিধবা হলে তার ইদ্দতের মেয়াদ কতটুকু? ইত্যাদি বিষয় সাহাবা যুগেও অমীমাংসিত ছিল। সাহাবা ও ফকীহদের যাবতীয় ইজতিহাদের উৎস ছিল অভিন্ন। একই উৎস থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাঁরা মাসায়েল ইস্তিম্বাত করেছেন। ফিক্হ বা শরীয়তের আহকাম আহরণের সর্বপ্রধান উৎস হলো, কিতাবুল্লাহ, অতঃপর সুন্নাতে রাসূল। কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কোন মতামত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সাহাবা কিরাম এবং পরবর্তী যুগের ইমাম মুজতাহিদদের আকীদা ও আমলও ছিল অনুরূপ। কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই তাঁরা আহকাম ও বিধান আহরণ করতেন। কোন বিষয়ে কুরআন সুন্নায় প্রত্যক্ষ বিধান না পেলে চিন্তা ও ইজতিহাদ দ্বারা আহকাম আহরণ করতেন। কিন্তু সেটা তাদের নিজস্ব মতামত নয়। কুরআন-সুন্নাহরই প্রচ্ছন্ন বিধান মাত্র। এখানে এসে দুর্বল মনে সাধারণত যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা এই যে, কুরআন সুন্নাহর অভিন্ন উৎস থেকেই যদি সকল মুজতাহিদ মাসআলা আহরণ করে থাকেন তাহলে তাদের মাঝে মতপার্থক্যের কারণ কি? এ প্রশ্নের সমাধান পেশ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

মতপার্থক্যের মৌলিক কারণসমূহ

মতপার্থক্যের কারণসমূহ আমরা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, এর মধ্যে কিছু কারণ আছে কেবলমাত্র কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত, কিছু কারণ আছে শুধু হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত, কিছু কারণ আছে কুরআন ও হাদীস উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া

১২২ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩৬, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৫৭২।

www.waytojannah.com

কিছু কারণ আছে কুরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্যান্য উৎসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা না করা নিয়ে। অনুরূপভাবে কিছু কারণ আছে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে। সে হিসেবে আমরা এ কারণগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করব।

এক. পবিত্র কুরআনের সাথে সম্পর্কিত কারণ

১। কিরাআতের বিভিন্নতা

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত ভিন্ন ভিন্ন অর্থের একাধিক কিরাআতে (তিলাওয়াত পদ্ধতিতে) বর্ণিত রয়েছে যার কোন একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে অথবা উভয় অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে ইমামদের মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে অযু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 'আর টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত করবে)।'[১২৩] এখানে وَأَرْجُلَكُمْ শব্দটি দুই কিরাআতে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রথম কিরাআত হলো أَرْجُلَكُمْ (লামের উপরে যবর), যার অর্থ দাঁড়ায় মুখ ও হাতের সাথে পা দু'টোও ধৌত করতে হবে। জমহুর ওলামায়ে কিরাম এ কিরাআতকেই গ্রহণ করে ফতোয়া দিয়েছেন যে, পা ধৌত করা অযুর ফরযের অন্তর্ভুক্ত।[১২৪] পক্ষান্তরে অপর একটি কিরাআত রয়েছে أَرْجُلِكُمْ (লামের নীচে যের), এ কিরাআতের প্রেক্ষিতে শব্দটির সম্পর্ক হবে رؤوس (মাথা)র সাথে, যার অর্থ দাঁড়াবে, মাথার মত পা-ও মাসেহ করলেই চলবে। ধৌত করা আবশ্যক নয়। এ কিরাআতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ জমহুরের মতের খেলাফ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।[১২৫]

২। শায বা বিরল কিরাআত দ্বারা দলীল গ্রহণ সম্পর্কিত মতপার্থক্য

পবিত্র কুরআনের কিরাআতের জন্য শর্ত হচ্ছে, মুতাওয়াতির বর্ণনা থাকা। কোন কারণে যদি তাওয়াতুর বা অকাট্যভাবে অগণিত অসংখ্য লোকের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত

---

১২৩. সূরা আল-মায়িদাহ, ৬।

১২৪. তাদের যুক্তি হলো—

১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও অযু করতে গিয়ে মোজা ছাড়া খালি পায়ে মাসেহ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

২) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা মতে একবার সফরে সাহাবায়ে কিরামকে অযুতে পা ধোয়ার পরিবর্তে মাসেহ করতে দেখে কঠোরভাবে ধমক দিলেন যে, 'তোমাদের পায়ের শুকনা অংশটুকু জাহান্নামে যাবে।' আর এ জাতীয় সতর্কবাণী ফরয উপেক্ষা করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাজেই বোঝা গেল, পা ধৌত করাই ফরয।

৩) আল্লাহ পাক হাতের বেলায় যেমন কনুই পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন, পায়ের বেলায়ও টাখনু পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন, যা ধোয়ার বেলায়ই সম্ভব।

৪) তাছাড়া 'পা' ধৌত করলে অযু বিশুদ্ধ হওয়া নিশ্চিত। কেননা, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই, পক্ষান্তরে শুধু মাসেহকারীর অযু বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কাজেই সুনিশ্চিত ও মতবিরোধমুক্ত দিকটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। এ অর্থে এ কথাও বলা যায় যে, ধৌত করার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

১২৫. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে কুরতুবী দেখা যেতে পারে।

www.waytojannah.com

না হলে সেটাকে কুরআন বলা যায় না। কিন্তু এ সব শায বা বিরল কিরাআতকে গ্রহণ করা যাবে কি না? এর মাধ্যমে যদি কোন হুকুম সাব্যস্ত হয় তবে তা গ্রহণ করা যাবে কি না? এ ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। কোন কোন ইমাম এগুলোকে খবরে ওয়াহিদের মত গণ্য করে সেগুলো দ্বারা আমল করেছেন। কিন্তু কোন কোন আলিম সেটা করেন নি। যেমন, শপথ ভঙ্গের কাফফারার মাসআলায় কেউ যদি সাওম পালন করে তার জন্য কি সেগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে? এ ব্যাপারে মালিকী এবং শাফে'য়ী মাযহাবের মত হলো যে, তার জন্য ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মত হলো, তাকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।[১২৬] এ ব্যাপারে উভয় গ্রুপের দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী :

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ .

"তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। তারপর এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন।"[১২৭]

যারা এ আয়াত থেকে সাওম পালনের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা শর্ত করেন, তাদের দলীল হচ্ছে, এ আয়াতে ইবন মাসউদ এবং উবাই ইবন কা'ব সহ অনেক সাহাবা থেকে مُتَتَابِعَاتٍ বা 'ধারাবাহিকভাবে' এ বর্ণনাটি এসেছে, যা শায কিরাআত। মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি। তাদের মতে, যদি এটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে না পৌঁছার কারণে কুরআন নাও হয় তবে সনদ শুদ্ধ হওয়ার কারণে খবরে ওয়াহিদ থেকে কোন অংশে কম নয়, সুতরাং সে হিসেবে তা থেকে দলীল নেয়া যায়। পক্ষান্তরে যারা গ্রহণ করেন না তাদের মতে, এটি শায কিরাআত, যার কোন গুরুত্ব নেই। সুতরাং সেটা দিয়ে দলীল নেয়া যাবে না।[১২৮]

---

১২৬ তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/১৭৭।

১২৭. সূরা আল-মায়িদাহ, ৮৯।

১২৮. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত। এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে কুরতুবী দেখা যেতে পারে।

www.waytojannah.com

দুই. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংক্রান্ত কারণসমূহ

১. কোন হাদীস মুজতাহিদ ইমামের সংগ্রহে না থাকা

প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল আহকাম একই সময় এবং সকল সাহাবীর সম্মুখে বর্ণনা করেননি, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাবেশে বিভিন্ন আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি কোন কোন সময় এমনও ঘটেছে, একটি হাদীস মাত্র দু'একজন ছাড়া কেউ শুনেননি। তদ্রূপ সব সাহাবার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে সব সময় হাযির থাকা সম্ভব হয়নি। কেউ সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে খেয়ে না খেয়ে ছায়ার মত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে থেকে ইলমে নববী হাসিল করতেন। যেমন আবূ বকর, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা দেশে-বিদেশে সবসময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে থাকতেন। তদ্রূপ আসহাবে সুফফার সাহাবীগণ বিশেষত আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মসজিদে নববীর চত্বরে সর্বদা ইলম হাসিলের জন্য পড়ে থাকতেন।

পক্ষান্তরে অনেককে মাত্র সামান্য কিছু সময় দরবারে রিসালাতে থেকে পুনরায় নিজ এলাকায় ফিরে যেতে হয়েছে, আর কোনদিন উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। কাজেই সব সাহাবীর পক্ষে সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি আবূ বকর, উমর ও আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ যারা সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে থাকতেন তাঁদের পক্ষেও সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী যুগের ইমাম ও মুহাদ্দিসীনের বেলায়ও তাই। অর্থাৎ তাদের মধ্যেও কারও পক্ষে সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

কাজেই, কোন মাসআলার সমাধানে যিনি সহীহ হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি সে অনুযায়ী মাসআলা পেশ করেছেন। অপরপক্ষে যিনি সহীহ হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি, তিনি বাধ্য হয়ে অন্যান্য যুক্তির শরণাপন্ন হয়েছেন। ফলে অনেক সময় তাঁর মত আল্লাহ পাকের খাস কুদরতে হাদীসের অনুকূল হয়েছে। আবার অনেক সময় হাদীসের বিপরীতও হয়েছে, যার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে অপারগ এবং ক্ষমার যোগ্য। বরং হাদীসের অনুকূল সিদ্ধান্ত নিতে পেরে যেমন তিনি দুটি পুণ্যের অধিকারী হতেন, এ ক্ষেত্রেও তিনি একটি পুণ্যের অধিকারী হবেন।[১২৯]

---

১২৯. বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী আমর বিন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, 'কোন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হলে সে দুটি পুণ্যের অধিকারী হবে। আর (সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পর) ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও সে একটি নেকীর অধিকারী হবে। বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫২, মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৬, মুশকিলুল আছার, ১/৩২৬, মুসনাদ ইমাম শাফেয়ী, পৃ. ৩৫৫।

www.waytojannah.com

সাহাবা ও পরবর্তী যুগে এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

(এক) আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দৃষ্টান্ত

একদা তাঁর কাছে দাদীর মীরাস সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, দাদী মীরাস পাবে বলে কুরআন-হাদীসের কোথাও কোন প্রমাণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আমি অন্যদের কাছে জেনে দেখবো। অতঃপর তিনি সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে মুগীরা ইবন শু'বাহ ও মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ মীরাস দিয়েছেন।[১৩০]

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মত ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেন এবং ঈমান গ্রহণের পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিরোধান পর্যন্ত কখনও তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি, তা সত্ত্বেও এ হাদীসটি তাঁর সংগ্রহে ছিল না, যা একজন সাধারণ সাহাবীর সংগ্রহে ছিল।

(দুই) উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দৃষ্টান্ত

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, একদিন আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট এসে তিনবার প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং অনুমতি না পেয়ে ফিরে গেলেন। (অন্য সময়) যখন তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ফিরে গিয়েছিলেন কেন? জবাব দিলেন, আমি তিনবার অনুমতি চেয়েও অনুমতি পাইনি, তাই ফিরে গিয়েছি। কেননা, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চেয়ে অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়াই তার কর্তব্য।'[১৩১] এ ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয়, অনুমতি সংক্রান্ত এ হাদীস দ্বিতীয় খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর জানা ছিল না, যা আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর জানা ছিল।

(তিন) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দৃষ্টান্ত, যাতে তাঁর সিদ্ধান্ত হাদীসের অনুকূলে হয়েছিল

বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হল যে, জনৈক মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন। মহিলাটির 'মহর' নির্ধারিত করা ছিল না। (এখন তার মহর কোন্ হিসেবে আদায়

---

১৩০. ইবনে তাইমিয়্যাহ, রাফ'উল মালাম, ৬।

১৩১. বুখারী, হাদীস নং ৬২৪৫, মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৩।

www.waytojannah.com

Contents

করা হবে?) তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ জাতীয় কোন ফায়সালা করতে দেখিনি। অতঃপর তাদের মাঝে বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেল। ফলে বেশ বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এভাবে দীর্ঘ একটি মাস কেটে যাওয়ার পর ইবন মাসউদ (অনন্যোপায় হয়ে) 'কিয়াস' (যুক্তি কেন্দ্রিক ইজতিহাদ) করে ফতোয়া দিলেন যে, তাকে 'মহরে মাসাল' (পরিবারস্থ অন্যদের সমপরিমাণ) দেয়া হবে। কমও নয়, বেশিও নয়। তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে মিরাসেরও অংশীদার হবে। মা'কিল ইবন সিনান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তখন বলে উঠলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এক (বিধবা) মহিলার ব্যাপারে এই ফয়সালাই করেছিলেন। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা শুনে এমন আনন্দিত হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর এমন আনন্দিত কোনদিন হননি।[১৩২] এ ঘটনা থেকে আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারলাম, ক) সংশ্লিষ্ট হুকুমটি ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর জানা ছিল না। খ) ফলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে 'কিয়াসের' আশ্রয় নিয়েছেন, গ) আল্লাহ্ পাকের খাস মেহেরবানীতে তাঁর 'কিয়াস' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফয়সালার অনুকূলে হয়েছিল।

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহর দৃষ্টান্ত

ওয়াকফ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহর ফতোয়া হল, কোন জিনিস ওয়াকফ করার পর সেটা তার উপর আবশ্যিক হয়ে যায় না বরং যে কোন সময় ওয়াকফকৃত জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে। অবশ্য যদি সেটা ওসিয়্যতের পর্যায়ে হয় বা শরয়ী' কাযীর পক্ষ থেকে ফয়সালাকৃত হয়, তখন আর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম আবূ হানিফার এ ফতোয়া ছিল জমহুর ইমামদের পরিপন্থী এবং সহীহ হাদীসের খেলাফ। কেননা, এ সংক্রান্ত হাদীস তাঁর জানা ছিল না। অপরপক্ষে সেই হাদীসের ভিত্তিতেই জমহুর ওলামায়ে কিরাম এমনকি ইমাম আবূ হানিফার শাগরিদদ্বয় (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) এর মতও তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হানাফী মাযহাবের ফতোয়াও তাই।

ইমাম আবূ ইউসুফের মতও প্রথমত ইমাম আবূ হানিফার মতের অনুকূলেই ছিল। অতঃপর হাদীসটি পেয়ে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, এমন স্পষ্ট ও সহীহ হাদীসের বিপরীত মত পেশ করার অধিকার কারো নেই। ইমাম আবূ হানিফাও এ হাদীস পেলে বিপরীত মত পোষণ করতেন না।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানিফার মত ব্যক্তিত্ব, যিনি শুধু ফিক্হ শাস্ত্রেই নয় বরং হাদীস শাস্ত্রেও অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তাঁর পক্ষেও কোন কোন

১৩২. সুনান নাসায়ী, ৬/১২১, হাদীস নং ৩৩৫৫।

www.waytojannah.com

হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে তিনি সহীহ হাদীস ও জমহুরের মতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ সম্পর্কে তো অনেকের মন্তব্য যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন। কাজেই তার জন্য এটা স্বাভাবিক ব্যাপারই ছিল। এর জবাব হল, ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। বস্তুত তার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অথবা নিছক জেদের বশবর্তী হয়ে অনেকে এরকম অন্তসারশূন্য উক্তি করেছেন। তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিব, বিতর্কের মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে ইমাম আবূ হানিফার জীবনী পড়ুন। তখন আপনি নিজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবেন যে, সত্যই তিনি হাদীস শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ স্বীয় ইমামের মতের অন্ধ অনুকরণ করে বসে থাকেননি। বরং সহীহ্ হাদীস পাওয়া মাত্রই নিজ ইমামের মত ত্যাগ করে সহীহ হাদীসের উপরই আমল করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইমামের মতের কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হানিফা নিজেই সে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, আমার কোন মত যদি কোন সহীহ হাদীসের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমরা হাদীসকে গ্রহণ করে আমার মতকে উপেক্ষা করবে। এরপরও যদি কেউ হানাফী ইমামদের প্রতি ইমামের মতের কারণে সহীহ হাদীস উপেক্ষা করার অপবাদ রটিয়ে বেড়ান তবে তাদের জবাব আমাদের কাছে নেই।

ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহর দৃষ্টান্ত

ইমাম মালিক সম্পর্কে তাঁর শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াহাব বলেন, একদিন তাকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অযুর মধ্যে পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার গুরুত্ব কতটুকু? জবাবে তিনি বলেন, এটা জরুরী নয়। উপস্থিত লোকেরা চলে যাওয়ার পর তাঁকে বললাম যে, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ হাদীস, বল তো?

বললাম, সাহাবী ইবন শাদ্দাদ আল কারশী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযুর সময় কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা পায়ের অঙ্গুলীর ফাঁকে খিলাল করতে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ বললেন, নিঃসন্দেহে হাদীসটি 'হাসান'। এটি ইতিপূর্বে আমি কখনও শুনিনি। ইবন ওয়াহাব বলেন, এরপর থেকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি

www.waytojannah.com

খিলাল করার নির্দেশ দিতেন।[১৩৩] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এরপর থেকে তিনি ওযুতে যত্নের সাথে পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করতেন।

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহর দৃষ্টান্ত

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল রাহেমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন, আপনারা হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই, আপনাদের সংগ্রহে কোন হাদীস থাকলে আমাদের জানাবেন। তার রাবী যে কোন দেশেই হোক না কেন হাদীসটি সহীহ হলে আমি তার কাছে যাবো।[১৩৪]

এখানে ইমাম শাফে'য়ীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, অনেক হাদীস তার সংগ্রহে ছিল না, তাই তাঁকে ইমাম আহমদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল।

ইমাম আহমদ রাহেমাহুল্লাহর দৃষ্টান্ত

আলী ইবন মূসা আল হাদ্দাদ বলেন, একবার আমি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ আল-জাওহারীর সাথে কোন এক জানাযায় শরীর ছিলাম। দাফন কার্য সমাধা হওয়ার পর এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করল। ইমাম আহমদ বললেন, 'হে ভাই! কবরের পাশে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত।' অতঃপর কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এসে মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ তাঁকে বললেন, ইবনুল লাজলাজ তার ছেলেকে অসীয়ত করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাকে দাফন করে মাথার পাশে সূরায়ে বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করতে। তিনি আরও বলেছিলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে এ অসীয়ত করতে শুনেছি। এ কথা শুনে ইমাম আহমদ রাহেমাহুল্লাহ বললেন, লোকটিকে পাঠ করতে বলে এসো।

সারকথা, উল্লিখিত ঘটনাগুলো দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবাদের এবং পরবর্তী যুগের ইমামদের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যার নিকট সব হাদীসই সংগৃহীত ছিল। বরং লক্ষ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু হাদীস ছুটে গিয়েছে। ফলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে অন্য দলীলের নিরিখে ফতোয়া প্রদান করেছেন, যার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার এ ফতোয়া সহীহ হাদীসের এবং অন্যান্য ইমামদের মতের পরিপন্থী হয়েছে। অতঃপর অনেক ক্ষেত্রে তার জীবদ্দশাতেই সহীহ হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি নিজ মত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। অনেক

---

১৩৩. তাকদিমাতু আল-জারহি ওয়াত-তা'দীল, পৃ. ৩১।

১৩৪. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০৬।

www.waytojannah.com

Contents

ক্ষেত্রে শাগরিদদের কেউ হাদীসটি পেয়ে ইমামের মতকে সংশোধন করে নিয়েছেন। যেমন, আবূ ইউসুফের ঘটনাটিতে আমরা স্পষ্ট দেখে এসেছি। তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ইমামের কোন মত সহীহ্ হাদীসের বা অন্যান্য ইমামদের মতের সাথে পরিপন্থী হওয়ার সম্ভাব্য অনেকগুলো কারণের (যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে) মধ্যে এটি একটি কারণ মাত্র। কাজেই, কোন ইমামের কোন মত বাহ্যত হাদীসের পরিপন্থী পেলেই চক্ষু বন্ধ করে বলে দেয়া যাবে না যে, তিনি এ হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং অন্য কোন কারণ আছে কি-না তাও দেখতে হবে।

একটি সংশয়ের নিরসন :

প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীস শাস্ত্র তো সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত রয়েছে। কাজেই ইমামদের হাদীস ছুটে যাওয়ার কারণ কি? যার ফলে তাদেরকে অন্য দলীলের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এর জবাব হল, প্রথমত এমন কোন হাদীস গ্রন্থ নেই যার মধ্যে সব হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে।[১৩৫]

কাজেই এ ধরনের দু' একটি কিতাবের উপর ভরসা করা কি ফিক্হ শাস্ত্রের সকল সমস্যার সমাধান বের করা বা ফিক্হ শাস্ত্রের এ বিশাল ভাণ্ডার তৈরি হওয়ার কথা কল্পনা করা যায়? তাছাড়া শুধু কিতাবের মধ্যে হাদীসগুলো সংরক্ষিত থাকাই তো যথেষ্ট নয়, মুখস্থ থাকারও প্রশ্ন রয়েছে। সেগুলো থেকে মাসআলা বের করার মত যোগ্যতা থাকার ব্যাপারও রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, হাদীস গ্রন্থগুলোর প্রায় সব ক'টি সংকলিত হয়েছে ইমামদের পরবর্তী যুগে। কাজেই এ প্রশ্ন ইমামদের প্রতি মোটেই প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়ত, পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ কিতাবে যে পরিমাণ হাদীস সংগ্রহ করেছেন পূর্ববর্তী ইমামদের স্মৃতিভাণ্ডারে এর চেয়ে অধিক সংখ্যক হাদীস সংরক্ষিত থাকাটা অসম্ভব নয়। কেননা, তাঁরা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটবর্তী যুগের। কাজেই তাদের কাছে হাদীস পৌঁছেনি এজন্য আমল করেননি শুধু এটাই কারণ নয়, এর সাথে অন্যান্য আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। যার আলোচনা সামনে আসছে।

---

১৩৫. ইমাম নাওয়াবী রাহেমাহুল্লাহ বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে লিখেছেন, ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের রচিত সহীহ গ্রন্থগুলোতে সকল 'সহীহ' হাদীসের সমাবেশ ঘটাননি। তাঁরা সে চেষ্টাও করেননি। ইমাম বুখারী নিজেই বলেন, ما أدخلت فى كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح مخافة الطول আমি এ জামে গ্রন্থে (বুখারী শরীফ) সহীহ ব্যতীত অন্য কোন হাদীসের সমাবেশ ঘটাইনি। আর কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে অনেক 'সহীহ' হাদীসও ছেড়ে দিয়েছি (তাদরীবুর রাবী. পৃ. ৭৪)।

www.waytojannah.com

Contents

২. কোন হাদীস আমলের যোগ্য বলে প্রমাণিত না হওয়া

অর্থাৎ, কোন একটি হাদীস কারো নিকট বিশুদ্ধ ও আমলের যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য জনের নিকট তা প্রমাণিত হয়নি। এই মূল মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলাগুলোতে মতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এ মূল পার্থক্যের কয়েকটি উৎস হতে পারে।

প্রথম উৎস : অগ্রহণযোগ্য সনদে হাদীস প্রাপ্ত হওয়া

এ আলোচনার পূর্বে প্রথমে আমরা মৌলিক কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমত, সাহাবায়ে কিরাম বা পরবর্তী যুগের ইমামদের নিকট কোন হাদীস পৌঁছার পর হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রকার যাচাই-বাছাই না করেই তাঁরা আমল করা শুরু করতেন না। বরং হাদীসটি বিশুদ্ধ কি-না এবং আমল করার যোগ্য কি-না সে বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিতেন। যেমন, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর নিকট 'দাদীর মিরাস' সংক্রান্ত হাদীসটি পৌঁছার সাথে সাথেই সে অনুযায়ী ফায়সালা করেননি বরং তিনি প্রথমে তার বিশুদ্ধতায় নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিলেন। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হল, একদা জনৈকা মহিলা (যিনি সম্পর্কে কোন মৃত ব্যক্তির দাদী ছিলেন) আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর নিকট এসে জানতে চাইলেন, তিনি তাঁর নাতির মীরাস পাবেন কি-না? আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমার জানামতে কুরআন-হাদীসের কোথাও নাতির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদী কোন অংশ পাবে বলে উল্লেখ নেই। তবে তুমি এখন চলে যাও। আমি অন্যান্য সাহাবীর নিকট জেনে দেখি। অতঃপর তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে মুগীরাহ ইবন শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে আর কেউ (সাক্ষী) আছে কি? তখন মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ্ দাঁড়িয়ে একই সাক্ষ্য দিলেন। তখন এর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মীরাসের ফয়সালা করলেন।

দ্বিতীয়ত, কোন হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার উপর। বর্ণনাকারী যতই বিশ্বস্ত স্মরণশক্তি সম্পন্ন হবেন হাদীসের গুরুত্বের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারীর অসাধুতার পরিমাণ যত বেশি হবে হাদীসটি ততই দুর্বল বলে পরিগণিত হবে। বর্ণনাকারী যদি একেবারেই অসাধু হয় এবং অসত্য ভাষণে অভ্যস্ত ও জাল হাদীস রচনায় অভিযুক্ত হয়ে থাকে, তবে সত্য বললেও তার কোন হাদীসই গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে, সে সত্য বলেছে।

www.waytojannah.com

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে একই হাদীস বিভিন্ন ইমামের নিকট বিভিন্ন সনদে (সূত্র পরম্পরায়) পৌঁছেছে। কারো নিকট সহীহ সনদে, কারো নিকট দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য সনদে পৌঁছেছে। ফলে যার নিকট সহীহ সনদে পৌঁছেছে তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে যার নিকট দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য সূত্রে পৌঁছেছে তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, তবে অধিকাংশ ইমামই এসব পরিস্থিতিতে নিজ মন্তব্য পেশ করার সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এর বিপক্ষে কিন্তু একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (বিশুদ্ধ সূত্রে না পাওয়ায় তা গ্রহণ করতে আমি সক্ষম হইনি।) হাদীসটি সহীহ বলে প্রমাণিত হলে সেটাই হবে আমার মত।

সুতরাং কোন ইমামের নিকট সহীহ্ সনদে হাদীস পৌঁছার কারণে সে অনুসারে বলার পর অন্য ইমামের ফতোয়া যদি তার বিরোধিতা করে থাকে, তবে এটা বলা যাবে না যে, তিনি ইচ্ছাকৃত সহীহ হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া পেশ করছেন। অনুরূপ, যারা দুর্বল হাদীস অনুসারে ফতোয়া দিয়েছেন তাদের সম্পর্কেও বলা যাবে না যে, তারা দুর্বল বা পরিত্যাজ্য হাদীস দিয়ে ফতোয়া দিয়ে প্রচণ্ড ভুল করেছেন। কারণ, তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল ততটুকু তিনি করেছেন।

দ্বিতীয় উৎস : 'ইত্তিসালে সনদ' (সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকা)-র ক্ষেত্রে মতপার্থক্য

কোন হাদীস বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। এক. সূত্র পরম্পরা অক্ষুন্ন থাকা ও কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হওয়া। দুই. বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ত হওয়া। তিন. হাদীসটি বর্ণনাকারীর নিখুঁতভাবে স্মরণ থাকা। চার, হাদীসের সনদ ও মতন (সূত্র ও কথা) বিরলতা থেকে মুক্ত হওয়া। পাঁচ. মারাত্মক ধরনের ব্যতিক্রমধর্মিতা ও আপত্তিদুষ্টতা থেকেও মুক্ত থাকা। এ পাঁচটি শর্তের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'ইত্তিসালে সনদ' বা সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকা সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকার কারণে কোন কোন বর্ণনাকে সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ন নেই মনে করে সেটাকে কোন কোন ইমাম গ্রহণ করেননি, পক্ষান্তরে অন্য ইমামের নিকট সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ন রয়েছে মনে করে তিনি সেটাকে গ্রহণ করেছেন। উদাহরণত, ইমাম বুখারীর নিকট হাদীস বর্ণনাকারীর অবশ্যই যার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে তার সাথে সাক্ষাৎ হতে হবে। ইমাম মুসলিমের নিকট যদি বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করেছে তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব প্রমাণিত হয় তবে তাই যথেষ্ট, সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে এমনটি প্রমাণ করা জরুরী নয়। সুতরাং এ হিসেবে ইমাম বুখারী বহু বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ করেননি, পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম তা গ্রহণ করেছেন। ফলে এসব হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম

www.waytojannah.com

Contents

মুসলিম প্রমুখ যেসব ফাতাওয়া গবেষণা করে বের করে দিয়েছেন তাতে ইমাম বুখারীর সাথে মতের ভিন্নতা দেখা দিবে।

তৃতীয় উৎস : হাদীসে মুরসাল সম্পর্কে মতপার্থক্য

মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় হাদীসে মুরসাল হল, কোন তাবিঈ কর্তৃক তার ঊর্ধ্বতন সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে হাদীস বর্ণনা করে দেয়া। চাই সে সাহাবী নবীন হোন কিংবা প্রবীণ।

উসূলে ফিক্হ এর পরিভাষায় হাদীসে মুরসাল হল, কোন বর্ণনাকারীর সরাসরি একথা বলা যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি বর্ণনা করেছেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।[১৩৬]

এ জাতীয় হাদীস দ্বারা মাস'আলা বের করা যাবে কি না এ ব্যাপারেও ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে হাদীসে মুরসাল দুর্বল হাদীস বলেই বিবেচিত এবং মাসআলা বের করার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় লিখেছেন, আমাদের ও হাদীসশাস্ত্রবিদদের মূলনীতি অনুযায়ী হাদীসে মুরসাল দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফাসহ অনেক ফকীহের নিকট হাদীসে মুরসাল গ্রহণযোগ্য।

ইমাম জামালুদ্দীন আয-যাইলা'য়ী বলেন, হানাফী উলামায়ে কিরাম হাদীসে মুসনাদের মত হাদীসে মুরসালকে দলীলরূপে গ্রহণ করে থাকেন। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবে'য়ে তাবিঈনের মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ফুকাহায়ে কিরামের এ নীতিই ছিল। কেননা, কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীসে মুরসাল (বিশেষত শীর্ষস্থানীয় তাবিঈদের মুরসাল)কে উপেক্ষা করা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি শীর্ষভাগ উপেক্ষা করারই নামান্তর।

আলাউদ্দীন আল-বুখারী বলেন, হাদীসে মুরসালকে উপেক্ষা করা সুন্নাহর একটি বিরাট অংশকে উপেক্ষা করার নামান্তর। কেননা, হাদীসে মুরসালের সংখ্যা এত বেশি যে, সকল হাদীসে মুরসালকে একত্রিত করাতে প্রায় ৫০ খণ্ডের মহাগ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

ইমাম শাফে'য়ী কয়েকটি পরিস্থিতিতে হাদীসে মুরসাল গ্রহণ করে থাকেন, ১. সাহাবীর হাদীসে মুরসাল, ২. অথবা হাদীসটি অন্যসূত্রে মুসনাদরূপে বর্ণিত, ৩. হাদীসটির অনুকূলে কোন সাহাবীর ফতোয়া রয়েছে, ৪. হাদীসটির অনুকূলে অধিকাংশ আলেমের ফতোয়া রয়েছে. ৫. এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে

---

১৩৬. আল-আমেদী, আল-ইহকাম, ২/১৭৭।

www.waytojannah.com

যে, তিনি কোন অবিশ্বস্ত রাবী বা বর্ণনাকারীর ব্যাপারে 'ইরসাল' করেন না। যেমন, সা'য়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব।[১৩৭]

মোটকথা, এ মূলনীতিতে মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিবে। যেমন, কোন বিষয়ে যদি হাদীসে মুরসাল ব্যতীত অন্য কোন হাদীস না পাওয়া যায়, তখন মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীস মুরসালটিকে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মাসআলার সমাধানের জন্য অন্য কোন দলীলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। অনুরূপ, যতক্ষণ হাদীসে মুরসালটি উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোন একটি দ্বারা সমর্থিত না হবে ততক্ষণ ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ তা গ্রহণ করেন না এবং সংশ্লিষ্ট মাসআলাটির সমর্থনে অন্য দলীলের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। ফলে স্বভাবতই মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে। যেমন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কিরাম সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় এক অন্ধ ব্যক্তি এসে মসজিদের ভিতরের একটি গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। তা দেখে অনেকে সালাতের মধ্যেই হেসে ফেললেন। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পুনরায় ওযু ও সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন।[১৩৮]

এ জাতীয় আরও বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী আলিমগণ উচ্চস্বরে হাসির কারণে সালাতের সাথে ওযুও ভঙ্গ হওয়ার ফতোয়া পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে যেহেতু হাদীসগুলো মুরসাল এবং ইমাম শাফে'য়ী আরোপিত শর্তে উত্তীর্ণ নয়, তদুপরি তা উসূলের পরিপন্থী, তাই ইমাম শাফে'য়ীসহ অধিকাংশ আলিম এ হাদীসটি গ্রহণ করেন নি।[১৩৯]

চতুর্থ উৎস : রাবী বা বর্ণনাকারীর 'আদালত' তথা বিশ্বস্ততার মাপকাঠির ক্ষেত্রে মতপার্থক্য

হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো রাবী বা বর্ণনাকারী আদেল বা বিশ্বস্ত হওয়া। এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু বিশ্বস্ততার মাপকাঠি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। কারও বক্তব্য হল, কোন বর্ণনাকারী 'আদেল' হওয়ার জন্য তিনি মুসলিম হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকাই যথেষ্ট। কেউ বলেছেন, বরং এর সাথে বাহ্যিক ক্ষেত্রে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ থাকতে হবে। কেউ

১৩৭. হাদীসে মুরসাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী, ১/১৫৯-১৭১; সাখাওয়ী, ফাতহুল মুগীস, ১/১২৮, আল-'আলাঈ, জামেউত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল; ইবনে কাসীর, আল-বায়িসুল হাসীস, পৃ. ১০৭।

১৩৮. আবূ দাউদ, আল-মারাসীল, পৃ. ৭৫; ইবনে আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪১।

১৩৯. বিস্তারিত জানার জন্য আরো দেখুন, ইমাম শাফে'য়ী, আর রিসালাহ, ৪৬৯; যাইলা'য়ী, নাসবুর রায়াহ, ১/৪৭-৫৩; ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/৪০।

www.waytojannah.com

আরও কঠোরতা অবলম্বন করে বলেছেন যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তীরণ উভয় ক্ষেত্রেই তার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হতে হবে। আরও মতপার্থক্য আছে যে, কারও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে একজন ইমামের সাক্ষ্য যথেষ্ট না দু'জনের সাক্ষ্য আবশ্যক হবে। অনুরূপ, কোন বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্নকারী দুর্বলতাগুলো নির্ণয়ের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, কোন বর্ণনাকারীর বিশেষ কোন দুর্বলতা এক ইমামের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা অন্য ইমামের হয়নি। ফলে একই বর্ণনাকারী সম্পর্কে কেউ বিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করেছেন, অন্যরা অবিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করেছেন। 'রিজালশাস্ত্র' খুললে খুব কম বর্ণনাকারীই পাওয়া যাবে যার সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, বর্ণনাকারীর আদালত বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় হাদীস গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পঞ্চম উৎস : বর্ণনাকারীর স্মরণ ও সংরক্ষণের পরিমাণের ব্যাপারে মতপার্থক্য

হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য মুহাদ্দিসীনের নিকট তৃতীয় শর্ত হল, রাবী বা বর্ণনাকারীকে تام الضبط বা পরিপূর্ণ স্মরণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। এ ব্যাপারেও কারও দ্বিমত নেই। তবে এ বিশ্লেষণে এসে তাদের পরস্পর মতপার্থক্য হয়েছে। সাধারণ মুহাদ্দিসীন বর্ণনাকারীর লিখিত সংরক্ষণ ও স্মৃতির সংরক্ষণ উভয়টিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ এর শর্ত হল, হাদীসটি শোনার সময় থেকে বর্ণনা করা পর্যন্ত বর্ণনাকারীর পূর্ণ স্মরণ থাকতে হবে। মাঝে কখনো ভুলে গিয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ শর্তের প্রেক্ষিতে তার সাথে অন্যান্য ইমামের অসংখ্য হাদীসের ব্যাপারে সহীহ কিংবা দুর্বল হওয়ার মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সেখান থেকেই মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সূত্রপাত হয়েছে।

এখানে এসেও হয়ত কোন ব্যক্তি অন্যান্য ইমামের নিকট সহীহ বলে গৃহীত কোন হাদীস দেখে মন্তব্য করে বসবে যে, ইমাম আবূ হানিফা অমুক সহীহ হাদীসের পরিপন্থী মন্তব্য করেছেন। অথচ, ইমাম আবূ হানিফার দৃষ্টিতে সে হাদীসটি দুর্বল বলে বিবেচিত ছিল।

এছাড়া হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য বাকী যে দু'টি শর্ত রয়েছে, সেগুলোতেও ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে মাসআলা বের করার বেলায় মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ষষ্ঠ উৎস : হাদীসের মধ্যে 'ইল্লাত' (প্রচ্ছন্ন ত্রুটি) এবং ফিকহী মতভেদে তার প্রভাব

বিশুদ্ধ হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, হাদীসের মধ্যে 'ইল্লাত' বা প্রচ্ছন্ন কোন

www.waytojannah.com

দোষ না থাকা হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। 'ইল্লাত' এমন গুপ্ত দোষকে বোঝায়, যদ্দরুন হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে, যদিও বাহ্যিক দিক থেকে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ মনে হয়; তাঁর রাবীগণও নির্ভরযোগ্য এবং সনদও ছেদহীন। বাহ্যিক বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও ক্ষেত্র বিশেষে প্রচ্ছন্ন কোন ত্রুটি থাকাটা কিছু অস্বাভাবিক বিষয় নয়। এটা নানা কারণে হতে পারে। কখনও বর্ণনাকারী ভ্রমবশত সাহাবীর উক্তিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী (মারফূ' হাদীস) রূপে বর্ণনা করে ফেলেন। কখনও মুরসাল হাদীসকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। এমনও হয়ে যায় যে, একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য হাদীসের অংশ বিশেষকে তার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেন। তবে বিষয়টা চৌকস ও সুপণ্ডিত মুহাদ্দিসের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তাঁদের সামনে পড়লে ঠিকই ধরে ফেলেন এর কোথায় কি সমস্যা ঘটেছে। হাদীসশাস্ত্রের দীর্ঘ চর্চা ও মতন পরিচর্যার ফলে তাঁদের সে যোগ্যতা হয়ে যায়। হ্যাঁ, তাঁরা এটা নিরূপণ করেন বটে স্বীয় বুদ্ধি-বিচারের আলোকে। সঠিকভাবে খতিয়ে দেখার পর যখন প্রবল ধারণা হয়ে যায় যে, এর মাঝে 'ইল্লত' আছে তখনই ঘোষণা করেন যে, এ হাদীসটি 'মা'লূল' (প্রচ্ছন্ন দোষযুক্ত)। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রের অপরাপর বিষয় অপেক্ষা এ বিষয়টা খুবই জটিল ও সূক্ষ্ম। বিশেষজ্ঞদেরও কখনও কখনও এক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়। হয়ত একজনের চোখেই পড়ল না যে, এ হাদীসটিতে 'ইল্লত' আছে। আবার কেউ বা বিশ্লেষণের অপূর্ণতার কারণে নির্দোষ হাদীসকে 'মা'লূল' বলে বসলেন। বিষয়টা তো এ পর্যন্তই শেষ হয়ে যায় না। একটি হাদীস যার চোখে 'মা'লূল' তিনি যেহেতু সে হাদীসকে বিশুদ্ধ মনে করেন না, তাই সে হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী তার কাছে ফিকহী কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক নয়, কিন্তু অপর একজনের কাছে হাদীসটি 'ইল্লত'-মুক্ত। সুতরাং সেটি বিশুদ্ধ এবং তার বক্তব্য শিরোধার্য। তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য এবং সম্পূর্ণ সঠিক। যেমন, সালাত আদায়কালে সূরা ফাতিহার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া হবে কিনা, এ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে পড়া যাবে না। ইমাম আবূ হানিফা (রহ), ইমাম শাফে'য়ী (রহ) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) বলেন, পড়া যাবে ; বরং সুন্নাত।[১৪০] এ মতভেদের কারণ আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত একটি হাদীস, তাতে এসেছে, عن أنس قال صليت مع رسول الله وابى بكر وعمر فلم اسمع احدا منهم يقرأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ "আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বকর ও উমর-এর পেছনে সালাত

১৪০. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৮৯।

www.waytojannah.com

আদায় করেছি, কিন্তু কাউকেই بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তে শুনি নি।[১৪১] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কাতাদা, তাঁর থেকে শু'বা, তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইবন জা'ফর এবং তাঁর থেকে গুনদার সকলেই 'সিকা' বা বিশ্বস্ত। আর সূত্রও নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু তথাপি অনেকের মতে হাদীসটি মা'লূল। কেননা তাদের কথা হচ্ছে যে, এ হাদীসটি অন্যান্য যেসব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাতে 'বিসমিল্লাহ' সম্পর্কিত কোন কথা নেই। বোঝা যাচ্ছে আলোচ্য সূত্রের কোন এক রাবী বিভ্রমবশত এ অংশটুকু অতিরিক্ত করে ফেলেছেন। অপর দিকে ইমাম তীবি রাহেমাহুল্লাহ পর্যালোচনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, হাদীসটি 'মা'লূল' নয়।[১৪২] ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহর দৃষ্টিতে হাদীসটি মা'লূল নয় বরং সহীহ্। যে কারণে তিনি এর ভিত্তিতে বলেন, সূরা ফাতিহার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়া সুন্নাত নয়। অপরাপর ইমামগণ বলেন, সুন্নাত। কেননা বহু হাদীসে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বিসমিল্লাহ' পড়তেন। তাঁর আলোকে উপরিউক্ত হাদীসটি হয়ত 'মা'লুল' সাব্যস্ত হবে, নতুবা এর ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকবে।[১৪৩] যা হোক মাস'আলাটি সম্পর্কে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে তার মাঝে হাদীস 'মা'লূল' হওয়ার ব্যাপারটিও যে একটা প্রভাব সৃষ্টি করেছে সেটা লক্ষণীয়।[১৪৪]

সপ্তম উৎস : হাদীসটি শায কিংবা বিরল হওয়া ও ফিকহী মতভেদে তার প্রভাব

বিশুদ্ধ হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, হাদীসটি শায বা বিরল হতে পারবে না। অর্থাৎ শায বা বিরল না হওয়া হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। 'শায' বা বিরলতা বলতে অনেকের মতের বিপরীতে ভিন্ন মত পোষণকে বোঝায়। পরিভাষায়, কোন 'সিকাহ' বা বিশ্বস্ত অথবা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এমন কোন হাদীস বর্ণনা করে যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিরোধী হয়। এ ধরনের হাদীস বুঝতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও হাদীস থাকতে হবে এবং সেগুলোতে পরস্পর বিরোধিতা পাওয়া যায় এমন হতে হবে। এমতাবস্থায় যে হাদীসটির বর্ণনা অপরাপর সহীহ হাদীসের বর্ণনাসমূহের বিপরীত হবে সেটাকে শায বলা হবে। ফকীহগণ কখনো কখনো একটি

---

১৪১. মুসলিম, হাদীস নং ৮৮৮।

১৪২. শাব্বির আহমদ আল-উসমানী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৫৪।

১৪৩. প্রাগুক্ত, ১/৯০; শাব্বীর আহমাদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম, ২/৩৫; আনোয়ার শাহ আল-কাশমীরী, ফায়যুল বারী, ৩/২৬৮; ইবনে আব্দিল বার, আল-ইস্তিযকার, ১/৪৩৬।

১৪৪. যাইলা'য়ী, নাসবুর রায়াহ; ইবনে আবদিল বার, আল-ইস্তিযকার, ১/৪৩৮।

www.waytojannah.com

সহীহ হাদীসকে তার বিপরীত অনেকগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীত মনে করে সেটাকে গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে মতভেদ করেছেন, যা ফিকহী মতভেদে প্রভাব ফেলেছে।

৩. হাদীসসমূহের পারস্পরিক বিরোধ ও তাঁর কারণ এবং ফিকহী মতভেদে তার প্রভাব

হাদীসশাস্ত্রের মনোযোগী পাঠককে মাঝে মধ্যেই একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং ক্ষণিকের জন্য তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। যে দেখে, একটা বিষয় সম্পর্কে সবেমাত্র আমি এক কথা পড়ে আসলাম, আর এখানে দেখছি ভিন্ন কথা। পূর্বের অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের উদ্দেশ্যে এক হুকুম জারি করেছেন অথচ এখানে আছে স্বতন্ত্র আদেশ। পাঠকের মনে কৌতূহল জাগে, কেন এই বৈসাদৃশ্য? জ্ঞানের অফুরন্ত এই ভাণ্ডারে পরস্পর বিরোধী কথার রহস্য কী? মূলত এর কয়েকটি কারণ থাকতে পারে।

এক. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর যখন কোন হুকুম নাযিল হত, তখন মু'মিনদেরকে তা হাতে নাতে শিক্ষা দিতেন। কিভাবে ওযু করতে হয় তা নিজে করে দেখাতেন। নিজে সালাত আদায় করে সালাত শিক্ষা দিতেন। কোন্‌টা ফরয, কোন্‌টা ওয়াজিব, কোন্‌টা সুন্নাত, কোন্‌টা মুস্তাহাব তা নয় বরং কাজের রূপটা কি তাই শেখাতেন। এতে কাজের কোন অংশের কী গুরুত্ব, সেটা ঠিক বুঝে ওঠা সকলের পক্ষে সম্ভব হত না এবং সকলের জন্য তাঁর দরকারও ছিল না। এটা বুঝতে পারত কেবল সেসব ব্যক্তি, যারা ধীমান, বিচক্ষণ ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী তথা ফকীহ ছিলেন। অতঃপর তাঁরা যখন সে বিষয়টি বর্ণনা করতেন, তখন উভয় শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিত। কেননা ফকীহ শ্রেণীর সাহাবীদের বর্ণনায় কোনটির কী গুরুত্ব তা পরিস্ফুট হত এবং অন্যদের বর্ণনায় সবই সমান গুরুত্ব পেত। এভাবে একই বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী হাদীস ফুকাহায়ে কিরাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং কালক্রমে হাদীসের সংকলিত গ্রন্থে সেই উভয় রকমের হাদীস-সমস্ত ঠাঁই পেয়েছে।

দুই. কখনও কখনও সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতেন এবং তিনি তাঁর উত্তর দিতেন। তাঁর সে উত্তরে ব্যক্তির অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হত। কখনও অবস্থার বৈচিত্র্যের কারণে একই প্রশ্নের উত্তরেও বৈচিত্র্য প্রকাশ পেত। পরবর্তীতে সেটাই হাদীসের পারস্পরিক বিরোধের রূপ পরিগ্রহ করছে।

www.waytojannah.com

তিন. হাদীস বর্ণনায় যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুবহু কথা তাঁরই শব্দে তুলে ধরার রীতি ছিল, তেমনি তাঁর বক্তব্যকে নিজ ভাষায় বর্ণনা করার রীতিও ব্যাপকভাবে গৃহীত ছিল। এর ফলে একজনের শব্দের সঙ্গে অন্যজনের শব্দের পার্থক্য হয়ে যেত। কখনও সে শাব্দিক পার্থক্য অর্থগত বৈপরীত্যেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটিও হাদীসের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের একটা বড় কারণ।

চার. ইসলামের অনেক বিধানই ক্রমবিকাশের ধারায় পূর্ণতা লাভ করে। হয়ত এক সাহাবী প্রথম দিকের রূপ দেখেছেন এবং তা নিয়েই দেশে ফিরে গেছেন। পরবর্তীকালে তাতে যা কিছু সংযোজিত হয়েছে তাঁর তা দেখার সুযোগ হয়নি। ফলে যাঁরা তা দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর বর্ণনায় পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

পাঁচ. কোনও বিধান প্রথম দিকে ছিল, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। কেউ কেউ হয়ত জানতে পারেন নি যে, তা রহিত করা হয়েছে। ফলে তিনি জীবনভর সেটাই বর্ণনা করে গেছেন, কিন্তু অপর যাঁরা তা জানতেন তাঁরা পরবর্তীতে প্রদত্ত বিধান বর্ণনা করেছেন। ফলে উভয় শ্রেণীর বর্ণনায় সুস্পষ্ট বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ছয়. প্রথম দিকের মানুষের স্মরণশক্তি প্রখর ও অসাধারণ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষেত্র-বিশেষে বিস্মৃতি তখনও তাদের মধ্যে কাজ করেছে। ফলে একজন এক রকম বর্ণনা করেছেন। কিংবা অন্যরকম বর্ণনা করেছেন আর যিনি তা মনে রাখতে পেরেছেন তাঁর বর্ণনা সঠিক হয়েছে। কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ভুল সে তো বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় এবং সেক্ষেত্রেও মতের অমিল অস্বাভাবিক নয়। বাকি বিচার-নিষ্পত্তির আগে উভয় রকম বর্ণনার মধ্যে বিরোধ একটা অনিবার্য বিষয়।

সাত. এক সাহাবী হয়ত একটা হাদীস জানেন না, ফলে তিনি স্বীয় ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনী শক্তিবলে সে বিষয়ে ফয়সালা করেছেন এবং তাঁর শিষ্যগণ তা বর্ণনা করেছেন। সাহাবীর কথা বা কাজও পরিভাষায় হাদীসের অন্তর্ভুক্ত এবং ক্ষেত্র বিশেষে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর মর্যাদা দেওয়া হয়। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সে বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যা সাহাবী প্রদত্ত ফয়সালার পরিপন্থী। পরবর্তীকালের লোকের জন্য এটাও একটা বিরোধ, যার নিষ্পত্তির জন্য সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

আট. সাহাবায়ে কিরাম সকলেই ছিলেন বিশ্বস্ত। কিন্তু পরবর্তীকালের লোকের মধ্যে বিশ্বস্ত-অবিশ্বস্ত কিংবা কম বিশ্বস্ত সব রকমের মানুষই ছিল। সাহাবীর পর হাদীসের বর্ণনা সিলসিলা যত দীর্ঘ হবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপড়েনও তত তীব্র হবে। এটা একান্তই পরিষ্কার কথা। প্রত্যেক স্তরেই রাবীর-বিস্মৃতি এবং তজ্জনিত শাব্দিক হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা সম্পূর্ণ বিস্মৃতি অনেক কিছুরই অবকাশ আছে এবং বাস্তবে যে

www.waytojannah.com

তা ঘটেনি এমনও নয়। বস্তুত এটাও হাদীসের বর্ণনায় পারস্পরিক বিরোধের এক অন্যতম কারণ।

মোদ্দাকথা এরকম বহু কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেশ কিছু সংখ্যক হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। সেসব পরস্পর বিরোধী হাদীস যখন ফুকাহায়ে কিরামের কাছে পৌঁছেছে তখন তার আলোকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রথমে তাঁদেরকে সে বিরোধের টানা-পোড়ন থেকে উদ্ধার লাভের পথ খুঁজতে হয়েছে। এজন্য তাঁরা যে মূলনীতি অবলম্বন করেন তা নিম্নরূপ :

পরস্পর বিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের গৃহীত মূলনীতি

হাদীসের আপাতদ্বন্দ্ব নিরসনের পথে ফুকাহায়ে কিরাম মৌলিকভাবে তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছেন : (ক) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন; (খ) এক হাদীস দ্বারা অপর হাদীস রহিত হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান : (গ) এক হাদীসের উপর অপর হাদীসের অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ।

এক. ফুকাহায়ে কিরাম প্রথমে চেষ্টা করেন পরস্পর বিরোধী হাদীসের এমন কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা করা যায় কিনা যার ফলে উভয় হাদীসের আপন-আপন স্থানে এমন লাগসই হয়ে যায় যে, একটির সাথে অপরটির আর বৈসাদৃশ্য থাকে না। তবে কাজটা কঠিন, বরং সুকঠিন। কেবল ফুকাহায়ে কিরামের পক্ষেই এটা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রেও যার দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও দূরগামী তিনিই তত বেশি কৃতকার্য হন।

দুই. যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয় তখন অনুসন্ধান করা হয় যে, একটি হাদীস দ্বারা অপর হাদীস রহিত হয়ে গেছে কিনা, এটা কখনও জানা যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্য দ্বারা। আবার কখনও জানা যায় সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য হতে। আবার তারিখ দ্বারাও অনেক সময় বিষয়টা স্থির করা যায়। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন বিষয় আছে, যদ্দারা নির্ণয় করা সম্ভব যে, কোন্ হাদীসটি দ্বারা কোন্টি রহিত হয়েছে।

তিন. যখন এটাও নির্ণয় করা সম্ভব হয় না যে, পরস্পর বিরোধী হাদীসের কোনও একটি রহিত হয়ে গেছে কি না তখন একজন ফকীহ্ পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, কোন্ হাদীসটি বেশি গ্রহণযোগ্য? সুতরাং যে হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা বেশি তিনি তাঁর আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গ্রহণযোগ্য বিচারের মাপকাঠি বিবিধ রকমের। কখনও তা করা হয় সনদের ভিত্তিতে, কখনও বিষয়বস্তুর নিরিখে। আবার উভয় পদ্ধতির আছে নানা প্রকারভেদ। আল-ইরাকীর বক্তব্য অনুসারে এর সর্বমোট সংখ্যা শতাধিক। আল্লামা শাওকানী (র.) তাঁর রচিত 'ইরশাদুল-ফুহুল' গ্রন্থে ১৬০ টি কারণ উল্লেখ করেছেন, যার ভিত্তিতে

www.waytojannah.com

Contents

একটি হাদীসের উপর অপর হাদীসকে অধিক গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করা যায়। নিম্নে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা গেল :

এক. একটি হাদীসের রাবীগণ প্রত্যেকেই ফকীহ্, কিন্তু অপর হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হলেও ফকীহ্ নন। এরূপ ক্ষেত্রে যে হাদীসের রাবীগণ ফকীহ্ সে হাদীস অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।

দুই. পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে একটি হাদীসের বর্ণনাকারী বেশি হলে কারও কারও মতে সে হাদীস অগ্রাধিকার পাবে।

তিন. যে হাদীসের সনদ অপেক্ষাকৃত কম স্তরবিশষ্ট, সে হাদীস দীর্ঘ স্তরবিশিষ্ট সনদে বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।

চার. নাহু বা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে রাবীর পাণ্ডিত্যের কারণেও তাঁর বর্ণিত হাদীসকে অন্যদের বর্ণিত হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

পাঁচ. স্মরণশক্তি বেশি থাকা, হাদীস সংরক্ষণে অধিকতর যত্নবান হওয়া, হাদীস শাস্ত্রে খ্যাতিমান হওয়া, বেশি মুত্তাকী হওয়া, আকীদা-বিশ্বাসে-বিশুদ্ধ থাকা প্রভৃতি বিষয়ের ভিত্তিতেও এক রাবীর বর্ণিত হাদীসকে অন্য রাবীর বর্ণিত হাদীসের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

ছয়. যে হাদীসের বিষয়বস্তু অপর হাদীস অপেক্ষা কুরআন মাজীদের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ সে হাদীস অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়।

সাত. সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা যে হাদীস সমর্থিত হয় সে হাদীস তার বিপরীত হাদীস অপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য।

আট. যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীস অপেক্ষা তাঁর বাণীকে অগ্রগণ্য মনে করা হয়ে থাকে।

নয়. যে হাদীস দ্বারা কোন বিষয়ের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় সে হাদীস ওই বিষয়েরই বৈধতা প্রমাণকারী হাদীসের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

দশ. সাধারণত নীতির বর্ণনা-সম্বলিত হাদীসকে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়।[১৪৫]

হাদীসের বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ফিকহী ইখতিলাফে তাঁর প্রভাব

উপরে বর্ণিত নীতিমালাসহ একটি হাদীসকে অপর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদানের আরও যত নীতি আছে, একজন হাদীসের পাঠক, গবেষক এসব নীতিমালার প্রয়োগ মাত্রই জটিলতা ঘুচে যায় ব্যাপারটা তা নয়। কেননা এমন তো হতেই পারে

---

১৪৫. সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী, ২/১৯৮-২০২।

www.waytojannah.com

Contents

যে, অগ্রাধিকার লাভের কারণসমূহও বিভিন্ন। একজন ফকীহ্কে তখন সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে যে, তিনি কোন্ হাদীসকে গুরুত্ব দিবেন। পরিশেষে তিনি হয়ত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন এবং একটা হাদীসকে গ্রহণ করে নিবেন। আর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র অকাট্য কোন ভিত্তি নয় বরং ফকীহের প্রবল ধারণা বা মনের অধিকতর ঝোঁকই শেষ অবলম্বন। কাজেই অপর কোন ফকীহ্ বিপরীত হাদীসটিতে বিদ্যমান অগ্রধিকার কারণটি বিবেচনা করে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়তে পারেন। এভাবে যখন উভয় ফকীহ্ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন দেখা যাবে দুই হাদীসের ভিত্তিতে দু'জন দু'রকমের বহু মাস'আলায় কেবল এ কারণেই মতভেদ দেখা দিয়েছে যে সে বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী, এক-এক ফকীহের কাছে এক-একটি হাদীস অগ্রাধিকার পেয়েছে আর তার ভিত্তিতেই তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ফয়সালা দিয়েছেন।

৪. দুর্বল হাদীসের উপর আমল সংক্রান্ত মতপার্থক্য ও ফিকহী মতবিরোধে এর প্রভাব

ইমামদের নিজ নিজ শর্তানুযায়ী যেসব হাদীস সহীহ তথা বিশুদ্ধ অথবা হাসান বা উত্তম বলে সাব্যস্ত হবে তার উপর আমল করার ব্যাপারে এবং এর ভিত্তিতে শরী'আতের আহকাম ইস্তিম্বাত বা বের করার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু, দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। আহকাম বা বিধি-বিধান বের করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিস দুর্বল হাদীস গ্রহণ না করলেও কোন কোন ফকীহ ও মুহাদ্দিস বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ফাযায়েল সংক্রান্ত দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া কোন মাসআলায় সহীহ হাদীস পাওয়া না গেলে সেখানে যদি কোন সামান্য দুর্বল পাওয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রেও মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে ইমাম আবূ হানিফা,[১৪৬] মালিক[১৪৭] এবং আহমদ ইবন হাম্বল[১৪৮] রাহেমাহুমুল্লাহ সামান্য দুর্বল হাদীসকে গ্রহণ করেছেন এবং সেটাকে 'রায়' বা নিজস্ব ধ্যান-ধারণার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৪৯] এমনকি ইমাম শাফে'য়ী থেকেও অনুরূপ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে

---

১৪৬. ইবনুল কাইয়্যেম, আ'লামুল মুওয়াক্কে'য়ীন, ১/৮১-৮২; আস-সাখাওয়ী, ফাতহুল মুগীস, ১/২৬৭; আব্দুল হাই লাখনৌভী, আল-আজওয়িবাতুল ফাদিলা, পৃ. ৫১।

১৪৭. ইবনুল কাইয়েম, আ'লামুল মুওয়াক্কে'য়ীন, ১/৩৩।

১৪৮. প্রাগুক্ত, ১/৩১; ইবনে বাদরান, আল-মাদখালু ইলা মাযহাবিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, পৃ. ৪৩। এমনকি ইমাম আহমাদের মাযহাবের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উসূলে পরিণত হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যেম, প্রাগুক্ত, ১/৮১।

১৪৯. মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাত, ১/১৯; আল-আসরারুল মারফু'আহ ফিল আখবারিল মাওদু'আহ, পৃ. ৩১৫।

www.waytojannah.com

বোঝা যায় যে, তিনিও কখনও কখনও দুর্বল হাদীসকে 'রায়' বা কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৫০] তাছাড়া ইমাম সুফিয়ান সাওরী,[১৫১] আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন আবি হাতেমসহ মুহাদ্দিসদের একটি জামাতও আহকামের ক্ষেত্রে অন্য কোন আয়াত বা হাদীস না পেলে একেবারেই দুর্বল নয় এমন দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেছেন।[১৫২]

পরবর্তী কোন কোন মাযহাবের আলিমগণ এ ব্যাপারে আরও বেশি অগ্রসর হয়ে ফাযায়েল এমনকি মুস্তাহাব সাব্যস্ত করতেও তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী আলিম ইবনুল হুমাম বলেন, 'একান্ত 'মওযু' বা জাল না হলে দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব বিষয় প্রমাণিত হবে'।[১৫৩] শাফে'য়ী মাযহাবের ইমাম নাওয়াবী বলেন, ওলামা, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কিরাম ও অন্যরা মন্তব্য করেন, নিতান্ত জাল না হলে দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে ফাযায়েল, তারগীব (উৎসাহব্যঞ্জক), তারহীব (ভীতিপ্রদর্শন)এর ক্ষেত্রে আমল করা জায়েয ও মুস্তাহাব। তবে, আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে একমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস ছাড়া আমল করা যাবে না।[১৫৪] সুতরাং দুর্বল হাদীস সংক্রান্ত আলিমদের এ সমস্ত মতভেদ ফিকহের মধ্যেও মতভেদ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।

৫. রিওয়ায়াতুল হাদীস বিল মা'না ও ফিকহী মতবিরোধে এর প্রভাব

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত হাদীসের হুবহু শব্দের প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু তার ভাবার্থ বর্ণনা করা। এতে অনেক ক্ষেত্রে রাবী প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হতে পারে। ফলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই এ জাতীয় বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জমহুর ওলামার মত হলো, রাবীর আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

---

১৫০. ইবনুল কাইয়্যেম, প্রাগুক্ত, ১/৩২।

১৫১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, আল-কিফায়াহ, পৃ. ২১২, ইবনে রাজাব, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৭৩।

১৫২. প্রাগুক্তদ্বয়; ইবনে আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল, ১/১/৩০-৩১; আল-হাকিম, আল-মাদখাল ইলাস সহীহ, পৃ. ৮৩-৮৪; আল-লাখনৌভী, আল-আজওয়িবাতুল ফাদিলাহ, পৃ. ৫০-৫১; কাসেমী, কাওয়ায়েদুত তাহদীস, পৃ. ১১৪।

১৫৩. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ১/৪১৭, ২/১৩৩। তবে এখানে মুস্তাহাব বলে উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, পারিভাষিক মুস্তাহাব বলা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ, মুস্তাহাব হচ্ছে 'হুকমে শর'য়ী', এ ব্যাপারে আলিমগণ কঠোরতা আরোপ করেছেন। সুতরাং ফাযায়েল বা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হাদীসগুলোর উপর আমল করা মুস্তাহাব বলা যাবে না।

১৫৪. ইমাম নাওয়াবী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব, ৩/২৪৮, ৫/২৯৩-২৯৪; আল-আযকার, ৪/২৩৬, আল-ফতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ সহ মুদ্রিত; আল-আরবাঈন, পৃ. ৩।

www.waytojannah.com

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আরও একটি শর্ত আরোপ করেছেন। বস্তুত তা ইমাম সাহেবের বিচক্ষণতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। শর্তটি হলো, বর্ণনাকারীকে ফকীহ হতে হবে। ইমাম সাহেবের যুক্তি হল, অনেক ক্ষেত্রে শব্দের সামান্য তফাতে অর্থের খুব একটা ভিন্নতা সৃষ্টি না হলেও মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় বেশ পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেক সময় এক একটি শব্দের উপর নির্ভর করে অনেক মাসআলার সমাধান, যা একমাত্র ফিকহশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। যেমন, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা সালাতে আসতে শান্তভাবে আসবে। অতঃপর (ইমামের সাথে) যে কয় রাকাত পাবে পড়ে নিবে, আর যা ছুটে যাবে তা পুরা করে নিবে।[১৫৫] অন্য রেওয়ায়েতে فأتموا। (পুরা করে নিবে) এর স্থলে فاقضوا। রয়েছে।[১৫৬] আর একটি বর্ণনাতে রয়েছে وليقض ما سبقه অর্থাৎ যা ছুটে গিয়েছে তা কাযা করে নিবে।[১৫৭] শব্দের এ সামান্য পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিতে হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ, শব্দ দু'টির উপর ভিত্তি করেই ফিকহশাস্ত্রে ইমামদের মাঝে বিরাট মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কোন মুক্তাদী যদি চার রাক'আত সালাতের চতুর্থ রাক'আতে গিয়ে ইমামের সাথে শরীক হয়, তবে ইমামের সালাত শেষ হওয়ার পর তার ছুটে যাওয়া তিন রাক'আত কিভাবে আদায় করবে। প্রথম বর্ণনায়, অর্থাৎ فأتموا। 'তোমরা অবশিষ্ট সালাত পূর্ণ করে নেবে' –এর অর্থ দাঁড়ায়, মুক্তাদী যে রাক'আত ইমামের সাথে আদায় করেছিল সেটা হল তার প্রথম রাক'আত। ফলে ইমামের সালাম শেষে সে যখন ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াবে সেটা হবে তার দ্বিতীয় রাক'আত। কাজেই তাতে 'ছানা' পাঠ করতে হবে না এবং এ রাক'আত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসবে। অবশিষ্ট দু'রাক'আতে সূরাও মিলাতে হবে না। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ্ ও কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম এ ফতোয়াই দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত فاقضوا। অর্থাৎ ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো আদায় করে নেবে, অনুযায়ী ইমামের সালাত শেষে যখন দাঁড়াবে সেটা হবে তার প্রথম রাক'আত। কাজেই তাতে 'ছানা' পড়তে হবে এবং প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহার সাথে সূরা মিলাতে হবে। ইমাম আবূ হানিফা প্রমুখ বলেছেন, যেহেতু তার ইমামের সাথে আদায় করা রাক'আতটি ছিল প্রকৃত প্রথম রাক'আত কাজেই দাঁড়িয়ে আর এক

---

১৫৫. বুখারী, হাদীস নং ৬৩৫।

১৫৬. মুসনাদ আল হুমাইদী, ২/৪১৮, হাদীস নং, ৪১৮; মুসনাদে আহমদ, ২/২৭০।

১৫৭. মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, ২/২৮৮।

www.waytojannah.com

রাক'আত পড়ে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসবে। এই হিসাবে উভয় রেওয়ায়েতের উপর আমল হয়ে যাবে।

মোটকথা, শব্দের সামান্য পার্থক্যে আপাতদৃষ্টিতে অর্থের তেমন একটা তফাৎ দৃষ্টিগোচর না হলেও মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্যের সৃষ্টি হয় আর সে জন্যই ইমাম আবূ হানিফা (রহ) হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনার জন্য রাবীর ফকীহ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। এ শর্তের উপর ভিত্তি করে যেসব রাবী ফকীহ নন এবং হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন, যা অন্যান্য ইমামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু ইমাম আবূ হানিফার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

৬. হাদীসের পাঠোদ্ধারে পার্থক্য এবং ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

হাদীস গ্রহণের জন্য আর একটি শর্ত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বাক্যগুলো কিভাবে উচ্চারণ করেছেন সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ যের, যবর, পেশের কোন ব্যতিক্রম যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা, আরবী ভাষার সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তিরই অজানা নয় যে, আরবী ভাষা খুবই স্পর্শকাতর। যের-যবরের সামান্য পার্থক্যে বা কোন একটি শব্দ সামান্য দীর্ঘ করা না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ দাঁড়ায়।

যেমন, শরীয়ত মুতাবিক কোন বকরী যবেহ করার পর তার উদরে যদি কোন বাচ্চা পাওয়া যায় তবে তার হুকুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :[১৫৮] ذكاة الجنين ذكاة أمه এ হাদীসে দ্বিতীয় ذكاة শব্দটির শেষে যবর ও পেশ উভয় বর্ণনা রয়েছে। পেশের বর্ণনাটি যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁরা অর্থ করেছেন ذكاة الجنينْ هى ذكاة أمه উদরের বাচ্চা হালাল হওয়ার জন্য তার মাকে হালাল করাই (যবেহ করা) যথেষ্ট। কাজেই বাচ্চাটি নতুনভাবে যবেহ করতে হবে না। আর যাঁরা যবরের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অর্থ করেছেন, ذكاة الجنين هى ذكاة أمه উদরের বাচ্চাটির হালাল করার পদ্ধতি তার মাকে হালাল করার মতই। অর্থাৎ يذكى تذكية مثل ذكاة أمه উদরের বাচ্চাটিকেও তার মাকে যেভাবে যবেহ করে হালাল করা হয়েছে সেভাবে যবেহ করে হালাল করতে হবে।

এ বর্ণনা অনুযায়ী যদি বাচ্চাটি জীবিত বের হয় তবে তাকে মার ন্যায় পৃথকভাবে যবেহ করতে হবে। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ প্রসিদ্ধ ও প্রথম রেওয়ায়েতটি গ্রহণ

১৫৮. সুনান আবি দাউদ, হাদীস নং ২৮২৮; তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৭৬; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৯।

www.waytojannah.com

করেছেন, আর ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ ও ইবন হাযাম আয-যাহেরী রাহেমাহুল্লাহ দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে ফতোয়া দিয়েছেন।[১৫৯]

অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত

আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তিনি এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মসজিদে এসে পৌঁছলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের রুকু করছিলেন, তখন তিনি কাতারে যাওয়ার আগেই কাতারের পিছনে রুকু দিয়ে দিলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, زادك الله حرصا ولا تعد; "আল্লাহ্ তোমার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়ে দিন আর তুমি এ কাজটি দ্বিতীয়বার করো না/এটাকে পুনরায় করো না।[১৬০]

এ হাদীসে ولا تَعُدْ শব্দটি কিভাবে পড়া হবে এর ভিত্তিতে ফুকাহাদের মধ্যে সালাতের জামা'আতের পিছনে একাকী সালাতে দাঁড়ানোর মাস'আলাতেও মতভেদ হয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ এটাকে ولا تَعُدْ বা পুনরায় এ কাজটি করো না' এভাবে পড়ে এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। তখন তার সালাতটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সেটি প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের মতে সালাতটি শুদ্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে কোন কোন ফকীহ এটাকে ولا تُعِدْ পড়েছেন তখন অর্থ হবে, এটি তোমার জন্য বিশুদ্ধ সালাতে পরিগণিত হয়েছে সুতরাং তুমি এটাকে আবার পড়তে হবে না।[১৬১]

৭. 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব শর্তারোপ করা হয়েছে তার মাঝেও ইমামদের মতের বিভিন্নতা রয়েছে। কারও শর্ত খুবই কঠিন। কারও শর্ত অপেক্ষাকৃত (কিছুটা) নমনীয়। যেমন ইমাম আবূ হানিফার যুগে কূফা শহরে জাল হাদীস রচনার প্রচলন খুব বেশি ছিল বলে তিনি হাদীস গ্রহণের বেলায় বেশ সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং তার শর্তগুলি ছিল কঠিন। এ ব্যাপারে কোন কোন ইমামের মত হলো, হাদীসটি কুরআন ও সুন্নাহর অপরাপর কোন দলীলের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হলে সেটা পরিহার্য। আর কোন কোন ইমামের মত হলো, যদি কোন হাদীস শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী হয়, তবে দেখতে হবে হাদীসের রাবী

---

১৫৯. ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, ৭/৪১৯।

১৬০. বুখারী, হাদীস নং ৭৮৩।

১৬১. ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, ৩/১৬৪।

www.waytojannah.com

ফিকাহ শাস্ত্রবিদ কি-না। তিনি ফিকাহ শাস্ত্রবিদ হলে গ্রহণ করা যাবে অন্যথায় নয়। শর্তের এই মতপার্থক্যের ফলে একই সূত্রে বর্ণিত হাদীস একজনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যা অপরজনের দৃষ্টিতে বর্জনীয় বলে প্রমাণিত হবে। ফলে দ্বিতীয় জন বাধ্য হয়ে এ মাস'আলার সমাধানে অন্যান্য যুক্তির আশ্রয় নিবেন। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হবে মতের ভিন্নতা।

'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে হানাফি আলিমগণ যে শর্তসমূহ আরোপ করেছেন এবং যে কারণে ফিকহী মাসআলায় মতভেদ হয়েছে, তা হচ্ছে :

- বর্ণনাকারী তার বর্ণনার বিপরীত আমল করতে পারবে না। যদি তা করে তবে তার আমলকে প্রাধান্য দিতে হবে, বর্ণনাকে নয়। এটি হানাফী ফুকাহাদের মত। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মত হচ্ছে যে, সে কি করল সেটা বড় কথা নয়; বরং সে কি বর্ণনা করল সেটা বড় কথা। তার বর্ণনা তার আমলের উপর প্রাধান্য পাবে। এ বিষয়ে মতভেদ অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে মতানৈক্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। যেমন, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে সেটাকে সাতবার ধৌত করতে হবে। কারণ, হাদীসে এ রকম এসেছে। কিন্তু হানাফীদের নিকট তিনবার ধুইলেই চলবে; কারণ, বর্ণনাকারী সাহাবী 'সাত বার ধোয়া' এর বিপরীত আমল করেছেন। অনুরূপভাবে ওলীবিহীন বিয়ের ব্যাপারেও। যে হাদীসে ওলী বা অভিভাবকবিহীন বিয়ের ব্যাপারে বিয়ের ব্যাপারে 'বাতিল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজেই অভিভাবকবিহীন বিয়ের কাজ সম্পাদন করেছিলেন।

- 'খবরে ওয়াহিদ' কিয়াসের বিপরীত হলে কি করা যাবে? হানাফী আলিমদের নিকট 'খবরে ওয়াহিদ' যদি স্পষ্ট কিয়াসের বিপরীত হয় তবে সেখানে কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়া হবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল ইমামের নিকট খবরে ওয়াহিদ যদি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় তবে সেখানে কিয়াসের কোন গুরুত্ব নেই। সুতরাং এর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে বহু মাসআলায় মতভেদ হয়েছে। যেমন, 'মুসাররাত' বা গরু বা ছাগলের দুধ না দোহানোর পর সেটাকে দুধ বেশি দেখিয়ে বিক্রি করার পর সেটা ফিরিয়ে দেয়ার মাসআলা। হাদীসে বলা হয়েছে যে, ক্রেতা ইচ্ছে করলে সেটা রাখবে, নতুবা সেটাকে ফেরত দিবে, তবে (যে দুধ দোহানো হয়েছে তার বিনিময় হিসেবে) তার সাথে এক সা' খেজুরও দিয়ে দেবে। হানাফী আলিমগণ এ হাদীসটিকে স্পষ্ট কিয়াস বা (মূলনীতি বর্ণিত) হাদীসনির্ভর কিয়াসের পরিপন্থী মনে করে তার উপর আমল করেন না। তাঁরা বলেন, তিনটি কারণে এখানে এ হাদীসটি গ্রহণ করা যায় না। এক. কোন বস্তুর বিনিময় দিতে হলে অনুরূপ বস্তুই দিতে হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা যারা ইহরাম অবস্থায় শিকার করবে তাদেরকে সেটার কাফফারা কি

www.waytojannah.com

দিতে হবে তা বর্ণনা করে বলেন, فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به فوا عدل منكم "তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক।"[১৬২] দুধ যেহেতু এমন বস্তু তার অনুরূপ পাওয়া সম্ভব, সুতরাং কিয়াসের কথা হচ্ছে যে, তাকে অনুরূপ দুধই ফেরত দিতে হবে। দুই. কোন বস্তুর দায়িত্ব অনুসারে উপকৃত হওয়া যায়। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, الخراج بالضمان বা দায়িত্ব অনুপাতে লাভালাভ অর্জিত হবে।"[১৬৩] যেহেতু একটি চুক্তির বিনিময়ে সে দুধ লাভ করেছে সুতরাং দুধটুকু ক্রেতার প্রাপ্য। সুতরাং তার বিনিময় দেয়ার প্রশ্নই আসে না। তিন. দুধের বিনিময়ে খেজুর দেয়া হলে সেটার পরিমাণ নির্ধারিত না হয়েই দেয়া হবে। এটা মেনে নেয়া যায় না। সুতরাং কুরআন-হাদীস থেকে উত্থিত সরাসরি কিয়াসের বিপরীত হয়ে যায় বিধায় এখানে 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণযোগ্য হবে না।

● 'খবরে ওয়াহিদ' এমন পর্যায়ের যদি হয় যে সেটা (فيما تعم به البلوى) সাধারণত সবারই প্রয়োজন হয় তারপরও মাত্র দু'একজনই বর্ণনা করে থাকে। এমতাবস্থায় এ জাতীয় 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণ করা হবে না। যেমন, কেউ তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে কি না? এ মাসআলায় একটি হাদীস এসেছে যে, من مس ذكره فليتوضأ "কেউ তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু করতে হবে।"[১৬৪] হানাফী আলিমগণ এ হাদীসটি এ জন্য গ্রহণ করেন নি যে, যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার মাসআলাটি অহরহ ঘটছে। অথচ এ মাসআলাটি বর্ণনা করল একজন মহিলা। আর কেউ এ সম্পর্কে কিছু বলল না। সুতরাং তা গ্রহণ করা গেল না। বিশেষ করে এ ব্যাপারে আরও একটি হাদীস এসেছে, সেখানে এর বিপরীত বলা হয়েছে, وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك "এটা তো তোমার শরীরের একটি গোস্তের টুকরা বা অংশ মাত্র।"[১৬৫] পক্ষান্তরে অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণ এ ধরনের কোন শর্ত আরোপ করেননি বিধায় তাদের নিকট হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বোঝা গেল যে, অহরহ ঘটে এমন ব্যাপারে 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণ করা হবে কি হবে না এ ব্যাপারে মতভেদ ফিকহী মাসআলায় মতভেদে বিরাট প্রভাব ফেলে থাকে।

● 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা 'যিয়াদাহ আলান নাস' (মূল দলীলে কোন কিছু বর্ধিতকরণ) হচ্ছে কি না? যদি হয় তবে তা নাসখ হবে কি না? আর যদি নাসখ হয় তবে খবরে

১৬২. সূরা আল-মায়িদাহ, ৯৫।

১৬৩. আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৫০৮।

১৬৪. আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮১।

১৬৫. সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৬৫।

www.waytojannah.com

Contents

ওয়াহিদ দ্বারা কি সে নাসখ করা যাবে কিনা? এ মাসআলায় মতভেদ অনেক মাসআলাতেই হানাফী ও অন্যান্য ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদের জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ওযুতে নিয়্যতের মাসআলা। পবিত্র কুরআনে ওযুর ফরয চারটি বলা হয়েছে। এখন যদি হাদীসের ভিত্তিতে নিয়্যত বর্ধিত করা হয়, তবে তা কি নাসখ হবে? আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কি নাসখ করা যাবে ?[১৬৬] এ মাসআলায় হানাফীদের নিকট এটা 'যিয়াদাহ আলান নাস' বা মূল দলীলে বর্ধিতকরণ, আর প্রত্যেক বর্ধিতকরণই নাসখ বা রহিতকরণের হুকুম রাখে। সুতরাং যেহেতু খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের বিধান মানসূখ হতে পারে না, তাই নিয়্যতের শর্ত যোগ করা যাবে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামের নিকট এটাকে 'যিয়াদাহ আলান নাস' বলা হবে না, বরং কুরআন ও সুন্নাহ একে অপরের পরিপূরক ও তাফসীর। আর তাফসীরের মাধ্যমে কোন কিছু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের দ্বারা বাড়িয়ে দিতেই পারেন। আর যদি সেটাকে 'যিয়াদাহ আলান নাস' বলাও হয় তবে খবরে ওয়াহিদ যদি শুদ্ধ হয়, তখন খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সে যিয়াদাহ বা বর্ধিতকরণ জায়েয। আর এটাকে নাসখ বলার কোন কারণ নেই। সুতরাং আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে, এ একটি মূলনীতিই অনেক মাসআলাতে ফিকহী মতভেদের জন্ম দিয়েছে।

৮. বর্ণনাকারী কর্তৃক হাদীস বিস্মৃত হয়ে যাওয়া ও ফিকহী মতভেদে এর প্রভাব

অর্থাৎ মুজতাহিদের কোন মাসআলা সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশ জানার পর তাঁর স্মৃতিপট থেকে সে হাদীসটি বিস্মৃত হয়ে যায়। ফলে তিনি এ মাসআলার জবাবে হাদীসের নির্দেশ না পেয়ে অন্যান্য যুক্তির নিরিখে কিয়াস করতে বাধ্য হন। আর যেহেতু হাদীসটি তার মোটেই স্মরণে ছিল না, কাজেই এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে তিনি অপারগ এবং ক্ষমার যোগ্য।

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন فعل/عمل 'আমল' এর সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে মতপার্থক্য। আর ফিকহী মতভেদে এর প্রভাব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য ও শিক্ষা যেমন শরী'আতের দলীলরূপে বিবেচিত তদ্রূপ তাঁর আমলও শরীয়তের দলীলরূপে বিবেচিত। কাজেই সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কথা থেকে যেমন দলীল গ্রহণ করতেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যেত না যে, তাঁর এ আমলটি সুন্নত, নফল বা ওয়াজিব

---

১৬৬ ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/৩০।

www.waytojannah.com

Contents

পর্যায়ের ছিল। নাকি এ আমলটি তার নিতান্ত অভ্যাসগত ছিল, যার সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। তখন সাহাবায়ে কিরাম আনুষঙ্গিক অন্যান্য যুক্তির নিরিখে তা সাব্যস্ত করতেন যাতে বিষয়টির প্রত্যক্ষদর্শীদের মাঝেও দেখা দিত মতপার্থক্য। ফলে পরবর্তী যুগের ইমামগণও একমত হতে সক্ষম হননি। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দান থেকে ফেরার পথে 'আবতাহ' নামক স্থানে অবতরণ করেন। আবূ হুরায়রা ও ইব্‌নে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মন্তব্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অবতরণ ইবাদত হিসেবে ছিল। কাজেই এখানে অবতরণ করা হজ্জের সুন্নাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম মন্তব্য করেন যে, তাঁর এ অবতরণ ঘটনাক্রমে ঘটেছিল। কাজেই এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবেই একই ঘটনা থেকে সাহাবা ও ফুকাহাদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

তিন. ফকীহদের মতভেদের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কারণসমূহ

যেসব ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে তন্মধ্যে বেশ কিছু কারণ এমনও রয়েছে, যার সম্পর্ক কুরআন মাজীদে ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে এ উভয়টির সঙ্গে। বস্তুত কুরআন ও হাদীসই ইসলামী শারী'আতের মূল উৎস। উভয়েরই ভাষা আরবী। আরবী ভাষার ব্যবহারিক রীতি-নীতি উভয়েরই মধ্যে বিদ্যমান। সেসব রীতি-নীতির বিচার-বিশ্লেষণ এমন কোন বিষয় নয়। যা অবিসংবাদিতভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে। খোদ আরবী ভাষাভাষী পণ্ডিতদের মধ্যে সে সম্পর্কে বহু বিতর্ক রয়েছে। বিতর্ক নানা আঙ্গিকে। শব্দের ধাতু নির্ণয় এবং সে হিসেবে অর্থ নিরূপণ, শব্দ যদি একাধিক অর্থবোধক হয়, সে ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা, এরকমের আরও বহু বিতর্ক রয়েছে, যা তৈরি করেছে নানামুখী মতভেদ। ফুকাহায়ে কিরাম যখন কোন আয়াত বা হাদীসের ভিত্তিতে ফিকহী মাসাইল সম্পর্কে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন তাকে আয়াত ও হাদীসের সকল দিকই গবেষণার অধীনে আনতে হয়, ফলে তাঁদের মধ্যে মতভেদ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ফিকহী মতবিরোধের এ এক বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্র। আমরা নিম্নে মৌলিক কতকগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, যদ্দারা অনুমান করা যাবে যে, ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদে এসব বিষয়ের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী।

১. কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে মতপার্থক্য

অনেক সময় হাদীসে ব্যবহৃত বাক্য সহজবোধ্য না হওয়ায় সবার পক্ষে হাদীসের সঠিক অর্থ বোঝা সম্ভব হয়নি। কেউ সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, কেউ তার

www.waytojannah.com

Contents

বিপরীত বুঝেছেন, যার বিভিন্ন কারণ হতে পারে, যেমন, হাদীসে বিরল ব্যবহৃত কোন শব্দ রয়েছে। অথবা, কোন শব্দ হাদীসে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মুজতাহিদ ইমামের এলাকাতে বা তার পরিভাষায় তা ভিন্ন অর্থে প্রচলিত রয়েছে। (আর একই শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আমাদের বাংলা ভাষায়ও অনেক রয়েছে) কাজেই, তিনি নিজ এলাকার প্রচলিত অর্থেই ধরে নিয়েছেন। ফলে যিনি সঠিক অর্থের সন্ধান নিতে সক্ষম হয়েছেন তার সাথে এ ইমামের মতের অমিল হয়েছে। যেমন, خمر যার অর্থ শুধু 'আঙ্গুরের পাকানো রস'। এ অর্থের ভিত্তিতে অনেকে কুরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধ خمر বলতে আঙ্গুরের পাকানো রসকেই বুঝেছেন। অথচ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, خمر বলতে মস্তিষ্ক আচ্ছন্নকারী প্রত্যেক দ্রব্যকেই বোঝানো হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 'মাতলামী আনয়ন করে এমন প্রত্যেক বস্তুকেই 'খামর' বলা হয়। আর মাতলামী আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম।'[১৬৭] এ ছাড়া আরও বহু বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ মদ শুধু আঙ্গুরের রসেই সীমিত নয়।

২. কুরআন ও সুন্নায় ব্যবহৃত অব্যয়-এর অর্থ সম্পর্কে মতভেদ এবং ফিকহী মতবিরোধে তাঁর প্রভাব

কুরআন ও সুন্নায় সাধারণ শব্দের পাশাপাশি কিছু অব্যয়ও ব্যবহৃত হয়েছে। এ অব্যয়গুলোর রয়েছে বিভিন্ন অর্থ। অবস্থা ও স্থানভেদে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে থাকে। সেগুলো কোথায় কি অর্থ হবে এ বিষয়টি নির্ধারণ করতে গিয়ে ফুকাহাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। যেমন,

১. 'وَ' (ওয়াও) একটি সংযোজক অব্যয় (حرف العطف)। এর দ্বারা একটি শব্দকে অন্য শব্দের সঙ্গে বা একটি বাক্যকে অন্য বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ওযুতে মুখমন্ডল ধৌত করা, কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা, মাথা মাসেহ করা ও পা ধৌত করা ফরয। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে।"[১৬৮]

১৬৭. মুসলিম, হাদীস নং ২০০৩।

১৬৮. সূরা আল-মায়িদাহ, ৬।

www.waytojannah.com

আয়াতে উপর্যুক্ত চারটি কর্মকে 'و' অব্যয়ের মাধ্যমে একত্র করা হয়েছে। এ চারটি কর্ম যে ফরয তাতে কোন মতভেদ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে এ চারটি কর্ম আয়াতে যেমন বিন্যস্ত হয়েছে তেমনি ধারাবাহিকভাবে করাই ফরয? এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহেমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ প্রমুখ বলেন, ধারাবাহিকভাবে করতে হবে এমন নয়। ব্যতিক্রম করলেও ওযু হয়ে যাবে। কেননা আয়াতে ধারাবাহিকতা ফরয হওয়ার প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই। কেবল এ চারটি কার্য করার আদেশ করা হয়েছে। এবং 'و' অব্যয়ের মাধ্যমে সবগুলোকে আদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অব্যয়টি যেহেতু ধারাবাহিকতা বোঝায় না, তাই আদেশের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। হাঁ, শব্দ বিন্যাসে যেটা প্রথমে স্থান পেয়েছে কার্যেও সেটা অগ্রগণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় বৈ কি। সে হিসেবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উত্তম ও সুন্নাত হবে।

অপর দিকে ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ ও আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ-এর মতে ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরয। তাঁরা কূফা কেন্দ্রিক নাহু শাস্ত্রবিদদের মত অনুযায়ী বলেন, 'و' যেহেতু কেবল দু'টো বিষয়কে একত্রই করে না, বরং ধারাবাহিকতাও বোঝায়, সেহেতু ধারাবাহিকতাও আদেশের অন্তর্ভুক্ত। যেন বলা হয়েছে, তোমরা ওযুতে এ কার্যসমূহ কর এবং ধারাবাহিকভাবে কর।

২. إِلَى এটি একটি সীমা নির্দেশক অব্যয়। অনেক সময় ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, এর পরের অংশটি পূর্বের অন্তর্ভুক্ত যেমন : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ কুরআন পড়েছি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত" অর্থাৎ শেষটাও পড়ার অন্তর্ভুক্ত। কখনও ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় শেষটা শুরুর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ, وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাকে অবকাশ দেওয়া হবে সচ্ছলতা পর্যন্ত।"[১৬৯] এ স্থলে সচ্ছলতাটা অবকাশের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ ঋণগ্রহিতা সচ্ছল হয়ে গেলে তাকে আর অবকাশ দেয়া কর্তব্য নয়। প্রশ্ন হচ্ছে যদি কোথাও ইশারা-ইঙ্গিত না থাকে তবে সেখানে إِلَى এর পরের অংশটি পূর্বের অন্তর্ভুক্ত হবে না বহির্ভুক্ত? এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। কারও মতে সেখানে إِلَى তার পরের অংশটিকে পূর্বের অন্তর্ভুক্ত করে, আবার কারও মতে অন্তর্ভুক্ত করে না। এর প্রভাব পড়েছে ফিকহী মাস'আলায়ও। যেমন ওযুতে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া ফরয। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, কনুইসহ ধুইতে হবে কিনা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে : فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

১৬৯. সূরা আল-বাকারাহ, ২৮০।

www.waytojannah.com

Contents

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ "ধৌত কর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত।"[১৭০] এ আয়াতে اِلٰى অব্যয় দ্বারা হাত ধোয়ার সীমা নির্দেশ করা হয়েছে কনুই। যারা বলেন, اِلٰى এর পরের অংশ পূর্বের অংশের মধ্যে দাখিল হয় না, তাঁদের মতে কনুই ধোয়া ফরয নয়। ইমাম তাবারী এবং যাহেরী ও মালিকী মাযহাবের কোন কোন ফকীহ্ এই মত পোষণ করেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরাম কনুইসহ হাত ধৌত করাকে ফরয বলেন।

৩. কুরআন ও হাদীসের মর্মোদ্ধারে পার্থক্য এবং ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

এ পার্থক্যের কারণ দু'টি : মনীষা ও চিন্তাশক্তির প্রভেদ এবং হাদীসের শব্দে একাধিক অর্থের অবকাশ। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের চিন্তাশক্তি, মনন ও মনীষা বৈচিত্র্যময়। অতি সাধারণ বোধ-বুদ্ধি হতে নিয়ে হতবুদ্ধিকর বুদ্ধিমত্তা পর্যন্ত চিন্তা-চেতনার যে কত রকমের স্তর আছে এক কল্পনার স্রষ্টা ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে এটা নিশ্চিত সত্য যে, রাসূল ও সাহাবীগণের পরে ফুকাহাগণ ছিলেন চিন্তাজগতে তাঁদের উত্তরাধিকারী।

মনীষার প্রখরতা স্রষ্টার দান তো বটেই, তবে ব্যক্তিগত অনুশীলন, দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ, নানা রকমের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, বিদগ্ধজনদের সংশ্রব প্রভৃতি বিষয়ে তাতে আরও মাত্রাযোগ করে বৈচিত্র্য আনয়ন করে। ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে ঘটেছিল এসব বিষয়ের অপূর্ব সমাবেশ। ফলে তাঁরা যে কতটা বিস্তৃত সুগভীর ও শানিত চিন্তা-বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তা অনুমান করাও কঠিন। এই বিস্ময়কর মনীষাতেও তাঁরা যে সমস্তরের ছিলেন, তা নয়। বরং বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য তাঁদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। এরূপ অসাধারণ প্রতিভার সামনে যখন একাধিক অর্থবোধক কোন হাদীস এসে পৌঁছত, তখন প্রত্যেকে আপন-আপন জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে তা পর্যালোচনা করতেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। এ ক্ষেত্রে সকলের সিদ্ধান্ত সবসময়ই এক রকম হয়েছে তা নয়। কোন ফকীহ্ কোন এক অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তো অপর ফকীহের দৃষ্টিতে ভিন্ন অর্থই অগ্রাধিকার পেয়েছে। ফলে সে হাদীসের সঙ্গে যে মাস'আলায় সম্পর্ক, তাতে মতভেদ দেখা দিয়েছে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا "ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে-যাবত না তারা বিচ্ছিন্ন হয়।"[১৭১]

---

১৭০. সূরা আল-মায়িদাহ, ৬।

১৭১. বুখারী, হাদীস নং ২১১৬, মুসলিম, হাদীস নং, ৩৮৮৬।

www.waytojannah.com

এ হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ تفرق বা 'বিচ্ছিন্ন হওয়া' দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। মতভেদের কারণ এই যে تفرق-এর দ্বারা যেমন দৈহিকভাবে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হওয়াকে বোঝায়, তেমনিভাবে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা কিংবা বিষয়বস্তুগত বিচ্ছিন্নতাও বোঝায়।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে হাদীসের অর্থ হয় ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে তথা বেচাকেনার স্থানে একত্রে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, তারা চাইলে তাদের বেচাকেনার চুক্তিটি বহাল রাখবে এবং চাইলে বাতিল করবে। যদি কোনও একজন মজলিস ত্যাগ করে এবং অপর পক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের বেচাকেনাটি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এখন আর কারও তা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে না। পরিভাষায় এ জাতীয় ইখতিয়ারকে 'খিয়ারুল মজলিস' (মজলিস বলবৎ থাকাকলীন ইখতিয়ার) বলে।

দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে হাদীসের অর্থ হয়, ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ বেচাকেনার কথাবার্তায় রত থাকবে ততক্ষণ তাদের গ্রহণ প্রস্তাবের মাধ্যমে চুক্তি চূড়ান্ত বা প্রত্যাখ্যান-প্রত্যাহারের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তাঁরা 'প্রস্তাব' গ্রহণ করে ফেলে এবং অন্য কথায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাবে, এখন আর তাদের কারও তা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে না। কিংবা প্রস্তাবের পর যদি তাদের কেউ অন্য কোথাও চলে যায়, তবে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। এখন আর তা গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে না। প্রস্তাবের পর অন্য কথায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বা গ্রহণ করে না ফেলা পর্যন্ত প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং অপর পক্ষের তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার থাকে। পরিভাষায় একে 'খিয়ারুল কবুল' বলে।

ফুকাহায়ে কিরামের সামনে এ হাদীসটি পৌঁছলে এটি বিচার করে দেখেন যে, এতে تفرق দ্বারা আসলে কোন্ অর্থ বোঝানো হয়েছে? সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণের পর কেউ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এতে দৈহিক বা স্থানগত বিচ্ছিন্নতা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটি 'খিয়ারুল মাজলিস'-এর বৈধতা প্রমাণ করে। ইমাম শাফে'য়ী (র) প্রমুখ এ মতই পোষণ করেন। বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাঁরা এ মত প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অপরদিকে ইমাম আবূ হানিফা (রহ) প্রমুখ কুরআন-সুন্নাহর অপরাপর দলীলের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এ হাদীসে কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতা বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের কথা বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে তাঁদের মতে হাদীসটির সম্পর্ক 'খিয়ারুল কবুল'-এর সঙ্গে। হাদীসে 'খিয়ারুল মজলিস' বলতে কিছু নেই।[১৭২] বস্তুত 'খিয়ারুল মজলিস'-এর বৈধাবৈধ নিয়ে যে ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে, তাঁর মূল

১৭২. ফায়দুল বারী ৩/২০৯-২১২; ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ৫/৪৪১-৪৪২।

www.waytojannah.com

কারণ হচ্ছে উপরিউক্ত হাদীসটির মর্মোদ্ধার সংক্রান্ত পার্থক্য। এক এক ফকীহ্-এর এক এক রকমের অর্থ বুঝেছেন এবং সেই হিসেবে তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফয়সালা দিয়েছেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত (পবিত্র কুরআন থেকে) যেমন,

হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধার পর পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কোন কারণে যদি বাধাগ্রস্ত হয় এবং হজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করতে না পারে তবে তার জন্য হালাল হয়ে যাওয়া বা ইহরাম খুলে ফেলা জায়িয। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও তবে সহজলভ্য হাদ্‌ঈ যবাই করো।"[১৭৩] এ আয়াতে 'ইহ্সার (الإحصار) অর্থাৎ 'বাধা' এর ক্ষেত্রে ইহরাম খোলার সুযোগ রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ইহ্সার বা বাধা দ্বারা কি ধরনের বাধা বোঝানো হয়েছে? বাধা তো নানা রকম হতে পারে। শত্রুর বাধা, অসুখ-বিসুখের বাধা বা এরকম অন্য কিছু। আয়াতে কোন্‌টা বোঝানো উদ্দেশ্য? এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। কেউ বলেন, এর দ্বারা কেবলই শত্রুর পক্ষ হতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। কারও মতে অসুখ-বিসুখের বাধাও এর অন্তর্ভুক্ত। এ মতভেদের কারণে 'ইহ্সার' শব্দটির ব্যবহারিক অর্থগত মতবিরোধ। কিসাঈ, আবূ উবায়দাহ, মুবাররাদ প্রমুখ বলেন, ইহ্সার (الإحصار) অর্থ রোগের কারণে বাধাগ্রস্ত হওয়া কিংবা পথ খরচা ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে বাধাগ্রস্ত হওয়া। আর শত্রুর পক্ষ হতে বাধাগ্রস্ত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় আল হাসার বা 'الحصر'। যেমন বলা হয়, أحصره المرض وحصره العدو পক্ষান্তরে আল-ফাররা রাহেমাহুল্লাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, 'ইহ্সার' ও 'হাসর' উভয়টিই শত্রু ও রোগ উভয় বাধার কারণে বাধাপ্রাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, 'ইহ্সার' শব্দটি কেবল শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্তি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইবন রুশদ রাহেমাহুল্লাহ এ মতের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেন যে, কারও উপর কার্য সম্পন্ন করার অর্থে فعل পরিমাপের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। আর সেই কার্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাউকে তার সম্মুখীন করার অর্থে ব্যবহৃত হয় أفعل পরিমাপের ক্রিয়া। যেমন قتله (তাকে হত্যা করেছে) অর্থাৎ হত্যার কাজটি তার উপর সম্পন্ন করেছে। আর أقتله এর অর্থ তাকে হত্যার সম্মুখীন করেছে। এ হিসেবে শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থে ইহ্সার শব্দটি আর রোগের কারণে বাধাপ্রাপ্তির অর্থে 'হাসর' শব্দটি বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।[১৭৪]

শব্দটির প্রথমোক্ত অর্থ যারা গ্রহণ করে, তাঁদের মতে যেমন শত্রুর কারণে তেমনি রোগের কারণে হজ্জ বা উমরা আদায়ে সক্ষম না হলেও ইহ্সার সাব্যস্ত হয়। ইমাম

১৭৩. সূরা আল-বাকারাহ, ১৯৬।
১৭৪. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/২৫৯।

www.waytojannah.com

আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ ও মালিক রাহেমাহুল্লাহ এ মতই গ্রহণ করেন। বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও এ মত সমর্থিত। আর যারা শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন তাদের মতে রোগের কারণে 'ইহ্সার' সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে 'ইহ্সার'-এর বিধান প্রযোজ্য নয়। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ এ মতের প্রবক্তা। এর পক্ষেও দলীল প্রমাণ আছে।[১৭৫] উপরিউক্ত উদাহরণ দু'টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শব্দের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ থাকার কারণে ফিকহী মাসাইলের সমাধানেও ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

৪. শব্দের অর্থ স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বাক্যের বিন্যাসের কারণে অর্থের মধ্যে অস্পষ্টতা ও ফিকহী মাসআলায় এর প্রভাব

অর্থাৎ শব্দের অর্থ স্পষ্ট; কিন্তু বাক্যের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে এক বাক্যের শেষে বা এক বাক্যের পরে আরেক বাক্যে এমন কিছু এসেছে সেটার সম্পর্ক পূর্বের বাক্যের কোন্ অংশের সাথে হবে তা নিয়ে মতভেদ হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ . اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"যারা পবিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো ফাসিক। তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৭৬]

এখানে প্রথম আয়াতে ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারীর প্রতি তিনটি বিধান দেয়া হয়েছে, এক. আশি বেত্রাঘাত, দুই. তার সাক্ষীর অগ্রহণযোগ্যতা, তিন. সে একজন ফাসিক। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা তাওবাহ্ করবে তাদেরকে 'ইস্তেসনা' বা তাদেরকে পূর্ব নির্দেশ থেকে আলাদা ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে আলিমগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, এ 'আলাদা ঘোষণা' কি পূর্ববর্তী তিনটি বিধানকেই সমভাবে শামিল করবে? যদি তাই হয় তবে যারাই তাওবাহ্ করবে তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত করা যাবে না, তারা সাক্ষী হতে পারবে, তাদেরকে ফাসিক বলা যাবে না। এভাবে তারা আবার ভাল লোক হিসেবে পরিগণিত হবে। ইমাম শা'বী এ মতের প্রবক্তা।

১৭৫. প্রাগুক্ত, ১/২৫৯।
১৭৬. সূরা আন-নূর, ৪-৫।

www.waytojannah.com

কিন্তু অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম-এর মতে এই ইস্তেসনা বা 'আলাদা ঘোষণা' শাস্তির থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়। কারণ, ব্যভিচারের অপবাদ বান্দার হক্। আর বান্দার হক থেকে তাওবাহ্ করলেই নিস্তার পাওয়া যায় না।

তারপর আলিমদের মধ্যে আবার মতভেদ হয়েছে যে, তা হলো এই ইস্তেসনা বা 'আলাদা ঘোষণা' বাকী দু'টি বিধানের উভয়টির জন্য নাকি শুধু শেষটির জন্য?

হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে এটি শুধু শেষ বিধানটির প্রতি প্রযোজ্য হবে। তারপর যদি তাওবাহ্ করে তবে সে ফিস্ক-এর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। অর্থাৎ যদি ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তি তাওবাহ্ করে তবে তাকে ফাসিক বলা যাবে না। কিন্তু অপরাপর দু'টি বিধান তার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য হবে। এক. তার শাস্তি অবধারিত। দুই. তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করার ব্যাপারটিকে স্থায়ী ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا। সুতরাং সে ভাল লোক হয়ে গেলেও তার সাক্ষ্য আর কোনদিন গ্রহণ করা হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদ ইবন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে ইস্তেসনা (আলাদা ঘোষণা) পরবর্তী দু'টি বিধানকেই শামিল করবে। সুতরাং সেই ব্যক্তি যদি তাওবাহ করে তবে তার উপর প্রথম বিধানটিই (অপবাদের শাস্তি) শুধু প্রযোজ্য হবে। অপরাপর দুটি বিধান বলবৎ হবে না। অর্থাৎ তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ফাসিকও বলা যাবে না।

৫. শব্দের প্রকৃত ও রূপক অর্থভিত্তিক মতভেদ ও ফিকহী মাসআলায় এর প্রভাব

ভাষাবিদদের কাছে যে শব্দ যেই অর্থের জন্য গঠিত, শব্দ যদি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয় তবে পরিভাষায় তাকে হাকীকত বলে। হাকীকত মানে প্রকৃত বা বাস্তব। অর্থাৎ সেই শব্দটি সেই অর্থের জন্য হাকীকত বা প্রকৃত অর্থ। পক্ষান্তরে যদি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিশেষ কোন সূত্রে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই অর্থকে শব্দটির জন্য মাজায বা রূপক অর্থ বলে এবং শব্দটিকেও সেই অর্থের জন্য রূপক বলে।

যে কোন ভাষা ও সাহিত্যে প্রকৃত অর্থেই শব্দের ব্যবহার একটি সাধারণ রীতি, বরং রূপক অর্থ তো সাহিত্যের এক অপরিহার্য অনুমান। কুরআন-সুন্নাহ্ও তার ব্যতিক্রম নয়। এমন আয়াত ও হাদীসের সংখ্যা খুব একটা কম নয়, যাতে শব্দের প্রকৃত নয়, বরং রূপক অর্থই উদ্দেশ্য।

যেসব আয়াত বা হাদীসে রূপক অর্থের অবকাশ আছে সে ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন তাতে কি

www.waytojannah.com

প্রকৃত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য, না রূপক অর্থ? দলীলের এক শব্দকে এক ফকীহ্ প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেন তো অন্য ফকীহ্ গ্রহণ করেন রূপক অর্থে। এবং সেক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষেই যুক্তি থাকে। আর আপন আপন যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রত্যেকেরই এমন আস্থা জমে যায় যে, তা থেকে সরে যাওয়াকে তিনি বিচ্যুতি জ্ঞান করেন। ফলে প্রত্যেকে আপন মতে অনড় থাকেন এবং বিতর্ক অমীমাংসিত থেকে যায়। যেমন এক হাদীসে আছে : أيما امرأة نكحت بغير إذن ولها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل

"কোন নারী তার ওলী (অভিভাবক)-এর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।"[১৭৭]

দৃশ্যত এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় ওলীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে তার নিজ বিবাহ সম্পাদন বৈধ নয়। এমন করলে সে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম শাফে'য়ী ও মালিক রাহেমাহুমাল্লাহ প্রমুখ ফুকাহায়ে কিরাম এ মতই পোষণ করেন। তাঁরা বাতিল শব্দটিকে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেছেন, অপর দিকে দেখা যায় কুরআন মাজীদে বিবাহ সম্পন্ন করার কাজকে নারীর সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

"তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, এরপর তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।"[১৭৮]

আরও বলা হয়েছে, فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ "অতঃপর যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দেয় তবে সে জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন না করে।"[১৭৯]

এসব আয়াত স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, নারী নিজেই তার বিবাহ সম্পন্ন করার অধিকার রাখে। অনুরূপভাবে কোন কোন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওলীর চেয়ে কোন কোন নারীর নিজেকেই এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, الثيب أحق بنفسها من وليها। "সাবালিকা/একবার বিবাহ হয়েছে এমন

---

১৭৭. আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৮৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১১০২; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৮৭৯।

১৭৮. সূরা আল-বাকারাহ, ২৩২।

১৭৯. সূরা আল-বাকারাহ, ২৩০।

www.waytojannah.com

মহিলার উপর ওলীর চেয়ে নিজেরই অধিকার বেশি।"[১৮০] উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শা'বী, ইমাম যুহরী রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখের মত হচ্ছে যে, সাবালিকা নারী নিজেই নিজের বিবাহ সম্পন্ন করার অধিকার রাখে। ওলীর অনুমতি বিবাহ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। যে হাদীস ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহকে বাতিল বলা হয়েছে, তাঁরা তার বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি জবাব হচ্ছে এই যে, হাদীস বাতিল শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এরূপ বিবাহের পরিণতি হচ্ছে বাতিল হয়ে যাওয়া। কেননা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকার কারণে বিবাহের ব্যাপারে পুরুষের সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত সঠিক হয়। ফলে সে বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিকে থাকে। পক্ষান্তরে নারীর কর্মক্ষেত্র ভিন্ন এবং তার চরিত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় এই ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তে দূরদর্শিতা থাকে না। ফলে সে বিবাহ টিকে না। হাদীসে বাতিল শব্দ দ্বারা সেই পরিণতির ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথা বোঝানো হয়নি যে, ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহই সহীহ্ নয়।

অনুরূপভাবে, কুরআন মাজীদে ওযু ভঙ্গের একটি কারণ বলা হয়েছে أو لمستم النساء। "অথবা যদি স্ত্রীকে স্পর্শ কর।"[১৮১] এতে الملامسة। (স্পর্শ করা)-এর প্রকৃত অর্থ হাতে ছোঁয়া আর রূপক অর্থ সঙ্গম করা। শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ এর মতে এখানে স্ত্রীকে হাতে স্পর্শ করা বা সহবাস করা উভয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উভয় কারণেই ওযু নষ্ট হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী الملامسة। এর উভয় অর্থ নয়, বরং যে কোন এক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। তাদের নিকট এখানে সঙ্গম করার অর্থই গ্রহণ করা হবে।

তদ্রূপ এক হাদীসে এসেছে, আদী ইবন হাতেম বলেন, যখন আল্লাহ পাক হুকুম করলেন : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ "আর তোমরা (রোযার রাতে) খাও এবং পান কর সাদা সূতা (সুবহি সাদিক) কালো সূতা (সুবহি কাযিব) থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত।"[১৮২] তখন আমি সাদা ও কালো দু' রং এর দু'গাছি সুতা নিয়ে বালিশের নিচে রেখে দিলাম। যতক্ষণ না ভোরের আলোতে সুতা দু'টির পার্থক্য পরিলক্ষিত হল, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিনি। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ কাণ্ড শোনালে তিনি বললেন, إنما وسادك

১৮০. মুসলিম, হাদীস নং ৩৪৬১; আবূ দাউদ, ২০৯৮; তিরমিযী, ১১০৮।

১৮১. সূরা আল-মায়িদাহ, ৬।

১৮২. সূরা আল-বাকারাহ, ১৮৭।

www.waytojannah.com

إذا لعريض 'তোমার বালিশটি তো তাহলে বেশ বড়সড়।' সংশ্লিষ্ট আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, রাতের আঁধার হতে ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়া।[১৮৩]

৬. আম ও খাস (সাধারণ ও বিশেষ) শব্দের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের গৃহীত নীতি ও ফিকহী ইখতিলাফে তার প্রভাব

আরবী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে কিছু শব্দ আছে এমন, যা একই সঙ্গে অনেক কিছু বোঝায়। এরূপ শব্দকে عام (সাধারণ) বলে। যেমন حيوان (জীব) المشرك (মুশরিক) من (যে, যিনি) ইত্যাদি। আবার কিছু আছে এমন সুনির্দিষ্টভাবে একটি একককে বোঝায়, যেমন إنسان (একটি মানুষ), رجل (একটি লোক) زيد (যায়দ)।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উভয় রকমের শব্দ এর ভেতরে রয়েছে। ফুকাহায়ে কিরাম যখন কুরআন-সুন্নাহের ভিত্তিতে মাসাইলের সমাধানে রত হন এবং কোন কার্যের কী হুকুম তা নিরূপণে মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁরা প্রথমে এই উভয়বিধ শব্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন যে, এগুলো কি তার অর্থ অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, না সন্দেহযুক্তভাবে। যদি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, সেক্ষেত্রে কি কোনরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে, না সে পথও রুদ্ধ থাকে? এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের গবেষণা একই বিন্দুতে গিয়ে সমাপ্ত হয়নি বরং তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটাও ফিকহী মতভেদের অন্যতম কারণে পরিণত হয়েছে।

ক. খাস (বিশেষ) শব্দের হুকুম সম্পর্কে মতভেদ এবং ফিকহী ইখতিলাফে তার প্রভাব

ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, খাস তার অর্থকে অকাট্যভাবে বোঝায়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, খাস শব্দের মধ্যে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে কি নেই। হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে خاص নিজেই পরিস্ফুট। কাজেই তার ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহর মতে خاص ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। এই মতভেদের ফলে কোনও কোনও ফিকহী মাসাইলেও মতপার্থক্য হয়ে গেছে। যেমন, সালাতে রুকু ও সিজদা ফরয। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা রুকু কর এবং সিজদা কর।"[১৮৪] রুকু ও সিজদা শব্দ দু'টি খাস সুনির্দিষ্ট এক অর্থ বোঝায়। রুকু' অর্থ ঝুঁকে পড়া এবং সিজদা অর্থ মাটিতে কপাল স্থাপন করা। আয়াতের আদেশ

---

১৮৩. বুখারী, হাদীস নং ৪৫০৯; মুসলিম, হাদীস নং ১০৯০।

১৮৪. সূরা আল-হজ্জ: ৭৭।

www.waytojannah.com

অনুযায়ী সালাতের এ দু'টি কার্য ফরয। হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে خـــاص যেহেতু তার অর্থকে অকাট্যভাবে বোঝায় এবং এর ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, সেহেতু তাদের মতে ফরয হিসেবে এ দু'টি কাজের সঙ্গে অন্য কিছুকে যুক্ত করা যাবে না।

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহর মতে خاص যেহেতু ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, তাই তিনি আলোচ্য আয়াতে আদিষ্ট রুকু' সিজদার ব্যাখ্যায় একটি হাদীস পেশ করেন এবং তার ভিত্তিতে তা'দীলুল-আরকান অর্থাৎ রুকু' ও সিজদায় স্থির হয়ে ক্ষণিক অবস্থান, কাওমাহ্ অর্থাৎ রুকু'র পর সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং জালসা অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে ক্ষণিক বসাকেও ফরয বলেন। হাদীসটি হচ্ছে, এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে সালাত আদায় করল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলো এবং তাঁকে সালাম দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবাব দিয়ে তাকে বললেন, তুমি আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি। লোকটি গিয়ে আবার সালাত আদায় করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলো। তিনি তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনবার। শেষে লোকটি বলল, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তো এর চেয়ে ভাল পারি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : "তুমি যখন সালাতের প্রস্তুতি নেবে তখন প্রথমে পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন কারীম থেকে তুমি যা পার পড়বে। তারপর রুকু করবে এবং রুকুতে স্থির হয়ে অবস্থান করবে। তারপর রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদা করবে এবং সিজদায় স্থির হয়ে অবস্থান করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসবে... ।[১৮৫]

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ-এর কথা হচ্ছে যে, সেই সাহাবী তো রুকু' ও সিজদা করেছিলেন, তারপরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সালাত আদায় করনি। তারপর আবার তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে; রুকূ' ও সিজদা কিভাবে করতে হবে। সুতরাং কেবল মাথা ঝুঁকালে এবং মাটিতে কপাল স্থাপন করলেই রুকু'-সিজদার ফরয আদায় হয়ে যায় না, বরং সেই সঙ্গে তা'দীলূল-আরকান, কাওমাহ্ ও জালসাও ঠিকমত করতে হবে। এগুলোও ফরয।

হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম তাদের মূলনীতি অনুযায়ী এ হাদীসটিকে উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সাব্যস্ত করেন না, তবে তারা আয়াত ও হাদীস-উভয়কে আপন

১৮৫. বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭; মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৭; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৮৫৭; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৪।

www.waytojannah.com

আপন মর্যাদা দেন এবং সে হিসেবে আয়াতের নির্দেশকে ফরয এবং হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী তা'দীলূ-আরকান, কাওমা ও জালসাকে ওয়াজিব বলেন।

খ. আম (সাধারণ) শব্দের হুকুম সংক্রান্ত মতভেদ ও ফিকহী ইখতিলাফে তার প্রভাব

"আম' অর্থাৎ যে শব্দ একই সঙ্গে বহু একককে বোঝায়, তার ব্যবহার তিন রকম হতে পারে :

১. তার সঙ্গে এমন কোন আলামত-ইঙ্গিত থাকবে, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সবগুলো এককই সে শব্দের অন্তর্ভুক্ত, কোনটিও ব্যতিক্রম নয়, যেমন আল্লাহ্র বাণী : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ الاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই।"[১৮৬] বলাই বাহুল্য دَابَّةٌ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী জীব-এর সকল এককই আয়াতটি বক্তব্যের কোনও একটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

২. তার সঙ্গে এমন কোন আলামত-ইঙ্গিত থাকবে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, সকল এককই তাঁর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এককসমূহের অংশ-বিশেষের জন্য তা প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا "মানুষের মধ্যে যার যেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।"[১৮৭] এ আয়াতে الناس (মানুষ) শব্দটি عام (সাধারণ) হলেও অপরাপর দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, সকল মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা শিশু, পাগল ও অন্যান্য ওযর বিশিষ্টগণ এর ব্যতিক্রম।

৩. এমন عام যার কোনও একক ব্যতিক্রম থাকার পক্ষেও প্রমাণ নেই, সমস্ত একক শামিল থাকার পক্ষেও কোন আলামত নেই।

এ প্রকারের عام এর হুকুম কী? এরূপ عام কি তার এককসমূহকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না সন্দেহযুক্তভাবে, এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক ও শাফে'য়ী প্রমুখের মত অনুযায়ী عام তার এককসমূহকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না, বরং সন্দেহযুক্তভাবে। তাদের যুক্তি এই যে, সমস্ত عام-এর মধ্যেই এই অবকাশ থাকে যে, তার কতক একক তার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং কোনও-না-কোনও দলীল দ্বারা তা থেকে তার কতককে আলাদা রাখা হয়েছে। এই অবকাশ থাকে বলেই তো ক্ষেত্র বিশেষে كل (সকল) اجمعون (সমস্ত) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে সকল এককের মধ্যে عام-এর কার্যকারিতা বলিষ্ঠ করে তোলা হয়, যাতে কেউ এই সন্দেহ না করে যে, কোনও একক হয়ত ব্যতিক্রম আছে। যখন এই অবকাশ বের হল, তখন

১৮৬. সূরা হূদ : ৬।

১৮৭ সূরা আলে ইমরান : ৯৭।

www.waytojannah.com

Contents

আর এককসমূহের অন্তর্ভুক্তকরণে عــام-এর অকাট্যতা বাকি থাকল না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ-এর অনুসারী ফুকাহায়ে কিরাম বলেন যে, عام তার এককসমূহের অন্তর্ভুক্তি অকাট্যভাবেই প্রমাণ করে; কেননা কোন শব্দ যখন কোন অর্থের জন্য গঠন করা হয়, তখন সে অর্থ যে শব্দের জন্য স্থিরীকৃত ও সুনিশ্চিত হয়ে যায়। শব্দটি ব্যবহার করলে নিশ্চিতভাবে সে অর্থই বোঝা যায়, যাবত না অন্য অর্থের কোন দলীল পাওয়া যায়। عــام ও তো অর্থবোধক শব্দ কতকগুলো এককের জন্য গঠিত; কাজেই শব্দ ব্যবহার করলে নিশ্চিতরূপে সে এককসমূহকে বোঝাবে। কোন এককের ব্যতিক্রম থাকার সম্ভাবনা সে কেবলই সম্ভাবনা যার পক্ষে কোন দলীল নেই। আর এরূপ দলীলবিহীন সম্ভাবনা দ্বারা এর অকাট্যতা খন্ডন হতে পারে না।

عــام-এর হুকুম সংক্রান্ত উপর্যুক্ত মতভেদের ফলে প্রশ্ন ওঠে যে, দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোন হুকুমকে 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদীস বা কিয়াস দ্বারা খাস করা যাবে কি না? এবং আরও প্রশ্ন ওঠে পরস্পর বিরোধী দু'টি দলীলের একটি عــام ও অন্যটি خــاص হয়, তখন কি উভয়ের সংঘাতও স্বীকার্য নয়? উপরোক্ত মতভেদের কারণে উভয় প্রশ্নের জবাবও যে অভিন্ন হবে না—এটাই স্বাভাবিক।

গ. সন্দেহযুক্ত দলীল দ্বারা عام-এর হুকুমকে خاص করা যাবে কি?

عام-এর হুকুমকে خاص করা অর্থাৎ বিশেষ কিছু এককের মধ্যে হুকুমকে সীমাবদ্ধ করা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরাম দুই রকমের মত পোষণ করেন। মালিকী ও শাফে'য়ী ফুকাহায়ে কিরামের মতে যেহেতু সমস্ত এককের উপর عــام-এর বিস্তার অকাট্য নয় বরং সন্দেহযুক্ত, তাই তারা সন্দেহযুক্ত দলীল তথা খবরে ওয়াহিদ ও কিয়াস দ্বারা তাকে খাস করা জায়িয মনে করেন। পক্ষান্তরে হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে সন্দেহযুক্ত দলীলের দ্বারা عام-এর হুকুমকে খাস করা জায়িয নয়। কেননা কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস যেমন অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তেমনি এর-মধ্যে যা-কিছু 'আম', যেগুলো তার এককসমূহকে অকাট্যভাবে শামিল করে। আর এ পর্যায়ের দলীলকে সন্দেহমুক্ত দলীল ছাড়া খাস করা যায় না। কেননা খাস করাটা এক রকমের পরিবর্তন। আর অকাট্য বিষয়কে সন্দেহযুক্ত দলীল দ্বারা পরিবর্তনা করা অন্যায়।

এ মতভেদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বহু ফিকহী মাসাইল এর আওতায় পড়ে গেছে এবং এই মতভেদের ফলে তাতেও ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে। যেমন, পশুর গোশত হালাল হওয়ার জন্য তাকে আল্লাহ্র নামে যবাই করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيَاتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ "সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে যাতে আল্লাহর নামে উচ্চারিত হয়েছে তা আহার

www.waytojannah.com

কর।"[১৮৮] পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর নামে যবাই করা না হয় তবে সে পশুর গোশত হালাল হয় না। আল্লাহ্ বলেন : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "যাতে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়নি তাঁর কিছুই আহার করো না।"[১৮৯]

তাছাড়া যবাইকালে যদি আল্লাহ্র নাম ভুলে উচ্চারণ করা না হয় তবে সেটা ক্ষমাযোগ্য। কেননা শরী'আত বিস্মৃতির অবস্থাকে ক্ষমার চোখে দেখেছে। ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এসব বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করে তবে তার যবাই হালাল হবে কি? উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হালাল হবে না। কিন্তু এক মুরসাল হাদীসে এসেছে, ذبيحة المسلم حلال ، ذكراسم الله عليها أو لم يذكر "মুসলিমের যবাই হালাল- আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করুক আর নাই করুক।"[১৯০]

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যবাইকারী মুসলিম হলে তার যবাই সর্বাবস্থায় হালাল- এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করলেও। অপর এক হাদীসে আছে, একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু লোক আমাদের কাছে গোশ্ত নিয়ে আসে। আমরা জানি না তারা আল্লাহ্র নামে যবাহ্ করেছে কিনা। তিনি বললেন : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ "তোমরাই তাতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর এবং খাও।"[১৯১] এসব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শাফে'য়ী মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, যবাইকালে আল্লাহ্র নাম নেওয়া শর্ত নয় বরং সুন্নাত। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম না নিলেও সে যবাইকৃত পশু হালাল হবে।" তাদের মতে, আয়াতের ব্যাপকতা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের নিকট যেহেতু সমস্ত এককের উপর عام-এর বিস্তার অকাট্য নয়, তাই সন্দেহযুক্ত দলীল দ্বারা তাকে সীমাবদ্ধ করাতে কোন দোষ নেই। সুতরাং আয়াতের নির্দেশ কেবল সেইসব পশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ যা আল্লাহ্র নামে নয়, বরং দেব-দেবী ও গায়রুল্লাহ নামে যবাই করা হয়েছে।[১৯২]

হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করলে যবাই হালাল হবে না এবং সে গোশ্ত খাওয়াও বৈধ হবে না। আয়াতের নির্দেশ عام

১৮৮. সূরা আল-আন'আম : ১১৮।

১৮৯. সূরা আল-আন'আম : ১২১।

১৯০. মারাসীলে আবি দাউদ, হাদীস নং ৩৭৮।

১৯১. বুখারী, হাদীস নং ৫৫০৭।

১৯২ আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ, ৬/১০৫; শাওকানী, নাইলুল আওতার, ৮/১৪০; ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৩২৮।

www.waytojannah.com

Contents

(সাধারণ), যা তার সমস্ত একককে অকাট্যভাবে শামিল করে। কাজেই সন্দেহযুক্ত দলীল তথা হাদীস দ্বারা তাকে বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।[১৯৩]

তবে হাদীসে যে বলা হয়েছে, মুসলিমের যবাই হালাল, এমন কি আল্লাহ্‌র নাম না নিলেও, তার মানে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে ভুলে গেলে।[১৯৪] আর যে হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরাই আল্লাহ্‌র নাম নাও এবং খাও, এর ব্যাখ্যায় কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া ওয়াজিব নয়। বরং এর অর্থ তোমরা তাদের অবস্থাকে ন্যায্য ও সঠিক অবস্থার উপরই ধরে নাও এবং তোমরা খাওয়ার আগে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। কেননা এটাই তোমাদের পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার সময়। কাজেই তোমরা এতে উদাসীন থেকো না।[১৯৫]

'আম' ও 'খাস' পরস্পর বিরোধী হলে তার সংঘাত কী স্বীকার্য হবে?

'আম'-এর হুকুম সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের যে মতভেদ উপরে বর্ণিত হয়েছে, তারই ভিত্তিতে এ বিষয়েও বিতর্ক দেখা দিয়েছে যে, কোনও বিষয়ে দলীল عام দ্বারা এক হুকুম এবং خاص দ্বারা তার বিপরীত হুকুম জানা গেল তখন তাকে কি দুই দলীলের সংঘাত বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং তারপর রীতি অনুযায়ী তা নিরসনের চেষ্টা করা হবে, না কি তাকে تعارض বা সংঘাতই গণ্য করা হবে না, বরং উভয় দলীলকে আপন ক্ষেত্রে কার্যকর মনে করা হবে?

যাদের মতে عام-এর হুকুম অকাট্য নয়, অর্থাৎ তার এককসমূহকে সন্দেহাতীতভাবে শামিল করে না, অপর দিকে خاص-এর হুকুম অকাট্য, তারা এরূপ দুই দলীলকে পরস্পর বিরোধী বলে স্বীকার করেন না। তাদের মতে عام তার এককসমূহকে সন্দেহযুক্তভাবে বোঝাবে। আর যেই একক সম্পর্কে কোন خاص দলীল পাওয়া যাবে সেক্ষেত্রে خاص দলীল কার্যকর হবে। বাকি এককসমূহে عام কার্যকর থাকবে।

পক্ষান্তরে যাদের নিকট عام-এর হুকুমও অকাট্য (قطعى), তারা এরূপ দুই দলীলকে পরস্পর বিরোধী আখ্যা দেন। অতঃপর কোন্‌টি আগের ও কোন্‌টি পরের সে তারিখ জানা থাকলে পরেরটি দ্বারা প্রথমটিকে রহিত সাব্যস্ত করেন। যদি তারিখ অজ্ঞাত থাকে, তবে অপরাপর দলীল- প্রমাণের ভিত্তিতে একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নীতিগত এই পার্থক্যের কারণে বহু ফিকহী মাসাইলে ইখ্‌তিলাফের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, গাছের ফল পাকা ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে 'মুযাবানা' বলে। মুযাবানা জায়িয নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

১৯৩. মোল্লা জিউন, নূরুল আনওয়ার, পৃ.৭৪; উসূলে বাযদাবী, কাশফুল আসরারসহ, ১/২৯৬।

১৯৪. মারগিনানী, আল-হিদায়াহ, ৪/৪২০।

১৯৫. আনওয়ার শাহ কাশমিরী, ফায়দুল বারী, ৪/৩৪১।

www.waytojannah.com

التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والهلح بالصلح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى ۰

"খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব ও লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করবে সমান সমান করে নগদ নগদ, কেউ বাড়ালে বা বাড়াতে চাইলে সে অবশ্যই সুদ খেল।"[১৯৬]

এ হাদীসে সমজাতীয় দ্রব্যের বেচাকেনা গাছে থাকা অবস্থায় হোক বা তোলা অবস্থায় হোক কিংবা একটা গাছে অপরটা নিচে এবং তার পরিমাণ যাই হোক সর্বাবস্থায় বিক্রি জায়িয হওয়ার জন্য সমান সমান হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। মুযাবানার অবস্থায় সে সমতা রক্ষা হয় না। কাজেই সে বিক্রি জায়িয নয়। অপর হাদীসে স্পষ্ট করেই মুযাবানা অবৈধ করা হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুযাবানা নিষিদ্ধ করেছেন।"[১৯৭] হাদীস দ্বারাও বোঝা যায় মুযাবানা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, কোন রকমের ব্যতিক্রম নেই। অপরদিকে যায়িদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক হাদীসে আছে, ان رسول الله ﷺ ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়্যা-এর বিক্রি অনুমোদন করেছেন যে, তার পরিমাণ অনুমান করে বিক্রি করা যাবে।"[১৯৮] এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী আরিয়্যা হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক বা তার কম পরিমাণে গাছের ফলের বিনিময়ে তোলা ফল বিক্রি।[১৯৯] এ হিসাবে আরিয়্যা মুযাবানার একটি অংশ যা এই হাদীসে বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু উপরের হাদীসের ব্যাপকতা অনুযায়ী অবৈধ হয়।

এখন ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে আরিয়্যা সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে যে, এ বিক্রি কি বৈধ না অবৈধ। ইমাম শাফে'য়ী ও আহমদ প্রমুখের মত হচ্ছে যে, উভয় হাদীসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা মুযাবানার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসটির ব্যাপকতার মধ্যে আরিয়্যা শামিল থাকলেও তা সন্দেহযুক্তভাবে ছিল। আরিয়্যা বৈধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি خاص যা এর বৈধতাকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। সুতরাং উভয় হাদীস আপন আপন স্থানে কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে আরিয়্যা বৈধ এবং এর বেশি সকল পরিমাণ মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত ও অবৈধ।[২০০]

১৯৬. মুসলিম, হাদীস নং ১৫৮৮।

১৯৭. বুখারী, হাদীস নং ২১৮৬, ২৩৮১; মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩৬।

১৯৮. বুখারী, হাদীস নং ২১৮৮।

১৯৯. বুখারী, হাদীস নং ২১৯০।

২০০. শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ, ২/৯৩,৯৪।

www.waytojannah.com

হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম তো আরিয়্যাকে বিক্রয় বলেই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এটা এক প্রকারের দান। আর যদি বিক্রয় বলে ধরেও নেওয়া যায়, তখন তাদের মতে মুযাবানার নিষেধাজ্ঞা ও রিবা (সুদ) সংক্রান্ত হাদীসের সঙ্গে এর সুস্পষ্ট تعارض বা দ্বন্দ্ব রয়েছে। কেননা তাদের মতে عام ও خاص উভয়টাই সমপর্যায়ের দলীল। আর যেহেতু কোন্‌টা আগের এবং কোন্‌টা পরের সে তারিখ জানা নেই, তাই এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের নীতি অনুসরণ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে عام হাদীসটির হুকুম সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। মুযাবানা সকলের নিকটই অবৈধ। পক্ষান্তরে خاص সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আরিয়্যাকে কেউ বৈধ বলেন এবং কেই মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত করেন। কাজেই বিতর্কিতের উপর অবিতর্কিতের অগ্রাধিকার লাভ হবে। সুতরাং মুযাবানার নিষেধাজ্ঞা তাঁর সকল এককের উপরই কার্যকর থাকবে।[২০১]

৭। একাধিক অর্থবোধক শব্দ (مشترك)-এর ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের নীতি এবং ফিকহী ইখ্‌তিলাফে তার প্রভাব

আরবী ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যা একাধিক অর্থের জন্য গঠিত। পরিভাষায় তাকে مشترك বলে। বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয়-সব রকম শব্দের ভেতর এটা পাওয়া যায়, যেমন العين। এ শব্দটি, যেমন চোখের অর্থে গঠিত, তেমনি প্রস্রবণ, সত্তা প্রভৃতি অর্থের জন্যও এটি গঠন করা হয়েছে। এমনিভাবে عسعس ক্রিয়াটি 'আগমন করল ও প্রস্থান করল' উভয় অর্থেই গঠিত। من অব্যয়টি সূচনার অর্থেও গঠিত, আবার অংশ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি অর্থেও গঠিত। কুরআন মাজীদ ও পবিত্র হাদীসে এ জাতীয় বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটাও ফুকাহায়ে কিরামের মতবিরোধের এক কারণ। কেননা দুই বা ততোধিক অর্থের জন্য গঠিত শব্দ যখন কোন আয়াত বা হাদীসে পাওয়া যায়, তখন সে আয়াত বা হাদীসের দ্বারা ফিকহী মাসাইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ফকীহ্‌কে প্রথমে এই সমাধানে আসতে হবে যে, সে শব্দের কোন্ অর্থ তিনি গ্রহণ করবেন? তাকে খুঁজে দেখতে হবে কোন এক অর্থের পক্ষে আলামত ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা। যদি পাওয়া যায় তবে তো সমাধান হয়ে যায়, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এমন আলামত ইঙ্গিত দু'টো অর্থের পক্ষেই থাকতে পারে। তখন মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কেননা এক ফকীহের কাছে আলামত ইঙ্গিতের ভিত্তিতে এক অর্থ প্রাধান্য পেলেও অন্য ফকীহের দৃষ্টিতে তাঁর বিপরীত অর্থের আলামতটাই হয়ত বেশি শক্তিশালী। ফলে তিনি সে অর্থই গ্রহণ করবেন, যেমন : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ অপেক্ষায় থাকবে তিন কুরু।"[২০২] এ আয়াতের ভিত্তিতে সকল

২০১. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, ১২/১৯২।

২০২. সূরা আল-বাকারাহ, ২২৮।

www.waytojannah.com

ফকীহ্ একমত যে, তালাকের ইদ্দত তিন কুরু। কিন্তু কুরুর অর্থ নিরূপণে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারও মতে আয়াতে 'কুরু' দ্বারা রজঃকাল বোঝানো হয়েছে এবং কারও মতে পবিত্রতার কাল। এ মতভেদের কারণে আরবী ভাষায় শব্দটি উভয় অর্থেই গঠিত। উভয় অর্থের পক্ষেই শক্তিশালী দলীল আলামত-ইঙ্গিত আছে।

এই এক মাসআলার মতভেদের কারণে আরও বহু মাসআলায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। যেমন, তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত কখন শেষ হবে? যাদের মতে قُرُوْء দ্বারা হায়িয বোঝানো হয়েছে, তাদের মতে ইদ্দত শেষ হবে তালাকের পরবর্তী তিন হায়িযের মাথায়। যাঁদের মতে قُرُوْء অর্থ পবিত্রাবস্থা, তাদের মতানুসারে তৃতীয় হায়িয শুরু হওয়া মাত্রই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। কেননা এ সময় পবিত্রাবস্থার তিনটি পর্যায়ে শেষ হয়। অনুরূপভাবে, সেই স্ত্রীলোকের জন্য কখন বিবাহ বৈধ হবে? শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহর মতে তৃতীয় হায়িয শুরু হওয়া মাত্র। কেননা তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু হানাফী মতে তৃতীয় হায়িয শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য বিবাহ জায়িয নয়, যেহেতু তার আগে ইদ্দত শেষ হয় না। তদ্রূপ, তালাক যদি রাজ্'ঈ হয় এবং তৃতীয় হায়িয অবস্থায় স্বামী মারা যায় বা স্ত্রীর মৃত্যু হয় তখন একে অপরের মিরাসের হকদার হবে কি? শাফে'য়ী মতানুসারে হবে না। কেননা ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে এবং একে অপর হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু হানাফী মতানুযায়ী ইদ্দত এখনও শেষ না হওয়ায় তাদের দাম্পত্য অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। কাজেই একে অপরের উত্তরাধিকার লাভ করবে।

একাধিক অর্থবোধক কোন শব্দের সকল গ্রহণ বৈধ কি?

একাধিক অর্থবোধক مشترك শব্দের কোন অর্থের পক্ষে যদি দলীল-প্রমাণ না থাকে, ফলে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে সকল অর্থই সমপর্যায়ের হয়, তখন কি একই সময়ে সকল অর্থই গ্রহণ করা যাবে এবং সে হিসাবে সকল ক্ষেত্রেই হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে, না কি কোন এক অর্থ সুনির্দিষ্ট হওয়ার পক্ষে দলীলের অপেক্ষায় থাকতে হবে? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফে'য়ী ও কাযী আবূ বকর আল-বাকেল্লানীর মতে অর্থসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য না থাকলে সকল অর্থই গ্রহণ করা যাবে। কেননা শব্দটি যখন সকল অর্থের জন্যই গঠিত, তখন বিশেষ কোন অর্থের অগ্রাধিকার নেই। কাজেই সকল অর্থ গ্রহণ করাই সতর্কতার পরিচায়ক হবে।[২০৩] এর বিপরীতে ইমাম আবূ হানিফার অধিকাংশ অনুসারী, শাফে'য়ী মাযহাবের ইমামুল হারামাইন প্রমুখের মত হচ্ছে যে, একাধিক অর্থবোধক শব্দের সকল অর্থ এক সঙ্গে গ্রহণ জায়িয নয়, বরং যে কোনও এক অর্থ গ্রহণ করতে হবে

---

২০৩. মোল্লা জিউন, নুরুল আনওয়ার, পৃ. ৮৮।

www.waytojannah.com

কোন এক অর্থ যতক্ষণ স্থির করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসন্ধানে লেগে থাকতে হবে। তার আগে কোন অর্থের পক্ষেই রায় দেওয়া যাবে না। কারণ, এরূপ শব্দ একই সময়ে বহু অর্থের জন্য গঠিত হয়নি, বরং প্রতিটি অর্থ পৃথক পৃথকভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে। এখন একই সঙ্গে সবগুলো অর্থ গ্রহণ করা হলে সেটা আভিধানিক রীতি-নীতির পরিপন্থী হবে।[২০৪]

ফিকহী মাসাইলে এ মতভেদের প্রভাব যেমন, কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে উত্তরাধিকারী কি ঘাতক হতে কেবলই কিসাস গ্রহণ করতে পারবে, না কিসাস ও দিয়াত (অর্থিক ক্ষতিপূরণ) এর যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার রাখবে? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের দু'টি মত রয়েছে। ইমাম শাফে'য়ী ও আহমদের মতে, কিসাস ও দিয়াত যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা ও মালিকের মতে এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না, বরং কেবলই কিসাস গ্রহণ করতে পারবে। হাঁ, হত্যাকারী যদি দিয়াত দিতে সম্মত থাকে, তবে ভিন্ন কথা।[২০৫] এ মতবিরোধের কারণ কুরআন মাজীদে একটি আয়াতে ব্যবহৃত একাধিক অর্থবোধক مشترك শব্দ। আল্লাহ্ বলেন : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তাঁর উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে।"[২০৬]

এ আয়াতের سلطان শব্দটি কিসাস ও দিয়াত উভয় অর্থের অবকাশ রাখে। শাফে'য়ী ও আহ্মদ রাহেমাহুল্লাহ উভয় অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং অন্যরা কেবল 'কিসাস' অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং দলীল স্বরূপ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ "নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে"[২০৭] আয়াত পেশ করেন।

৮. মুতলাক (নিঃশর্ত) ও মুকায়্যাদ (শর্তযুক্ত) দলীলের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের গৃহীত নীতি এবং ফিকহী মতভেদে-এর প্রভাব

ফুকাহায়ে কিরাম যখন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে শরী'আতের বিধি-বিধান আহরণে প্রয়াসী হন, তখন অনেক সময়ই তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, একই কাজ এক জায়গায় মুতলাক বা নিঃশর্তভাবে করতে বলা হয়েছে তো অন্য জায়গায় মুকায়্যাদ বা

২০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

২০৫. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৩০১; মারগিনানী, হিদায়াহ, ৪/৫৪৩; ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ৭/৭৫২; শাফে'য়ী, আল-উম্ম, ৬/১২।

২০৬. সূরা আল-ইসরা, ৩৩।

২০৭. সূরা আল-বাকারাহ, ১৭৮।

www.waytojannah.com

শর্তযুক্তভাবে। এরূপ ক্ষেত্রে শর্তযুক্তকে শর্তহীনের ব্যাখ্যা ধরা হবে, না উভয়কে আপন-আপন জায়গায় সীমাবদ্ধ রাখা হবে? ফুকাহায়ে কিরাম বিষয়টাকে নিজ নিজ গবেষণার আলোকে চিন্তা করেছেন এবং পরিশেষে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পরে মিলিয়ে দেখা গেছে যে, সকল ফকীহের সিদ্ধান্ত একই রকম হয়নি, বরং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে গেছে, যা বহু ফিকহী মাসাইলে ইখতিলাফের একটি কারণ। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে জেনে নেওয়া দরকার যে, মুতলাক ও মুকায়্যাদ বলতে কি বোঝানো হয়?

মুতলাক এমন শব্দকে বলে, যদ্দ্বারা কোন জাতি বা শ্রেণীর অনির্দিষ্ট একককে বোঝায়, ফলে শ্রোতা যে কোন একককে ধরে নিতে পারে। যেমন যিহারের কাফফারা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "একটি দাস মুক্ত করতে হবে।"[২০৮] সুতরাং মুমিন-কাফির, নির্বিশেষে যে কোন দাস মুক্ত করলেই কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং আয়াতে رَقَبَةٍ শব্দটি মুতলাক। অন্য কথায় দাস-মুক্তির নির্দেশটি মুতলাক।

মুকায়্যাদ বলা হয় এমন শব্দকে, যা কোন শ্রেণীর নির্দিষ্ট একককে বোঝায়। অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে এমন কোন গুণ, শর্ত, সীমা ইত্যাদি জুড়ে দেওয়া হয়, যদ্দরুন যে কোনও এককের উপরে শব্দটি প্রযোজ্য হয় না, যেমন পবিত্র কুরআনে রক্ত হারাম হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا "অথবা প্রবাহিত রক্ত।"[২০৯]এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, কেবল প্রবাহিত রক্ত হারাম। যবাই করার পর গোশতের সঙ্গে যে রক্ত লেগে থাকে তা হারাম নয়। এমনিভাবে কলিজা যদিও রক্ত, কিন্তু তা প্রবাহিত রক্ত নয়, তাই তা হারাম নয়। মোটকথা, সর্বপ্রকার রক্ত নিষিদ্ধ নয়, বরং (রক্ত) কে প্রবাহিত এর সঙ্গে শর্তযুক্ত করে দিয়ে রক্তের এক বিশেষ প্রকারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মুতলাক ও মুকায়্যাদের বিভিন্ন অবস্থা

দুই দলীলের একটি যদি مطلق এবং অন্যটি مقيد হয় তবে তা চার রকমের হতে পারে :

(ক) হুকুম ও হুকুমের কারণ উভয়টি অভিন্ন, যেমন রক্তের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে এক জায়গায় মুতলাকভাবে বলা হয়েছে : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ "তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত প্রাণী ও রক্ত।"[২১০]

---

২০৮. সূরা আল-মুজাদালাহ, ৩।

২০৯. সূরা আল-আন'আম, ১৪৫।

২১০. সূরা আল-মায়িদাহ, ৩।

www.waytojannah.com

অন্য জায়গায় এই রক্তকে মুকায়্যাদভাবে বলা হয়েছে : أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا "অথবা প্রবাহিত রক্ত।"[২১১]

(খ) হুকুম ও কারণ উভয়টি পৃথক, যেমন চোরের হাত কাটা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়েছে : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا "পুরুষ চোর ও স্ত্রী চোরের হাত কেটে দাও।"[২১২] আবার ওযুতে হাত ধোয়া সম্পর্কে শর্তযুক্তভাবে আদেশ করা হয়েছে : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ "যখন সালাতের প্রস্তুতি নাও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর।"[২১৩]

(গ) হুকুম ভিন্ন, কিন্তু কারণ অভিন্ন, যেমন শর্তযুক্তভাবে উপরিউক্ত কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করার আদেশ, যার কারণ ওযু না থাকা। আবার তায়াম্মুমে নিঃশর্তভাবে হাত মাসেহ্ করার আদেশ। বলা হয়েছে : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ "সুতরাং তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর।"[২১৪] এরও কারণ ওযু না থাকা। কারণ এক হওয়া সত্ত্বেও বিধান ভিন্ন হয়েছে। একটিতে কনুই পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করে মুকায়্যাদ করে দেয়া হয়েছে, অপরটিতে কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

(ঘ) হুকুম এক, কিন্তু কারণ ভিন্ন, যেমন যিহারের কাফফারায় সাধারণভাবে দাস মুক্ত করার নির্দেশ। বলা হয়েছে : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "যারা নিজ স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে এবং পরে তাঁদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদেরকে একটি দাসমুক্ত করতে হবে।"[২১৫] আবার হত্যার কাফফারায় শর্তযুক্তভাবে দাস মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ "কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করবে।"[২১৬]

প্রথমোক্ত দুই প্রকারের ফুকাহায়ে কিরামের সকলেই একমত যে, প্রথম প্রকারের মধ্যে অর্থাৎ যখন হুকুম ও হুকুমের কারণ উভয়টি অভিন্ন হবে তখন মুকায়্যাদকে মুতলাকের ব্যাখ্যা মনে করতে হবে। দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কেও তাঁরা একমত যে, উভয়টিকে আপন-আপন স্থানে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অর্থাৎ মুকায়্যাদের হুকুম মুতলাকের উপর আরোপ করা যাবে না। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার সম্পর্কে তাদের মধ্যে

---

২১১. সূরা আল-আন'আম, ১৪৫।

২১২ সূরা আল-মায়িদাহ, ৩৮।

২১৩. সূরা আল-মায়িদাহ, ৬।

২১৪. সূরা আল-মায়িদাহ, ৬।

২১৫. সূরা আল-মুজাদালাহ, ৩।

২১৬ সূরা আন-নিসা, ৯২।

www.waytojannah.com

মতপার্থক্য হয়েছে যে, মুকায়্যাদকে মুতলাকের ব্যাখ্যা ধরা হবে কিনা, অন্য কথায় মুকায়্যাদের হুকুম মুতলাকের উপর আরোপ করা হবে কিনা? তন্মধ্যে তৃতীয় অবস্থা, অর্থাৎ মুতলাক ও মুকায়্যাদ-উভয় দলীলের কারণ যদি এক হয় এবং হুকুম ভিন্ন তবে কোনও কোনও ফকীহের মতে মুকায়্যাদের শর্তটি মুতলাকের উপরও আরোপিত হবে, কিন্তু অন্যদের মতে উভয় দলীল আপন-আপন ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে। একটিকে অন্যটির সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। যাদের মতে মুকায়্যাদের শর্ত মুতলাকের উপর আরোপ করা হবে তাদের নিকট তায়াম্মুমের আয়াত সাধারণভাবে হাত মাসেহ্ করতে বলা হলেও ওযুর আয়াতে যেহেতু কনুই পর্যন্ত ধৌত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাই কনুই পর্যন্ত এর শর্তটি মাসেহ্-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং তায়াম্মুমেও কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে।[২১৭]

আর চতুর্থ অবস্থা, অর্থাৎ মুতলাক ও মুকায়্যাদ-উভয় দলীলের কারণ যদি ভিন্ন হয় এবং হুকুম এক হয়, তবে সে সম্পর্কে হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মত হচ্ছে যে, মুকায়্যাদের শর্ত মুতলাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, বরং উভয় দলীল আপন-আপন স্থানে কার্যকর হবে। শাফে'য়ী ফুকাহায়ে কিরামের মতে মুকায়্যাদকে মুতলাকের ব্যাখ্যা মনে করা হবে। সুতরাং মুকায়্যাদের শর্ত মুতলাকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই মূলনীতিগত মতভেদের কারণে ফিকহী মাসাইলেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। যেমন, ভুলে হত্যা করলে তার কাফফারা হচ্ছে একটি মু'মিন গোলাম আযাদ করা।[২১৮] পক্ষান্তরে যিহারের কাফফারায় বলা হয়েছে, "যারা তাদের স্ত্রীগণের সঙ্গে যিহার করে এবং পরে তাঁদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদেরকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে।"[২১৯] এ আয়াতেও উপরের আয়াতের মত গোলাম আযাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তবে মু'মিন হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি। বোঝা যাচ্ছে যে কোন গোলাম আযাদ করলেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু উভয় আয়াতের হুকুম যেহেতু একই, (তা হচ্ছে, গোলাম আযাদের মাধ্যমে কাফফারা দেয়া) তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, এই মুতলাক হুকুমের সাথে মুকায়্যাদের শর্তটি যুক্ত হবে কিনা? হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, যুক্ত হবে না। কারণ উভয় হুকুমের কারণ আলাদা। উপরের আয়াতের হুকুমের কারণ ছিল ভুলক্রমে হত্যা আর এ আয়াতের হুকুমের কারণ হচ্ছে যিহার করার পর তা প্রত্যাহার করে নেওয়া। কারণ আলাদা হলে তখন মুকায়্যাদকে মুতলাকের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। সুতরাং আপন-আপন জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে। পক্ষান্তরে শাফে'য়ী

২১৭. আত-তুরকী, আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহসিন, আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা, পৃ. ১৭২।

২১৮. যেমন, সূরা আন-নিসা, ৯২ আয়াতের ভাষ্য।

২১৯. সূরা আল-মুজাদালাহ, ৩।

www.waytojannah.com

ফুকাহায়ে কিরাম যেহেতু এ অবস্থায়ও মুকায়্যাদকে মুতলাকের ব্যাখ্যা মনে করেন, তাই তাদের মতে প্রথম আয়াতে বর্ণিত مُـؤْمِنَةً শর্তটি দ্বিতীয় আয়াতের হুকুমেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যিহারের কাফফারাও মু'মিন দাসমুক্তির মাধ্যমে করতে হবে।[২২০]

৯. আম্‌র (আদেশ) কেন্দ্রিক ইখ্‌তিলাফ ও ফুকাহাদের মতভেদে এর প্রভাব

শরী'আতের বিধানাবলী মৌলিকভাবে আম্‌র ও নাহ্‌ই-কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু আদেশ করেছেন মানুষ তা পালন করবে এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকবে, এটাই সমস্ত শরী'আতের মূলকথা। কাজেই সমুদয় বিধি-বিধান এই আদেশ নিষেধেরই সমষ্টি। সুতরাং এ দুটি বিষয়ের মাঝে চিন্তা গবেষণায় ফুকাহায়ে কিরাম যে অধিকতর যত্নবান থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। তারা বিভিন্নভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। ফলে এ দুটিকে কেন্দ্র করে নানা রকম মূলনীতি তৈরি হয়েছে। চিন্তা ও গবেষণার স্বাভাবিক নিয়মে মূলনীতিতে মতভেদও ঘটেছে যা ফিকহী ইখ্‌তিলাফের এক বড় কারণ। আম্‌র ও নাহ্‌ই-কেন্দ্রিক সেসব মূল-নীতির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি আলোচনা করা হল, যাতে ফিকহী মতভেদে এর কতখানি প্রভাব রয়েছে তা স্পষ্ট হয়।

ক. আম্‌র দ্বারা কী ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, না মুবাহ্‌, না অন্য কিছু?

আম্‌র অর্থাৎ আদেশসূচক ক্রিয়া বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল-আমেদী, আল-গাযালী প্রমুখ এর পনেরটি অর্থ উল্লেখ করেছেন। জাম-উল জাওয়ামি এর ভাষ্যে আল-মহাল্লী আম্‌র এর ছাব্বিশটি অর্থ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উসূল-শাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনটি অর্থ ছাড়া বাকি সবই রূপক। সে তিনটি অর্থ হচ্ছে তলব (চাওয়া), তাহ্‌দীদ (ধমক দেওয়া) ও ইবাহা (বৈধ করা)।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে আবার এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, এ তিনটির মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত অর্থ আর কোন্‌টি রূপক অর্থ? কেউ বলেন এ তিনটির সবগুলিই আম্‌র এর প্রকৃত অর্থ, অর্থাৎ শব্দটি مشترك (একাধিক অর্থবোধক)। কেউ বলেন ইবাহা এর প্রকৃত অর্থ। আর অন্য অর্থগুলো রূপক। আবার কারও মতে এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে তলব (চাওয়া) কামনা করা। এটাই অধিকাংশের মত।[২২১]

---

২২০. আলূসী, রূহুল মা'আনী, ১৪/২০৬; ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৮৪; ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী ৭/৩৫৯; মোল্লা জিউন, আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ, পৃ. ৪৬২; শাওকানী, নাইলুল আওতার, ৬/২৬০; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ, ৫/৪১।

২২১. আলাউদ্দীন আল-বুখারী, কাশফুল আসরার, ১/১০৭; আল-জাসসাস, আল-ফুসূল ফিল উসূল, ১/২৮০; মোল্লা জিউন, নুরুল আনওয়ার, পৃ. ৩১।

www.waytojannah.com

Contents

যাদের মতে আম্‌র এর প্রকৃত অর্থ তলব, তাঁদের মধ্যে আবার মতভেদ রয়েছে যে, এর দ্বারা কি الطلب وجوبا (বাধ্যতামূলক অর্থে চাওয়া বোঝানো হয়) যা অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ? না الطلب ندبا (বাঞ্ছনীয় ও পছন্দনীয় অর্থে চাওয়া) বোঝানো হয়, অর্থাৎ করলে প্রশংসনীয়, না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না?

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মত হচ্ছে যে, 'আম্‌র' অর্থাৎ আজ্ঞাসূচক ক্রিয়া দ্বারা যা করতে আদেশ করা হয় সেটা করা বাধ্যতামূলক। এটাই 'আম্‌র'-এর প্রকৃত অর্থ। হাঁ, যদি এমন কোন আলামত-ইঙ্গিত ও দলীল-প্রমাণ থাকে যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আজ্ঞামূলক ক্রিয়া ব্যবহৃত হলেও সে কাজকে বাধ্যতামূলক করা শরী'আতের লক্ষ্য নয়, তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। অপর কারও কারও মতে আম্‌র দ্বারা ندب বোঝানো হয়, অর্থাৎ কাজটা শরী'আতের পছন্দ এবং তার কর্তা প্রশংসার বস্তু। তবে না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না।

ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এর একটি মত হচ্ছে যে, আম্‌র الوجوب ও الندب (বাধ্যতামূলক ও বাঞ্ছনীয়) উভয় অর্থই বোঝায়। কাযী আবূ বকর, আল-গাযালী প্রমুখের মতে উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে। কাজেই কোন এক অর্থের পক্ষে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকাই শ্রেয়।[২২২]

তবে এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরামের মত হচ্ছে, 'আমর' দ্বারা কাজকে বাধ্যতামূলক করা হয়, তবে বাধ্যতামূলক না হওয়ার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকলে সে দলীল অনুযায়ী হুকুম সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যাহেরী মতাদর্শের ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, আম্‌র সর্বাবস্থায়ই উজুব বা 'বাধ্যতামূলক'-এর অর্থ দেয়। কাজেই শরী'আতে কোন কাজের আদেশ করা হলে সেটা করা অবশ্য কর্তব্য ও ফরয। কোন রকম ইশারা-ইঙ্গিত ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা 'আমর'এর এ অর্থ পরিবর্তিত হবে না। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরামের সঙ্গে বহু ফিকহী মাসাইলে যাহেরী ফকীহগণের মতপার্থক্য ঘটেছে। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ "হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রেখো।"[২২৩] আয়াতে اُكْتُبُوْهُ (লিখে রাখ) শব্দটি আদেশসূচক। কাজেই যাহেরী মাযহাব অনুযায়ী ঋণের লেনদেন লিখে রাখা ফরয। কিন্তু অন্যান্য দলীল-প্রমাণের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ স্থলে 'আম্‌র' দ্বারা লিখে রাখাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বরং লিখতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

---

২২২. মোল্লা জিউন, নূরুল আনওয়ার, পৃ. ৩১; আলাউদ্দীন আল-বুখারী, কাশফুল আসরার, ১/১০৮; আল-জাসসাস, আল-ফুসূল ফিল উসূল, ১/২৮১।

২২৩. সূরা আল-বাকারাহ, ২৮২।

www.waytojannah.com

খ. একই কাজ বারবার করা কি 'আমর'-এর দাবি?

কুরআন-সুন্নায় যখন কোন কাজের আদেশ করা হয় তখন সে কাজটা কি বারবার করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, না একবার করাই যথেষ্ট? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম ও শাফে'য়ী মাযহাবের মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মতে 'আম্‌র' দ্বারা কাজ বারবার করা অবধারিত হয় না এবং আম্‌র এর মধ্যে বারবার করার দাবিও নেই। পক্ষান্তরে আবূ ইসহাক আল-ইসফারাঈনী-এর মতে 'আম্‌র' বারবার করা অবধারিত করে। সুতরাং সে কাজ জীবনভর করে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ্- এর মতে 'আম্‌র' অনিবার্যভাবে কোন কাজের পুনরাবৃত্তি দাবি করে না বটে, তবে তার মধ্যে পুনরাবৃত্তির অবকাশ থাকে। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন মতামত আছে। এই মতভেদের ফলে বিভিন্ন ফিকহী মাসাইলেও ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে যেমন,

(ক) এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরয সালাত আদায় করা যাবে কিনা, এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। শাফে'য়ী মাযহাবে এক তায়াম্মুম দ্বারা যত ইচ্ছা নফল পড়া যাবে, কিন্তু ফরয একবারই পড়া যাবে, তার বেশি নয়। হানাফী মাযহাবে ওযুর মতই এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরয সালাত আদায় করা যায়। প্রত্যেক ফরযের জন্য বারবার তায়াম্মুম করা জরুরী নয়। হাম্বলী মাযহাবে এক তায়াম্মুম দ্বারা দুই ওয়াক্ত দুই ফরয সালাত আদায় করা যাবে না, তবে এক ওয়াক্তের মধ্যে সেই ওয়াক্তের ফরয, নফল এবং বিগত সময়ের কাযা সালাত পড়া জায়িয। মালিকী মাযহাব শাফে'য়ী মাযহাবেরই অনুরূপ।[২২৪] সকলেরই দলীল কুরআন মাজীদের আয়াত :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ

"হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত করবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সঙ্গত

২২৪. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ১/২৬২; ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ১/২৭৩; ইবনে আবদিল বার, আল-ইস্তিযকার, ১/৩১৭।

www.waytojannah.com

হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে তা তোমাদের মুখে ও হাতে মাসেহ করবে।"[২২৫]

যাদের মতে আম্‌র বা নির্দেশ বারবার করার দাবি করে না, তাদের মতে, এ আয়াতে ওযু করতে অসমর্থ হলে সালাতের জন্য তায়াম্মুমের আদেশ করা হয়েছে, সুতরাং প্রত্যেক ফরয সালাতের জন্য বারবার তায়াম্মুম করতে হবে না, যেমন বারবার ওযু করতে হয় না। আর যাদের মতে আম্‌র বা নির্দেশ কার্যের পুনরাবৃত্তিকে অবধারিত করে কিম্বা তার মধ্যে পুনরাবৃত্তির অবকাশ আছে, তারা এ আয়াতের ভিত্তিতে প্রত্যেক ফরযের জন্য পৃথক তায়াম্মুমকে জরুরী বলেন। প্রশ্ন হয়, তা হলে প্রত্যেক ফরযের জন্য আলাদা ওযু করতে হয় না কেন? জবাবে তারা বলেন, তাও করা জরুরী ছিল, কিন্তু পরে রহিত হয়ে গেছে।[২২৬]

(খ) চোরের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে আদেশ করা হয়েছে : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا "পুরুষ বা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও।"[২২৭]

ইমাম শাফে'য়ীর মতে এ 'আমর' যেহেতু কার্যের পুনরাবৃত্তির অবকাশ রাখে তাই এ আয়াতে বিধৃত আদেশের ভিত্তিতে তিনি বলেন, কেউ চুরি করলে তার ডান হাত কেটে দেয়া হবে, আবার চুরি করলে বাম পা কাটা হবে, আবার চুরি করলে বাম হাত এবং তার পরও চুরি করলে ডান পা কেটে দেয়া হবে।[২২৮] পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবে 'আম্‌র' যেহেতু পুনরাবৃত্তি চায় না, তাই হাত একবার কাটা হবে, এরপর চুরি করলে তাকে জেলে আটকে রাখতে হবে।[২২৯]

গ. 'আম্‌র' বা আদেশ মাত্রই কি তৎক্ষণাৎ পালন করা না বিলম্বের অবকাশ থাকে?

ইমামগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, অবিলম্বে কার্যকর করা 'আমর' এর দাবি কি না? যাদের মতে 'আমর' কার্যের পুনরাবৃত্তিকে অবধারিত করে, তারা বলেন, 'আমর'-এর পর কাল বিলম্ব করার অবকাশ নেই, বরং সঙ্গে সঙ্গেই তা

---

২২৫. সূরা আল-মায়িদাহ, ৬।

২২৬. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/৫২; ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ১/২৭৩; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ১/১৪০; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ, ১/২৭০।

২২৭ সূরা আল-মায়িদাহ, ৩৮।

২২৮. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৩৩৯; ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ১/২৭৩; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ, ৫/৪৯৪।

২২৯. ইবনে রুশদ, প্রাগুক্ত, ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ৫/১০২; মোল্লা জিউন, নুরুল আনওয়ার, পৃ. ৩৬।

www.waytojannah.com

কার্যকর করা জরুরী। আর যাদের মতে 'আমর' এর ফলে পুনরাবৃত্তি করা অবধারিত হয় না তাদের মধ্যে মৌলিকভাবে দু'টি মত। ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ী এবং তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারীদের মতে বিলম্ব কি অবিলম্বের সাথে 'আমর'-এর কোন সম্পর্ক নেই। মূলত, 'আমর'-এর দাবি হচ্ছে কাজটা অবশ্যই করা, তৎক্ষণাৎ করুক, কি বিলম্বে করুক, যদিও অবিলম্বে করা উত্তম। তবে যদি এমন কোন দলীল-প্রমাণ থাকে যা দ্বারা বোঝা যায় কাজটা অবিলম্বেই করতে হবে তা হলে সেই দলীলের কারণে তা অবিলম্বে করা জরুরী হয়ে যায়, কেবল 'আমর'-এর কারণে নয়। ইমাম মালিক-এর একটি মতও এই রকম। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ্ এর অপর মত এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী 'আমর' অবিলম্বেই কাজকে অবধারিত করে, দেরী করা জায়িয নয়। আবার কোন কোন হানাফী ফকীহ্ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[২৩০]

উপরোক্ত মতবিরোধের কারণে বহু ফিকহী মাসআলায় মতভেদ দেখা দিয়েছে, যেমন,

ক. যে ব্যক্তি যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এবং তার কাছে সে সম্পদে এক বছরও পূর্ণ হয়েছে, তার জন্য কি বছর পূর্তির সাথে সাথে যাকাত আদায় জরুরী, না বিলম্বেরও অবকাশ আছে? হাম্বলী মাযহাব ও মালিকী মাযহাবের মূল মাসআলা হচ্ছে বছর পূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই যাকাত দেয়া জরুরী।[২৩১] শাফে'য়ী মাযহাবেও অবিলম্বে আদায় জরুরী তবে তা এ জন্য নয় যে, 'আমর' অবিলম্বে করা চায়, বরং এ জন্যে যে, যারা যাকাতের হকদার তাদের নগদ প্রয়োজন রয়েছে।[২৩২]

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ইবনুল হুমাম অনেকটা শাফে'য়ী মাযহাবের অনুরূপ মত পোষণ করেন।[২৩৩] কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ রাহেমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, বিলম্বের অবকাশ আছে। তবে অনাদায়ী অবস্থায় মারা গেলে গুনাহগার হবে।[২৩৪]

খ. হজ্জ আদায়ের ব্যাপারেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। হাম্বলী মাযহাবে তা অবিলম্বে করা জরুরী। বিনা ওজরে দেরী করলে গুনাহগার হবে।[২৩৫] পক্ষান্তরে

---

২৩০. আল-জাসসাস, আল-ফুসূল ফিল উসূল, ২/২৯৫; আত-তুরকী, আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা, পৃ. ২৪৯।

২৩১. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ২/৬৮৪।

২৩২. আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ, ১/৪১৩।

২৩৩. ফাতহুল কাদীর, ১/৪৮২।

২৩৪. কাসানী, বাদায়েউস সানায়ে'উ, ২/৩।

২৩৫. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ৩/২১৭।

www.waytojannah.com

Contents

হানাফী, শাফে'য়ী ও মালিকী মাযহাবে দেরী করে করার অবকাশ রয়েছে। তবে না করলে গুনাহগার হবে।[২৩৬]

১০. 'নাহ্ই' (নিষেধাজ্ঞা) এর হুকুম সম্পর্কে ইখ্তিলাফ ও ফুকাহাদের মতভেদে এর প্রভাব

● কোন বিষয়ে 'নাহ্ই' আরোপিত হলে সে 'নাহ্ই' কি হারাম বোঝায় নাকি মাকরূহ বোঝায়?

কোন বিষয়ে 'নাহ্ই' আরোপিত হলে সে 'নাহ্ই' দ্বারা কি উদ্দেশ্য, এ মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। কারও নিকট 'নাহ্ই' মানেই হারাম। আবার কারও নিকট মাকরূহ। আবার কারো নিকট অবস্থা ও স্থানভেদে এর অর্থ নির্ধারিত হবে। এর উপর ভিত্তি করে অনেক মাসআলায় আলিমগণ মতভেদ করেছেন। যেমন, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে দেয়ার মাসআলা। হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণ এবং যাহেরী মাযহাবের আলিমদের নিকটি এটি হারাম। অন্যান্য ইমামের নিকট মাকরূহ। সবার দলীলই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস,

اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده ·

"তোমাদের মধ্যে কেউ তার ঘুম থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তার হাত পানির পাত্রে ঢুকিয়ে না দেয়, যতক্ষণ সে তা তিনবার ধুয়ে ফেলে, কেননা সে জানে না তার হাত কোথায় অবস্থান করেছিল।"[২৩৭]

এখানে لا يغمس বা 'ঢুকাবে না' এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে। এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। যার আলোচনা করা হল।

● 'নাহ্ই' বা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত বিষয় কি বাতিল বা মন্দ?

নাহ্ই বা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত বিষয় সাধারণত দু' প্রকার :

এক. এমন কিছু বিষয় বা কাজ যা বোঝার ব্যাপারটা শরী'আতের উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ স্বীয় বোধ-বুদ্ধি দ্বারাই তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে ও ভালমন্দ যাচাই করতে পারে (الأفعال الحسية)। যেমন নরহত্যা, ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে, সে বিষয় বা কাজটি যে বাতিল এবং আদতেই মন্দ এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম একমত। সুতরাং এ জাতীয় কোন কিছু নিষেধ হলে তা সবার নিকটই বাতিল ও মন্দ হতে বাধ্য।

---

২৩৬. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/২৩৫; কাসানী, বাদা'য়েউস সানা'য়েউ, ২/১১৯; ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ২/৫৪২।

২৩৭. মুসলিম, হাদীস নং ২৭৮।

www.waytojannah.com

দুই. এমন কিছু বিষয় বা কাজ আছে, যার স্বরূপ ও ভাল-মন্দ বোঝার বিষয়টা শরী'আতের উপর নির্ভরশীল; নিজের বোধ-বুদ্ধি দ্বারা মানুষ তা বুঝতে পারে না, যেমন, সালাত ও সাওম ইত্যাদি (الأفعال الشرعية)। এসব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার অর্থ কি শরী'আতের দৃষ্টিতে সে কাজটি বাতিল এবং সেটি আদতেই মন্দ, যদ্দরুন তার কোন বৈধতা থাকে না? এই মাসআলায় ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

শাফে'য়ী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরামের মতে শরী'আত-দ্বারা জ্ঞাত কার্যাবলী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে তা প্রমাণ করে যে, সে কাজ বাতিল এবং তা আদতেই মন্দ। ফলে তার কোনরূপ বৈধতা থাকে না। পক্ষান্তরে হানাফি ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এ জাতীয় কাজ বাতিল হয়ে যায় না। প্রসিদ্ধ শাফে'য়ী ফকীহ্ আবূ বাকর আল-কাফফাল আশ-শাশী ও ইমাম আল-গাযালীও এই মত পোষণ করেন। আব্দুল আযীয আল-বুখারী আল-হানাফী বলেন, আমাদের নিকট শরী'আত ভিত্তিক কার্যাবলী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার হাকীকত ও হুকুম এই যে, যে কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, সেই কাজটি নয়, বরং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি মন্দ। কাজেই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মূল কাজটি বৈধ থাকে।[২৩৮] অবশ্য সে কাজের সঙ্গে কোন মন্দ প্রসঙ্গ থাকার কারণে কাজটি ফাসিদ সাব্যস্ত হবে (অর্থাৎ মূলত বৈধ এবং গুণগতভাবে অবৈধ)। কাজেই এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। এই মতভেদের কারণে বহু ফিকহী মাসাইলেও ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে যথা :

(ক) আবূ সা'য়ীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, نهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين صوم يوم النحر ويوم الفطر "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন-ঈদুল ফিতরের দিন ও কুরবানীর দিন।"[২৩৯] এ হাদীসের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরাম একমত যে, এ দু'দিন রোযা রাখা জায়িয নয়-তা নফল রোযা হোক বা মানত কিংবা কাফফারার রোযা।

প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি এ দু'দিন রোযা রাখার মানত করে তবে তার মানত সংঘটিত হবে কিনা? যদি মানত সংঘটিত হয় এবং সে এ দু'দিন রোযা রাখে তবে তার মানত আদায় হয়ে যাবে কিনা? ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ উপরিউক্ত মূলনীতি অনুযায়ী এরূপ মানতকেই বাতিল মনে করেন।[২৪০] কেননা হাদীসে এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই এ দিনের রোযাই বাতিল। সুতরাং মানতও বাতিল। মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরামও অনুরূপ মত পোষণ করেন।[২৪১]

---

২৩৮. কাশফুল আসরার, ১/২৫৮।
২৩৯. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ২/১৫০।
২৪০. মুগনিল মুহতাজ, ১/৪৩৩।
২৪১. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ৯/২৩।

www.waytojannah.com

হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম বলে, নিষেধাজ্ঞা দ্বারা যেহেতু কার্য বাতিল হয়ে যায় না, তাই এ দু'দিনের রোযা বাতিল নয়, বরং মৌলিকভাবে বৈধ। কিন্তু রোযা রাখলে আল্লাহ্ তা'আলার আতিথেয়তাকে উপেক্ষা করা হয় বলে এ দিন রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এর নিষিদ্ধতা প্রাসঙ্গিক কারণে, আসল রোযার ভেতরে কোন দোষ নেই। রোযা যেহেতু বাতিল নয়, তাই মানত সংঘটিত হয়ে গেছে এবং এ দিন রোযা রাখলে মানত আদায়ও হয়ে যাবে। তবে সে গুনাহ্গার হবে। কাজেই তার কর্তব্য এ দিন রোযা না রেখে অন্য দিন তা কাযা করা।[২৪২]

খ. ইবন উমর-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, نهى عن الشغار। 'শিগার'-এর পদ্ধতিতে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।[২৪৩]

'শিগার' অর্থ দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে একে অন্যের বোন বা কন্যাকে এই শর্তে বিবাহ করবে যে, সে বিবাহে মোহর থাকবে না। একজনের বিবাহই অন্যজনের বিবাহের বদলা হবে।[২৪৪]

উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতে সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামের নিকট এ জাতীয় বিবাহ অবৈধ। কিন্তু তথাপি যদি এরূপ বিবাহ হয়ে যায় তবে কি তা বাতিল গণ্য হবে? মালিকী ও শাফে'য়ী মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।[২৪৫] পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুসারে বিবাহ বাতিল হবে না, তবে ন্যায্য মোহর পরিশোধ করতে হবে।[২৪৬]

১১. মাফহূমে মুখালিফ (দলীলে ব্যবহৃত বাক্যের বিপরীত অর্থ) স্বতন্ত্র দলীলের মর্যাদা রাখা না রাখা নিয়ে মতপার্থক্য ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

কুরআন-সুন্নাহে কোন বিষয়ের হুকুম বর্ণনার জন্য যে বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সে বাক্য ব্যবহারের কারণে যে বিপরীত অর্থ বোঝা যায়, সেই বিপরীত অর্থের কি কোন গুরুত্ব আছে এবং তার দ্বারা কি কোন হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে? যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ٠

২৪২. সারাখসী, আল-মাবসূত, ৩/৯৬; মোল্লা জীউন, নুরুল আনওয়ার, পৃ. ৬৮; আলাউদ্দীন আল-বুখারী, কাশফুল আসরার, ১/২৭০-২৭২।

২৪৩. বুখারী, হাদীস নং ২১১৪।

২৪৪. ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ, ২/২২৬।

২৪৫. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ৬/৬৪১, ইমাম শাফে'য়ী, আল-উম্ম, ৫/১৭৪।

২৪৬. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ৩/৩২৫।

www.waytojannah.com

"যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিৎনা সৃষ্টি করবে তবে সালাত কসর করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।"[২৪৭]

এ আয়াতে সালাত কসরের জন্য শত্রুর পক্ষ হতে ফিৎনা সৃষ্টির আশংকাকে শর্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ফিৎনা সৃষ্টির আশংকা না থাকলে কসর করা যাবে না। এই যে বিপরীত অর্থ বোঝা যাচ্ছে এটা কি কসর জায়িয না হওয়ার পক্ষে দলীল হবে? পরিভাষায় এই বিপরীত অর্থকে 'মাফহুমে মুখালিফ' বলা হয়।

'মাফহুমে মুখালিফ' দলীল কিনা-এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং এ মতভেদের কারণে বহু ফিকহী মাসাইলে ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে। মালিকী, শাফে'য়ী ও হাম্বলী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরাম 'মাফহুমে মুখালিফ' কে দলীলরূপে গ্রহণ করেন এবং এর ভিত্তিতে বিধি-বিধান নিরূপণকে বৈধ মনে করেন। কিন্তু হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে 'মাফহুমে মুখালিফ' শরী'আতের দলীল নয় বরং-এর ভিত্তিতে শার'য়ী বিষয়ে ফায়সালা গ্রহণ বৈধ নয়। ইমাম ইবন হাযম-ও একই মত পোষণ করেন। বিখ্যাত শাফে'য়ী আলিম ইমাম আল-গাযালী ও আল-আমেদী-এর মতও তাই।[২৪৮]

'মাফহুমে মুখালিফ' সংক্রান্ত এই মতভেদের কারণে অনেক ফিকহী মাসাইলে ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে, যেমন :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ

"তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিবাহ করবে।"[২৪৯]

এ আয়াতে ক্রীতদাসী বিবাহ করার জন্য স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকার শর্ত আরোপ করা হচ্ছে। তবে কি সামর্থ্য থাকা অবস্থায় ক্রীতদাসী বিবাহ অবৈধ? হাঁ, যারা মাফহুমে মুখালিফকে দলীলরূপে গ্রহণ করেন তাদের মতে অবৈধ।[২৫০] যাদের নিকট এটা কোন দলীল নয়, তাদের মতে স্বাধীনা নারী বিবাহের সামর্থ্য থাকলেও ক্রীতদাসী বিবাহ জায়িয। কেননা অন্য আয়াতে যাদেরকে বিবাহ করা বৈধ করা হয়েছে, ক্রীতদাস নিঃশর্তভাবে তার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইরশাদ হয়েছে : وَاُحِلَّ لَكُمْ

২৪৭. সূরা আন-নিসা, ১০১।

২৪৮. রাদ্দুল মুহতার, ১/২২৯।

২৪৯. সূরা আন-নিসা, ২৫।

২৫০. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৩২; ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ৬/৫৯৬।

www.waytojannah.com

مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ "উপরে যাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হল এদের ছাড়া আর সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হল।"[২৫১]

তাছাড়া মালিকানাধীন নারী তো এমনিতেই হালাল। এমতাবস্থায় বিবাহের মাধ্যমে হালাল হওয়ার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। হাঁ, আয়াতে বর্ণিত শর্তের কারণে বলা যায় যে, এরূপ বিবাহ মাকরূহ।[২৫২]

সেই আয়াতেই অধিকারভুক্ত নারীর ক্ষেত্রে মুমিন হওয়ার বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, ক্রীতদাসী মু'মিন না হয়ে কিতাবী (ইহুদী-নাসারা) হলে তাকে বিবাহ করা বৈধ হবে না। যাদের দৃষ্টিতে মাফহুমে মুখালিফও শরী'আতের দলীল তারা এর ভিত্তিতে বলেন, কিতাবী ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা জায়িয নয়। কিন্তু যারা মাফহুমে মুখালিফের প্রামাণ্য মর্যাদা স্বীকার করেন না, তাদের মতে কিতাবী ক্রীতদাসীকেও বিবাহ করা বৈধ।[২৫৩]

চার. ফিকহী ইখতিলাফের যে কারণ 'ইজমা'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত

ইজমা শরী'আতের তৃতীয় দলীল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পরে মুসলিম উম্মাহ-এর উলামায়ে কিরাম কর্তৃক শরী'আতের কোন হুকুম সম্পর্কে একমত হওয়াকে 'ইজমা' বলে। কোন বিষয়ে ইজমা সম্পন্ন হওয়ার পর সে বিষয়ে মতভেদ জায়িয নয়। তবে ইজমা সংঘটিত হওয়ার কোন কোন শর্ত সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে, যেমন কোন বিষয়ে উলামায়ে কিরামের একাংশ নীরবতা অবলম্বন করলে সে নীরবতাকে তাঁদের সম্মতি ধরে নিয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে; কিন্তু প্রথম যুগের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ থাকলে পরবর্তী যুগের ফুকাহায়ে কিরাম যদি সে বিষয়ে একমত হয়ে যান, তবে তাকে ইজমা-এর মর্যাদা দেওয়া হবে কিনা ইত্যাদি। অবশ্য ফিকহী ইখতিলাফে এসব বিষয়ের তেমন কোন প্রভাব নেই। ইজমা সংক্রান্ত যে বিষয়টি ফিকহী মতভেদের একটি কারণ তা এই যে, মদীনাবাসীদের ঐকমত্য কি ইজমা-এর মর্যাদা রাখে তদ্দ্বারা কি শরী'আতের কোন হুকুম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে?

ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহর মতে মদীনাবাসীদের ঐকমত্য দ্বারাও ইজমা সংঘটিত হয় এবং শার'য়ী বিধান সম্পর্কে তদ্দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়, কিন্তু অপরাপর ফুকাহায়ে কিরামের দৃষ্টিতে এটা ইজমা-এর মর্যাদা রাখে না এবং এর দ্বারা কোন শার'য়ী বিষয়ে দলীল দেওয়া যায় না। কেননা ইজমা বলতে সকলের ঐকমত্যকে

---

২৫১. সূরা আন-নিসা, ২৪।

২৫২. আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৩/১০; সারখসী, আল-মাবসূত, ৫/১০৮; ইবনে কাসীর, আত-তাফসীর, ১/৪৭৮; ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, ৩/১৮৫।

২৫৩. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৩৪; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ২/৩৭।

www.waytojannah.com

বোঝায়। কেবল মদীনাবাসীর ঐকমত্য তো সকলের নয়, বরং আংশিকের ঐকমত্য। কাজেই এটা ইজমা হয় কি করে?

এ মতভেদের কারণে কোনও কোনও ফিকহী মাসাইলেও ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে, যেমনঃ ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহর মতে (ذوى الأرحام) 'যাবিল-আরহাম' শ্রেণীর আত্মীয় কোন অবস্থাতেই মীরাসের অধিকারী হয় না। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ বিষয়টি সর্বস্বীকৃত, অবিসংবাদিত এবং আমাদের এলাকা (মদীনা)-এর উলামায়ে কিরাম সকলেই এ মত পোষণ করেন যে, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, নানা, পিতার বৈপিত্রেয় ভাই, মামা, মায়ের দাদী, আপন ভাইয়ের কন্যা, ফুফু ও খালা আত্মীয়তা সূত্রে মীরাসের অধিকারী হবে না।[২৫৪]

ইমাম আবূ হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ, আওযা'য়ী রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখের মতে যাবিল-ফুরূয ও আসাবা শ্রেণীর আত্মীয়ের অবর্তমানে যাবিল আরহাম শ্রেণীর আত্মীয়গণ মীরাস লাভ করবে।[২৫৫] এ ব্যাপারে তারা কুরআন-সুন্নাহ হতে দলীল পেশ করেন, ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহর মতেও এ শ্রেণীর আত্মীয় বিশেষ অবস্থায় মীরাসের অধিকারী হয়ে থাকে।

পাঁচ. ফিক্হী ইখতিলাফের যেসব কারণ 'কিয়াস'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত

এতক্ষণ আমরা যেসব কারণ উল্লেখ করেছি সেগুলো হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নায় কোন বিষয়ে হুকুম বা বিধান আছে। সেগুলোকে বুঝতে, বোঝাতে, সাব্যস্ত করতে মতভেদ সংঘটিত হয়েছিল। এবার আমরা আলোচনায় আসছি এমন বিষয়াদির যেগুলো কুরআন ও সুন্নায় প্রত্যক্ষভাবে নেই, তবে কুরআন ও সুন্নায় যা আছে তার উপরই এর ভিত্তি। মূলত ফিকহী ইখতিলাফ বা মতভেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো,

- **কোন বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে প্রত্যক্ষ কোন সমাধানের অনুপস্থিতি**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর বেশ কিছু নব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে ও ঘটছে যা তার যুগে ঘটেনি। ফলে তাঁর পক্ষ থেকে সেগুলোর প্রত্যক্ষ কোন সমাধান পাওয়া যায়নি। সাহাবায়ে কিরাম ও ফুকাহায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীসের অপরাপর আহকামের আলোকে এবং যুক্তির নিরিখে অথবা আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে নব উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান পেশ করেছেন। আর তখনই তাঁদের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

---

২৫৪. ইমাম মালিক, মুআত্তা, ১/৫১৮।

২৫৫. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/২৬২; ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ৬/২৮৩; ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার, ৬/৭৯১।

www.waytojannah.com

যেমন, কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরসুরিদের মধ্যে ভাই এর উপস্থিতিতে দাদার মীরাস অধিকার সংক্রান্ত মাসআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পেশ হয়নি। তাঁর তিরোধানের পর সাহাবাদের সামনে পেশ হয়েছে। ফলে এর সমাধানে তাঁদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সুরাহা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লোকসকল! আমার বাসনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে তিনটি বিষয়ের যদি সমাধান করে যেতেন, আমরা তা মেনে নিতাম এবং আমরা আজ এ সমস্যায় নিপতিত হতাম না। বিষয় তিনটি হলো, ১. 'কালালা' অর্থাৎ, যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী পিতা বা সন্তান কেউ নেই ; ২. দাদার মীরাস সংক্রান্ত মাসআলা ; ৩. সূদ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়।'[২৫৬]

মোটকথা, দাদার মীরাসের ব্যাপারে হাদীসে প্রত্যক্ষ কোন সমাধান না থাকায় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। যেমন আবূ বকর, ইবন আব্বাস, ইবন যুবায়ের, মুয়া'য ইবন জাবাল, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ হুরায়রাহ, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখের মতে, দাদা যেহেতু ভাইদের তুলনায় মৃত ব্যক্তির নিকটতম। কেননা, তিনি মৃত ব্যক্তির পিতৃতুল্য। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে দাদাকে পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, 'তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত।'[২৫৭] কাজেই দাদা, ভাইদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। দাদার উপস্থিতিতে ভাইয়েরা মীরাসের অংশীদার হবে না।

অপরপক্ষে আলী, উমর, যায়দ ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের মতে, মৃত ব্যক্তির নৈকট্যের ব্যাপারে দাদা-ভাই উভয়েই সমমর্যাদার অধিকারী। কেননা, উভয়ের সাথেই তার সম্পর্কের সূত্র হলো পিতা। কাজেই দাদা ও ভাই উভয়েই মীরাসের অংশীদার হবে।

সাহাবায়ে কিরামের এ মতপার্থক্যের ফলে পরবর্তী যুগের ইমামগণও একমত হতে পারেননি। যেমন, শাফে'য়ী ও মালিকী মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম, ইমাম আহমদের মতামত সম্পর্কে দু'টি বর্ণনার বিশুদ্ধতম বর্ণনা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত হল, এ ক্ষেত্রে দাদাও মিরাস পাবে। তবে মিরাস বন্টনের বেলায় তাঁদের পরস্পরের মতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অপরপক্ষে ইমাম আবূ হানিফা, যুফার, হাসান ইবন যিয়াদ ও দাউদ প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, দাদা

---

২৫৬. মুসলিম, হাদীস নং ৩০৩২।

২৫৭ সূরা আল-হাজ্জ, ৭৮।

www.waytojannah.com

মীরাস পাবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করেছেন। সুতরাং এ মতভেদের মূল কারণ হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নায় সরাসরি কোন نص বা মূলপাঠে এর উল্লেখ না থাকা।

অনুরূপভাবে, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগে একটি নতুন মাসআলা পেশ হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ হল, ইয়ামানের রাজধানী সানআ'তে জনৈকা মহিলার স্বামী তার অন্য পক্ষের একটি সন্তানকে আমানত রেখে কোথাও সফরে যায়। স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়ে। সৎসন্তানের মাধ্যমে এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে অপমানিত হতে হয় কিনা সে ভয়ে মহিলাটি তার অবৈধ প্রেমিককে প্ররোচিত করে তার এক দাস ও অন্য আর এক ব্যক্তিসহ সকলে মিলে ছেলেটিকে হত্যা করে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে চামড়ার থলেতে করে একটি পরিত্যক্ত কূপে ফেলে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে সকলেই অপরাধ স্বীকার করে। অত্র এলাকার প্রশাসক ব্যাপারটি উমর রাদিয়াল্লাহুর 'আনহু কাছে লিখে পাঠালেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের সকলকেই হত্যা করার নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, সানআ'বাসীদের সকলেও যদি তার হত্যায় অংশগ্রহণ করত আমি অবশ্যই তাদের সকলকে এর কিসাসে হত্যা করতাম।[২৫৮]

এ সিদ্ধান্তে আলী, মুগীরাহ্ ইবন শু'বাহ্ ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম উমরের সাথে একমত ছিলেন। তাবে'য়ীদের মধ্যে সায়ীদ ইবন মুসায়্যাব, আল-হাসান, আতা ও কাতাদাহ্ প্রমুখ এ মত গ্রহণ করেছেন। আর এটাই হল ইমাম মালিক, সাওরী, আওযা'য়ী', শাফে'য়ী, ইসহাক, আবূ সাওর ও 'আসহাবুর রায়' সম্প্রদায়ের মাযহাব। অপরপক্ষে ইবনুয্ যুবায়রের সিদ্ধান্ত ছিল—দিয়ত নেয়া। পরবর্তীদের মধ্যে আয-যুহরী, ইবন সীরীন, 'রাবীয়াতুর রায়, দাউদ, ইবনুল মুনযিরের মতও তাই ছিল। ইমাম আহমদ থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তাঁদের মতভিন্নতার কারণ হল, একাধিক ব্যক্তি মিলে কাউকে হত্যা করার ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেনি। ফলে এর কোন সমাধান প্রত্যক্ষভাবে কুরআনে বা হাদীসে নেই।

■ কিয়াস-ভিত্তিক মতভেদের প্রকারভেদ

কিয়াস-ভিত্তিক মতভেদ মৌলিকভাবে দুই প্রকার : (ক) কিয়াসকে শরী'আতের দলীলরূপে স্বীকার করা না করা সংক্রান্ত মতভেদ এবং (খ) কিয়াসকে যারা শার'য়ী দলীলে মর্যাদা দেন তাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতভেদ।

---

২৫৮. বুখারী, হাদীস নং ৬৮৯৬।

www.waytojannah.com

Contents

■ 'কিয়াস' কি শার'য়ী দলীলের মর্যাদা রাখে?

সংখ্যাগরিষ্ঠ (জমহুর) ফুকাহায়ে কিরামের মতে কিয়াস শরী'আতের চতুর্থ দলীল কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা কিয়াসের এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যাহেরী মতের অনুসারীগণ কিয়াসের এ মর্যাদা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা-এ তিনটিই শরী'আতের দলীল। এর বাইরে অন্য কিছুর অনুসরণ শরী'আতে নিষিদ্ধ। উভয় মতের যুক্তি-প্রমাণ এখানে দেয়ার সুযোগ নেই।[২৫৯] তবে এটা সত্যি যে, কিয়াস অত্যাবশ্যক বিষয়। নাম অস্বীকার করলেও বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

কিয়াস সংক্রান্ত মতভেদ কেবল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শরী'আতের বহু শাখাগত বিষয়েও এর প্রভাব পড়েছে। কেননা এমন বহু বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাতে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, তবে কুরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত বিধিবিধানের কারণ (علة) অনুসন্ধান করলে সেসব বিষয়ের মধ্যেও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা কিয়াসকে স্বীকার করেন, তাঁরা সেই 'কারণ'-এর ভিত্তিতে সেসব বিষয়কেও কুরআন-সুন্নায় প্রদত্ত হুকুমের আওতায় আনয়ন করেন। পক্ষান্তরে যারা কিয়াসকে দলীলের মর্যাদা দিতে নারাজ তাঁরা সেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নার যে হুকুম রয়েছে, তা সম্প্রসারিত করেন না। এভাবে বহু মাসাইলে ইখতিলাফের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এক হাদীসে এসেছে,

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد اواستزاد فقد ارعى الاخذ والمعطى فيه سواء ·

"সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ বিক্রি করবে সমান সমান মাপে ও নগদ নগদ। যদি কেউ বেশি দেয় বা বেশি চায় তবে সে সুদে লিপ্ত হবে-গ্রহিতা ও দাতা তাতে সমান [গুনাহ্গার] হবে।"[২৬০]

এ হাদীসে ছয় জাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, এর যে কোনটিকে সমজাতীয় দ্রব্যের বদলে বিক্রি করতে হলে উভয় দিকের পরিমাণ সমান হবে-কমবেশি করা যাবে না। কমবেশি করলে সুদ হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাদীসের এ বিধান কি এই ছয়টি দ্রব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, না অন্যান্য দ্রব্যেও সম্প্রসারিত হবে?

---

২৫৯. উভয় মতের যুক্তি-প্রমাণ উসূলুল ফিকহ বিষয়ের গ্রন্থাবলীতে দেখা যেতে পারে। যেমন, আলাউদ্দীন আল-বুখারী, কাশফুল আসরার, ৩/২৭০; ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, পৃ. ১২, ৫৬।

২৬০. মুসলিম, হাদীস নং ১৫৮৪; নাসায়ী, হাদীস নং ৪৫৬৫; মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪৯।

www.waytojannah.com

ইমাম আবূ হানিফা, মালিক, শাফে'য়ী, আহমাদ রাহেমাহুমুল্লাহ-সহ উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ হাদীসটির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং আপন আপন গবেষণার আলোকে বিধানটির কারণ খুঁজে দেখেছেন। পরিশেষে তারা যে যেই কারণ নিরূপণ করেছেন অন্যান্য যে সকল দ্রব্যে সে কারণ দেখতে পেয়েছেন সে সকল দ্রব্যেও হাদীসটির বিধান প্রযোজ্য বলে রায় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কারণ নির্ণয়ে মতভেদ ঘটলেও এ বিষয়ে তারা একমত যে হাদীসটির হুকুম ছয়টি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কারণের ভিত্তিতে বিধানটি প্রদত্ত হয়েছে সে কারণ যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেও একই রকমের হুকুম সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং ইমাম আবূ হানিফার মতে হাদীসটিতে প্রদত্ত বিধানের কারণ হচ্ছে 'জিন্‌স' (সমজাতীয়) ও 'কাদর' (ওজন বা পাত্র দ্বারা পরিমাণ) এ কারণ যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই হাদীসটির বিধান প্রযোজ্য হবে। কাজেই চালের বদলে চাল বা ডালের বদলে ডাল বিক্রি করলে সেখানেও পরিমাপ সমান সমান হওয়া শর্ত। কমবেশি করলে সুদ হবে।[২৬১]

ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম মালিক ও আহমাদ ইবন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহও এভাবে আপন আপন নির্ণিত কারণ অনুযায়ী হাদীসের হুকুমে আরও বহু দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করেন।[২৬২] কিন্তু ইমাম ইবন হায্‌ম যাহেরী রাহেমাহুল্লাহ তার সমমতের ফুকাহায়ে কিরাম হাদীসে বর্ণিত ছয়টি দ্রব্যের বাইরে হাদীসের হুকুম প্রয়োগ করেন না। তাদের সাফ কথা -কিয়াস বলতে কিছু নেই। কাজেই হাদীসে বর্ণিত বিধানের কারণ নিরূপণ করে তার ভিত্তিতে অন্যত্র হাদীসের বিধান প্রয়োগ করা যাবে না; বরং এ বিধান হাদীসে বর্ণিত দ্রব্যগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[২৬৩]

▪ হুকুমের কারণ (ইল্লাত) নির্ণয়ে মতভেদ ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

উপরের আলোচনা হতে পরিষ্কার হয়েছে যে, সংখ্যগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরাম কিয়াসকে শরী'আতের দলীলরূপে স্বীকার করেন। কিয়াস মানে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত বিধানের কারণ (ইল্লাত)-এর ভিত্তিতে একই বিধান অন্যত্র জারি করা। অনেক সময় ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এই নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় যে, কুরআন বা হাদীসে যে বিষয়ে কোন বিধান দেওয়া হয়েছে তাতে সে বিধানের কারণ (ইল্লাত) কি? এক

---

২৬১. মারগিনানী, হিদায়াহ, ৩/৬১; ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ৭/৪-৫; কাসানী, বাদায়ে'উস সানায়ে'উ, ৫/১৮৪।

২৬২. আন-নাওয়াবী, আল-মাজমূ', ৯/৩৯৩-৪০০; ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ৪/৫; ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৯৬-৯৭।

২৬৩. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৯৭।

www.waytojannah.com

ফকীহ্ কোনও একটি বিষয়কে 'কারণ' মনে করেন, তো অন্য ফকীহের দৃষ্টিতে কারণ সেটি নয়, বরং অন্য একটি। এর ফলে তাদের কিয়াসভিত্তিক রায়ের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়। কেননা এক ফকীহের নিরূপিত কারণ (ইল্লাত) যে সকল বিষয়ে বিদ্যমান থাকে তাতে অন্য ফকীহের নিরূপিত কারণ (ইল্লাত) উপস্থিত নাও থাকতে পারে। ফলে সেই ফকীহ্ তো সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াত বা হাদীসের বিধান প্রয়োগ করবেন। কিন্তু অপর ফকীহের দৃষ্টিতে তাতে সে বিধান জারি হতে পারে না। কেননা তিনি যে বিধানের অন্য কোন কারণ (ইল্লাত) খুঁজে পেয়েছেন, উল্লিখিত বিষয়ে সে কারণ অনুপস্থিত। কাজেই বিধানটিও তাতে প্রযুক্ত হবে না। কিয়াসভিত্তিক বহু ফিকহী মাসাইলে এ জাতীয় মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। উপরে বর্ণিত সুদ সংক্রান্ত হাদীসটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত ছয়টি দ্রব্যে সুদের কারণ আসলে কি এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম তো 'জিন্স' (সমজাতীয়) ও 'কাদর' (ওজন পাত্র দ্বারা পরিমাপ)-কে 'কারণ' মনে করেন। কিন্তু ইমাম মালিক, শাফে'য়ী ও আহমাদ রাহেমাহুমুল্লাহ সোনা ও রূপাকে অপর চারটি থেকে আলাদা করেছেন। তাদের মতে সোনা রূপার মধ্যে সুদের কারণ হচ্ছে (ثمنية) 'সামানিয়্যা' (সৃষ্টিগতভাবে বিনিময় মাধ্যম হওয়া)। ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ হতে ভিন্ন মতও আছে। বাকি চারটি দ্রব্য সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকের মত স্বতন্ত্র।

ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহর মতে খেজুর, গম, যব ও লবণের মাঝে সুদের কারণ হচ্ছে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় এমন খাদ্যদ্রব্য হওয়া যা মজুদ করে রাখা যায়। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহর মতে এতে সুদের কারণ হচ্ছে 'খাদ্যবস্তু হওয়া'। আর ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহর মতে এমন খাদ্যবস্তু হওয়া, যা ওজন করে বা বিশেষ পাত্র দ্বারা মেপে লেনদেন করা হয়।

সমজাতীয় দ্রব্যে সুদের কারণ (ইল্লাত) সম্পর্কে কিয়াসপন্থিদের উপরিউক্ত ইখতিলাফের ভিত্তিতে দ্রব্যসামগ্রীকে চারভাগে ভাগ করা যায়:

ক. হাদীসে বর্ণিত খাদ্যদ্রব্যসমূহ যার প্রতিটি সমজাতীয় দ্রব্যের বদলে কমবেশি করে বিক্রি করলে সর্বসম্মতিক্রমেই সুদ হবে।

খ. যেসব খাদ্যদ্রব্য মজুদ করা যায় এবং তা ওজন করে বা বিশেষ পাত্র দ্বারা মেপে বিক্রি করা হয়, তাতেও সুদের বিধান প্রযোজ্য এবং এক্ষেত্রেও যেমন মতভেদ নেই, যেমন চাল, ডাল প্রভৃতি।

গ. যদি খাদ্যদ্রব্য না হয় এবং তার লেনদেন ওজনে বা বিশেষ পাত্র দ্বারা মেপে না হয় তবে এক্ষেত্রে সকলে একমত যে, এরূপ দ্রব্য সমজাতীয় দ্রব্যের বদলে কমবেশি করে বিক্রি করলেও সুদ হবে না, যেমন বস্ত্র, তৈজসপত্র প্রভৃতি।

www.waytojannah.com

ঘ. উপরিউক্ত তিন প্রকার ব্যতীত অপরাপর দ্রব্য। হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, খাদ্যদ্রব্য হোক বা নাই হোক যে কোন দ্রব্যকে সমজাতীয় দ্রব্যের বদলে যদি কমবেশি করে বিক্রি করা হয় এবং তা ওজনী দ্রব্য বা বিশেষ পাত্র দ্বারা পরিমাপযোগ্য দ্রব্য হয় তবে তাতে সুদ হবে। সুতরাং তাঁদের মতে লোহা, সিমেন্ট প্রভৃতির ক্ষেত্রেও হাদীসে বর্ণিত সুদের বিধান প্রযোজ্য হবে।[২৬৪] কিন্তু মালিকী, শাফে'য়ী ও হাম্বলী এ তিন মাযহাবে এসব বস্তু সুদী মালামালের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যেহেতু তাদের নিরূপিত সুদের 'কারণ' এ সবের মধ্যে পাওয়া যায় না।[২৬৫]

প্রধানত জীবন ধারণের উপায় নয়-এ জাতীয় ফলমূলে মালিকী মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী সুদের বিধান জারি হবে না। এমনিভাবে ঔষধেও নয়। শাফে'য়ী মাযহাব অনুযায়ী এসবের ক্ষেত্রে সুদের বিধান কার্যকর হবে, যেহেতু এ মাযহাবে নিরূপিত সুদের কারণ এগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান।[২৬৬]

ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহর নির্ণিত কারণ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যে সুদের বিধান প্রযোজ্য নয়। আবার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যেগুলো ওজন বা পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট পাত্র দ্বারা মেপে বিক্রি করা হয় না, তাতেও সুদ আসে না, যেমন ডিম, কলা প্রভৃতি। এসবে হানাফী মাযহাবেও সুদ প্রযোজ্য হয় না, কিন্তু হাম্বলীর সঙ্গে এ মাযহাবের পার্থক্য এই যে, খাদ্যদ্রব্য নয় এমন দ্রব্য যদি ওজনে বিক্রি হয়, তা সমজাতীয় দ্রব্যের বদলে কমবেশি করে বিক্রি করলে হানাফী মাযহাবে সুদ হয় কিন্তু হাম্বলী মাযহাবে সেটা সুদ নয়।[২৬৭]

▪ শরী'আতের কোন কোন বিধান মা'কূলাতুল মা'না ওয়া গাইরে মা'কূলাতিল মা'না নির্ধারণ নিয়ে ইখতিলাফ ও ফিকহী মাসআলায় এর প্রভাব

কোন মাসআলায় শরীআত যে বিধান দিয়েছে তার কারণ বা ইল্লত নির্ধারণের পূর্বশর্ত হচ্ছে এটা জানা যে, এ বিধানটির কারণ মানুষের বোধগম্য কি না? যদি বোধগম্য হয় তবে তাতে কিয়াস প্রযোজ্য হতে পারে। আর যদি বিধানটির কারণ মানুষের বোধগম্য না হয়ে 'তা'আব্বুদী' বা 'বান্দা হিসেবে আল্লাহর নির্দেশ মানতে বাধ্য' এ রকমের কোন বিধান হয় তখন তাতে কোন কিয়াস খাটবে না বরং যেভাবে আল্লাহ্ ও তার রাসূল থেকে এসেছে সেভাবে তাকে রাখতে হবে। তার উপর কোন কিছু কিয়াস করা যাবে না।

---

২৬৪. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ৭/৫-৬।

২৬৫. মুস্তফা সা'য়ীদ আল-খিন্ন, আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাও'য়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ৫০৩।

২৬৬. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৯৮।

২৬৭ মুস্তাফা সা'য়ীদ আল-খিন্ন, আসারুল ইখতিলাফ, পৃ. ৫০৩; ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৯৮।

www.waytojannah.com

এর উদাহরণ হচ্ছে, ওযুতে নিয়্যতের মাসআলা। যদি ওযুকে শুধু আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে ধরা হয়, অর্থাৎ এটা বলা হয় যে, ওযুতে হাত মুখ ধোয়ার মধ্যে তেমন কোন উদ্দেশ্য আমাদের বোধগম্য নয়, তবে সেটাতে নিয়্যত জরুরী, যেমন সালাত পড়তে নিয়্যত জরুরী। পক্ষান্তরে যদি এটার অর্থ জানা যায় ও কারণ নির্ণয় করা যায় এবং এটাকে বোধগম্য বলা হয়, তখন তাতে নিয়্যতের প্রয়োজন পড়ে না। যেমন, নাপাকি ধোয়ার মাসআলায় নিয়্যত লাগে না।[২৬৮]

শরী'আতের এ রকম অনেক বিষয় আছে যেগুলোতে মা'কুলাতুল মা'না বা গাইরে মা'কুলাতিল মা'না নির্ধারণের মতভেদ ফিকহী মাসআলায় মতভেদ ঘটিয়েছে।

ছয়. অন্যান্য (মতভেদপূর্ণ) দলীল ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

উপরে বর্ণিত কারণসমূহের প্রায় সব কয়টিই এমন দলীলের সাথে সম্পৃক্ত, যেগুলো ইসলামী শরী'আতের উৎস হিসেবে স্বীকৃত। একমাত্র কিয়াস ব্যতীত যার বিরোধিতা কেবল যাহেরী মাযহাবের লোকেরাই করেছে, চার মাযহাবের কেউ বিরোধিতা করে নি। সে হিসেবে পূর্বে বর্ণিত মতভেদের কারণসমূহ শরী'আতের উৎস হিসেবে বিবেচিত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসভিত্তিক ছিল। আর যেহেতু এগুলো শরী'আতের উৎস হিসেবে স্বীকৃত, তাই সেগুলোতে মতভেদ সবার জন্যই প্রযোজ্য।

কিন্তু এ ছাড়াও শরী'আতের আরও কিছু মতভেদপূর্ণ উৎস বা দলীল রয়েছে যেগুলোর সাব্যস্তকরণ ও প্রয়োগ এ দু'টির মধ্যেই মতভেদ ঘটেছে। যার প্রভাব পড়েছে ফিকহী ইখতিলাফে। যেমনঃ

▪ আল-ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) সম্পর্কে মতভেদ ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

যে ইল্লাত (কারণ)-এর ভিত্তিতে কিয়াস করা হয় তথা কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত বিধানকে অন্যত্র প্রয়োগ করা হয়, সে ইল্লাত কখনও স্থুল হয় আবার কখনও সূক্ষ্ম হয়। একই বিষয়ের মধ্যেও অনেক সময় স্থুল ও সূক্ষ্ম উভয় রকমের কারণ বিদ্যমান থাকে। সাধারণভাবে ফুকাহায়ে কিরাম স্থুল কারণের ভিত্তিতেই কিয়াস করেন। কিন্তু হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম কারণের কার্যকারিতা (আছর) বিবেচনা করতে ক্ষেত্র বিশেষে সূক্ষ্ম কারণকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এই সূক্ষ্ম কারণের ভিত্তিতে কিয়াস করাকেই পরিভাষায় 'ইসতিহ্সান' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা কিয়াসেরই একটি ভাগ; কিয়াস বহির্ভূত বিষয় নয়। বিষয়টা উপলব্ধি করতে না পারার দরুন কেউ কেউ ইমাম আবু হানিফা রাহেমাহুল্লাহর উপর অভিযোগ তুলেছেন যে তিনি শরী'আতের চার দলীলের

---

২৬৮. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/৩০।

www.waytojannah.com

বাইরে আরও একটি বিষয়কে দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহও ইসতিহসানকে স্বীকার করেছেন। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ ইসতিহ্সানকে দলীলরূপে স্বীকার করেন না।[২৬৯] এর ফলেও কোনও কোনও ফিকহী মাসাইলে মতভেদ দেখা দিয়েছে। যেমন—

হিংস্র পাখীর এঁটো (উচ্ছিষ্ট) পাক, কি নাপাক এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। মতভেদ এ কারণে যে, এ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে কিছু নেই। ফলে বিষয়টা নিষ্পত্তি করতে হয়েছে কিয়াসের মাধ্যমে। এর কিয়াস চলে হিংস্র পশুর সঙ্গে। কেননা হিংস্র পশুর মতো এর গোশতও হারাম। হিংস্র পশুর এঁটো নাপাক। কেননা এঁটোতে তার লালা মিশ্রিত হয়। আর লালা যেহেতু হারাম গোশত হতে নিঃসৃত, তাই লালা নাপাক এবং সে লালা যা কিছুতে লেগে যায় তাও নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং হিংস্র পাখির গোশতও যেহেতু হারাম সেহেতু তার লালাও নাপাক এবং এঁটোতে তা লেগে যায় বলে তার এঁটোও যে নাপাক হবে এটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু এর বিপরীত একটা যুক্তিও আছে। পাখির চঞ্চু কেবলই হাড়। আর জীবিত-মৃত সব প্রাণীর হাড়ই পাক। কাজেই এঁটোতে যেহেতু কেবলই পাক হাড়ের ছোঁয়া লাগে তাই তা নাপাক হওয়ার কোন কারণ নেই। এই সূক্ষ্ম কিয়াস তথা ইসতিহ্সানের ভিত্তিতেই হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের মতে হিংস্র পাখির এঁটো পবিত্র। যাঁরা ইসতিহ্সানকে স্বীকার করেন না, তাঁরা উপরে বর্ণিত স্থূল কিয়াসের অবলম্বনে একে অপবিত্র মনে করেন।[২৭০]

■ আল-মাসালিহুল-মুরসালাহ্ সম্পর্কে মতভেদ ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

মাসালিহে মুরসালাহ অর্থাৎ আম জনগণের এমন কল্যাণকর বা ক্ষতিকারক বিষয়, যে সম্পর্কে শরী'আতে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই। সেই কল্যাণ বা ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় এনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে কি? বর্তমানে এ প্রয়োগ অনেকভাবে হচ্ছে। এর এক উদাহরণ হচ্ছে, যদি কাফেররা কিছু মুসলিমকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করে তখন যেসব মুসলিমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করে কাফেরদের হত্যা করা যাবে কিনা?

এ ব্যাপারে ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ ইতিবাচক মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে এটা যদি নিষিদ্ধ হয় তবে সুযোগ বুঝে কাফেররা মুসলিমদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে থাকবে। আর মুসলিমরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হবে না।

২৬৯. মোল্লা জিউন, নুরুল আনওয়ার, পৃ. ২৪৮; জাসসাস, আল-ফুসূল ফিল উসূল, ২/২৩৯-২৫০।

২৭০. উসুলুল বাযদাবী, কাশফুল আসরারসহ, ৪/৭-৮।

www.waytojannah.com

পক্ষান্তরে অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরাম এখানে নেতিবাচক মত দিয়েছেন। কারণ, এভাবে মুসলিমদের হত্যা করার কোন যুক্তি নেই। বরং মুসলিমদের এ ব্যাপারে অন্য কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে।

■ 'ইসতিসহাবুল আসল বা হাল' সম্পর্কে মতভেদ ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

অর্থাৎ কোন বিষয়ের বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে যুক্ত করে অতীতের বিধানকে বর্তমান অবস্থায়ও কার্যকর মনে করা হবে কি?

শাফে'য়ী মাযহাবের ফকীহগণ এটার উপর আমল করেছেন। এর ভিত্তিতে তাঁরা বলেন, কেউ যদি হারিয়ে যায় আর তার মৃত্যু বা জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা না যায় তবে তার জীবন আছে বলেই ধরে নিতে হবে। কেননা, সে যে জীবিত ছিল সেটাকে মূল ধরে নিতে হবে, যতক্ষণ না এর বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হবে। সুতরাং তার স্ত্রী তারই থাকবে। তার সম্পদ তার জন্য অবশিষ্ট রাখা হবে, সে অন্যদের ওয়ারিস হবে।

অন্যান্য ইমাম এর বিরোধিতা করে বলেন, এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার জীবনের মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে। যে সময়ের মধ্যে তার স্ত্রী তারই থাকবে, তার সম্পদ সংরক্ষিত থাকবে, সে অন্যদের ওয়ারিস হবে। কিন্তু সে সময় শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার স্ত্রী বৈধব্য বরণ করবে, তার সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। এবং সে আর ওয়ারিস হবে না বরং অন্যদেরকে ওয়ারিস করবে। যদিও এ মেয়াদ নির্ধারণ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে।[২৭১]

■ 'শার'উ মান কাবলানা' সম্পর্কে মতভেদ ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

'শার'উ মান কাবলানা' বা পূর্বের নবী-রাসূলগণের আনীত শরী'আতের যেসব বিষয় রহিত হয়ে যায়নি বর্তমানেও কি তা বলবৎ আছে?

এ ব্যাপারে আলিমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁদের এ মতভেদের কারণে ফিকহী মাসআলাতেও মতভেদ ঘটেছে। যেমন, কুর'আ বা লটারী করে কোন একটি অংশ নির্ধারণের মাসআলা। পবিত্র কুরআনে ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যাপারে লটারীর কথা আছে। তার উপর ভিত্তি করে লটারী করাকে হাম্বলীগণ জায়েয মনে করেন। তবে এ ব্যাপারে হানাফীগণ বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে থাকেন।

অনুরূপভাবে কেউ একশত ঘা দেয়ার শপথ করলে সে কী একশটি বেত একত্র করে এক ঘা দিলে যথেষ্ট হবে? যেমনটি আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম তার স্ত্রীর ব্যাপারে করেছিলেন? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।

---

২৭১. আলে সাবালেক, আহমাদ মানসূর, ফাতহুল ওহহাব ফী বয়ানে মাহিয়্যাতিল ফিকহিল মুকারিন লিত তুল্যাব, পৃ. ৯৫-৯৬।

www.waytojannah.com

অনুরূপভাবে কেউ তার সন্তানকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যবাই করার মানত করার বিধান কি? কারও নিকট সেটা মানতই হবে না। আবার কারও নিকট মানত হবে এবং সে একটি ভেড়া-ছাগল যবাই করবে। যেমনটি ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম করেছিলেন।[২৭২]

▪ 'আল-উরফ' সম্পর্কে মতভেদ ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

'আল-'উরফ' বা জনগণের মধ্যে কোন কাজ ব্যাপকভাবে চালু থাকলে তা কি বৈধ বলে বিবেচিত হবে? এ ব্যাপারে আলিমগণের মন্তব্য হলো যে, যদি কোথাও জনগণের মধ্যে কোন কাজ চালু থাকে তবে যদি সেটা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী না হয় তবে তা গ্রহণ করা যাবে। যেমন, কোন বাড়ি বিক্রি করা হলে তার দেয়ালে যদি কোন সম্পদ গচ্ছিত আছে কি না সেটা জানা না যায়, অথবা কোন গাছ বিক্রি করা হলে তার শিকড় কতদূর গেছে সেটা জানা না যায় এমতাবস্থায় এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি না?

তাছাড়া কোন কিছু তৈরি করে দেয়ার জন্য কাউকে টাকা দেয়া। যেমন বর্তমানে ফ্যাক্টরী মালিকদের সাথে ক্রেতা বিভিন্ন গুণাগুণের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করে থাকে, অথচ বস্তুটি এখনও তৈরিই হয়নি।

এ সমস্ত মাসআলায় ইখতিলাফের ভিত্তি হচ্ছে চারটি বিষয়ে :

ক. কোন্‌টি উরফ হিসেবে স্বীকৃত সেটা নির্ণয়ে;

খ. কোন্‌টি কোনটি উরফ দ্বারা সমর্থিত তা নির্ণয়ে;

গ. কোন্ উরফটি খাস নয় বরং আম সেটা নির্ণয়ে;

ঘ. অনুরূপভাবে কোন্‌টি শরীয়তের বিরোধী হচ্ছে না সেটা নির্ধারণে।

নতুবা মূল কাজটি জায়েয হবার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। এজন্যই আলিমগণ বলেন, العادة كالشرع مالم يخالف الشرع "দেশজ প্রচলিত নিয়ম শরী'আতের নিয়মের মতই যতক্ষণ তা শরী'আতের বিরোধী না হয়।" তারপরও যদি চুক্তিতে আবদ্ধ দু'জনের মধ্যে স্পষ্টতই বলে দেয় যে, এটা সাধারণ প্রচলিত নিয়মের বিপরীত কাজ তাহলে সেখানে প্রচলিত উরফ কাজে আসবে না।[২৭৩]

▪ 'আকওয়ালুস সাহাবাহ' সম্পর্কে মতভেদ ও ফিকহী ইখতিলাফে এর প্রভাব

বা সাহাবায়ে কিরামের উক্তিও কি দলীলরূপে গৃহীত হবে?

---

২৭২. তুরকী, আব্দুল্লাহ আবদুল মুহসিন, উসূলি মাযহাবি ইমাম আহমাদ, পৃ. ৫৪১-৫৫৬।

২৭৩. মুস্তফা আহমাদ আয-যারকা, আল-মাদখালুল ফিকহী আল-আম, ২/৮৭৫।

www.waytojannah.com

একথা স্বীকৃত যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই ফকীহ ছিলেন, যেমন, উমর, আলী, আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা দলীল গ্রহণের পাশাপাশি তাঁরা নিজেরাও ইজতিহাদ করে বিভিন্ন মাসআলায় মতামত প্রদান করেছেন। তাঁদের এ সমস্ত ফতোয়ার বিপরীতে যদি কোন কিছু তাঁদের সময়ে শ্রুত না হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় তাঁদের এ সমস্ত মতামত কি গ্রহণ করা হবে? এ নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে, যার উপর ফিকহী ইখতিলাফ তৈরি হয়েছে।

অধিকাংশ ফুকাহার মতে, তাদের কথা দলীল হিসেবে গ্রাহ্য হবে। সেটা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যাহেরী মাযহাবের আলিমদের নিকট তাদের কথামত আমল করা ওয়াজিব নয়। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথার পাশাপাশি আর কারও কথা আসতে পারে না।

এ ধরনের একটি মাসআলা হচ্ছে, বাঁদী বা দাসীর ইদ্দত কতদিন? উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের ইদ্দত দুই কুরু সাব্যস্ত করেছেন। আর এটাই চার মাযহাবের ইমামগণ সহ অনেকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যাহেরী মাযহাবের আলিমগণ সেটা গ্রহণ করেননি। তারা বাঁদী বা দাসীর ইদ্দতও তিন কুরু সাব্যস্ত করেন।

অনুরূপভাবে একই বৈঠকে কেউ স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে কি তিন তালাকই ধর্তব্য হবে? এ ব্যাপারে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তিন তালাকই পতিত হবে বলে মত প্রদান করেছেন। আর অধিকাংশ ফুকাহা বিশেষ করে চার মাযহাবের ইমামগণ এটাকে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে যাহেরী মাযহাবের কোন কোন ইমাম এতে ভিন্নমত হয়েছেন। তাদের মতে এর মাধ্যমে এক তালাক পতিত হবে।

এরকমের আরও কিছু বিষয় আছে যে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, যদ্দরুন এতদসংক্রান্ত ফিকহী মাসাইলে তাঁদের রায়ে পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

মোদ্দাকথা, ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ অহেতুক নয়; মজবুত বুনিয়াদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত। একই বিষয়ে বিভিন্ন ফকীহ্ যে বিভিন্ন রায় দিয়েছেন, সেটাতে প্রত্যেকে আপন-আপন দলীল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে পূর্ণ ব্যুৎপত্তির সঙ্গে যখন ফয়সালা দিয়েছেন, তখন তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরের আলোচনা দ্বারাই বোঝা যায় যে, এ দাবি কতটা বাস্তব। কাজেই ফিকহী ইখতিলাফকে অবাঞ্ছিত বোঝা মনে না করে এর যথার্থ মূল্যায়ন করা উচিত। বস্তুত আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মতবিরোধ ইসলামী ফিকহের একক বৈশিষ্ট্য এবং এটা জ্ঞান জগতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।[২৭৪]

২৭৪. ইফাবা, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৬২৫। মূলত মতভেদের কারণ সম্পর্কে গবেষণায় ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন গ্রন্থের ৫৪৫-৬২৬ পৃষ্ঠা থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

www.waytojannah.com

তুলনামূলক ফিকহ

তুলনামূলক ফিক্হ-এর সংজ্ঞা

'তুলনামূলক ফিক্হ' কথাটি বলতে বোঝায়, ফিকহের কোন অংশকে অপর কোন অংশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া।

পারিভাষিকভাবে তুলনামূলক ফিকহ বলতে বোঝায় :

جمع اراء المجتهدين مع ادلتها فى المسألة الواحدة المختلفة فيها ومقابلة هذه الأدلة بعضها ببعض ليظهر بعد مناقشتها ايها اقوى دليلاً .

"কোন একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় মুজতাহিদগণের মতামতকে তাদের দলীল-প্রমাণাদিসহ একত্রে উল্লেখ করে সে সমস্ত মত ও দলীলকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানো, যাতে বিশ্লেষণ করে এর মধ্যকার কোন্ মতটি দলীল-প্রমাণের দিক থেকে বেশি শক্তিশালী তা নির্ণয় করা যায়"।

কোন কোন আলিম বলেন,

الفقه الذى يجمع فيه بين أقوال الأئمة وادالتها ومقابلة بعضها ببعض .

"যে ফিক্হ ইমামদের বিভিন্ন উক্তি ও তাদের দলীল-প্রমাণাদি জমা করে এবং সেগুলোকে পরস্পর মুখোমুখি করে তাই 'ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ।

কারও কারও মতে,

هو جمع أقوال العلماء المختلفة فى الحكم الشرعى للمسألة الواحدة الفرعية مع ادلتها ومقابلة بعضها ببعض ثم مناقشتها مناقشة عليه ليظهر بعد ذلك أى الأقوال اقوى دليلا وأقربها تمشيا مع قواعد الشريعة حتى يكون هو الأرجح .

'তুলনামূলক ফিকহ হচ্ছে শাখা-প্রশাখাজনিত কোন একটি মাসআলাতে আলিমদের মতবিরোধপূর্ণ মতামতকে দলীল-প্রমাণাদিসহ উল্লেখ করে সেগুলোকে একটি অপরটির সামনে দাঁড় করানো। তারপর সেগুলোর জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে যে মতটি দলীলের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও শরী'আতের নীতিমালার সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটাকে প্রাধান্য দেয়া।'[২৭৫]

২৭৫. ড. আহমাদ ইবনে মানসূর আল-সাবালেক, ফাতহুল ওহহাব ফী বয়ানে মাহিয়াতিল ফিকহিল মুকারিন লিত-তুল্লাব, পৃ. ১২।

www.waytojannah.com

পক্ষান্তরে কোন মাযহাবের ফিক্হ জানার অর্থ, সে মাযহাবের ইমাম কর্তৃক কোন মাসআলার বিধি-বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবলম্বনকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এটাকে 'মাযহাবী ফিক্হ' বলা হয়। সাধারণত মাযহাবী ফিকহের আলোচনায় অপর মাযহাবের আলোচনা বা অপর মাযহাবের দলীল-প্রমাণাদির অবতারণা করা হয় না। যদি কোথাও আলোচনা হয় তবে তা হয় বিশেষ কোন কারণে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলীল ব্যতীতই তা উল্লেখ করা হয়। আবার কখনও কখনও অন্য মাযহাবের দুর্বল দলীলসমূহই উল্লেখ করা হয়, যাতে সেগুলোকে খণ্ডন করা সহজ হয়। মূলত 'মাযহাবী ফিকহ' আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই থাকে নিজের মাযহাবের প্রতিষ্ঠা, নিজের দাবির প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনার বাইরে যাবতীয় দলীল-প্রমাণের সমাহার ঘটানো। আবার কখনও কখনও 'মাযহাবী ফিক্হ'-এর আলোচনায় দলীল-প্রমাণাদির কোন উল্লেখই থাকে না।

তুলনামূলক ফিকহ-এর বিষয়বস্তু

তুলনামূলক ফিক্হ বিষয়ের উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে আমরা কোন বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করব বা তুলনামূলক ফিকহ এর বিষয়বস্তু কি হবে। মূলত তুলনামূলক ফিক্হ-এর বিষয় হচ্ছে,

المسائل الفرعية المختلف فيها بين علماء الشريعة من أئمة المذاهب وغيرهم ممن سبقهم أو لحقهم من المجتهدين .

"ঐ সমস্ত শাখা-প্রশাখাজনিত মাসআলাসমূহ যেগুলোতে মাযহাবের ইমাম ও তাদের মত তাদের আগে যারা চলে গেছে বা তাদের সাথে পরবর্তীতে যোগ হয়েছে এরকম মুজতাহিদদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে এমন বিষয়গুলোই হচ্ছে তুলনামূলক ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয়।"

কারণ, পূর্বের ও পরের অনেক আলিমই বিভিন্ন মাসআলায় মতভেদ করেছেন। তাঁদের সেসব মত দলীল-প্রমাণাদি অথবা একই দলীলে যদি বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকে সেগুলোতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিসহ আমাদের কাছে সেগুলোতে এসে পৌঁছেছে।

যেমন, ওযুতে নিয়্যত ফরয কি না এ ব্যাপারে মতভেদ ঘটেছে। কোন কোন ইমাম যেমন হানাফী আলিমগণ এটাকে ওযুর ফরয হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাদের দলীল হলো :

১. এটা কুরআনে বর্ণিত হয়নি।

২. ওযু সালাতের একটি শর্ত। এটাকে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপর কিয়াস করা যেতে পারে।

৩. সুতরাং যেভাবে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিয়্যত ফরয নয়, সেভাবে ওযুর জন্যও নিয়্যত ফরয নয়।

পক্ষান্তরে অন্যান্য আলিমের মতে, ওযুতে নিয়্যত করা এমনই একটি ফরয যে, যদি কেউ এটা বাদে ওযু করে তবে তার সে ওযু সহীহ্ হবে না। তার দ্বারা সালাত আদায় করলে সে সালাতও শুদ্ধ হবে না। তারা তাদের মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত দলীলাদি পেশ করে থাকেন :

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস "إنما الأعمال بالنيات"[২৭৬] ("প্রতিটি কাজ নির্ভর করে নিয়্যতের উপর") এটাকে পেশ করেন। এ হাদীস স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করে যে, প্রতিটি কাজেরই নিয়্যত লাগবে। আর ওযু একটি কাজ; সুতরাং নিয়্যত ওযুর একটি রুকন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২. ওযু হচ্ছে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের একটি উপায়, যা না থাকলে সালাতই শুদ্ধ হয় না। সুতরাং এটা তায়াম্মুমের মত। যখন তায়াম্মুমের প্রয়োজন হয় তখন কেউ যদি তায়াম্মুম না করে তার সালাতই শুদ্ধ হবে না। আর তায়াম্মুমের ব্যাপারে সবাই একমত যে, তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়্যত আবশ্যক। সুতরাং ওযুর ক্ষেত্রেই তা-ই হবে।

অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, সালাতে সূরায়ে ফাতিহা ফরয কি না? এ মাসআলাতে অনেক ইমামের মত হচ্ছে যে, সূরায়ে ফাতিহা সালাতের একটি ফরয, যা না পড়লে সালাতই শুদ্ধ হবে না। তাদের দলীল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[২৭৭] (যে সূরায়ে ফাতিহা পড়বে না তার সালাতই নেই)। অনুরূপ আরও কিছু হাদীস রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাত শুদ্ধ হতে হলে সূরায়ে ফাতিহা অবশ্যই লাগবে। পক্ষান্তরে অপর কিছু ইমাম, বিশেষ করে হানাফী আলিমদের মতে, সূরায়ে ফাতিহা সালাতে না পড়লে সালাত শুদ্ধ হবে না এ ধরনের ফরয নয়। বরং এটি ব্যতীতও সালাত শুদ্ধ হবে। কুরআনের যে কোন অংশ পড়লেই সালাত শুদ্ধ হবে। তারা তাদের মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে, فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[২৭৮] "সুতরাং যতটুকু সম্ভব কুরআন থেকে পাঠ কর" এটাকে পেশ করে থাকেন। যদিও সূরায়ে ফাতিহা ত্যাগকারী তাদের নিকটও অন্যায়কারী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার সালাত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ ছাড়াও তাদের মতের সপক্ষে আরও দলীল-প্রমাণাদি তারা পেশ করে থাকেন। এ জাতীয় মাসআলাগুলোতে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের কারণে মতপার্থক্য ঘটেছিল।

---

২৭৬. বুখারী, হাদীস নং ১; মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

২৭৭. বুখারী, হাদীস নং ৭৫৬; মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৪।

২৭৮. সূরা আল-মুযযাম্মিল : ২০।

www.waytojannah.com

এছাড়া এমন কিছু মতভেদপূর্ণ মাসআলাও রয়েছে যেগুলোতে দলীল একটিই। কিন্তু তাতে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন যে মহিলা ঋতুবতী তবে গর্ভবতী নয়, সে যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় তবে সে কিভাবে ইদ্দত (অপেক্ষমাণ সময়) পালন করবে? সে কি তিন হায়েয বা ঋতু অবস্থা ইদ্দত পালন করবে নাকি তিন তুহুর বা পবিত্র অবস্থা অপেক্ষা করবে? আলিমগণ এ বিষয়টি নিয়ে মতভেদ করেছেন। কিন্তু তাদের দলীল বিভিন্ন ছিল না। তাদের সবার দলীল ছিল একটি আয়াত। সেটি হচ্ছে, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ[২৭৯] "আর তালাকপ্রাপ্তাগণ তাদের নিজেদের মধ্যে তিনটি 'কুরু' গণনা করবে।" এখানে 'কুরু' শব্দটির অর্থ নির্ধারণ নিয়েই মতভেদটির সূত্রপাত। কারণ, এ শব্দটি مشترك বা বিভিন্ন অর্থবোধক। এর দ্বারা ঋতুকাল ও পবিত্র অবস্থা দু'টিই উদ্দেশ্য হতে পারে।

অনুরূপভাবে, ওযুতে মাথা মাসেহ কতটুকু করতে হবে, পুরো মাথা, না মাথার কিছু অংশ। আর যদি কিছু অংশই মাসেহ করতে হয় সেটা কি অনির্ধারিত, নাকি এক-চতুর্থাংশ নির্ধারিত? এ সবই পবিত্র কুরআনের আয়াত وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ[২৮০] আয়াতে বর্ণিত, بِ এর অর্থ নির্ধারণ নিয়ে মতভেদের অংশ। তার সাথে যোগ হবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এতদসংক্রান্ত প্রমাণিত আমলসমূহ।

মোটকথা, যদি তুলনামূলক ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্র শুধু মতভেদপূর্ণ মাসআলাসমূহই হয়ে থাকে তবে যেসব মাসআলায় আলিমগণ একমত রয়েছেন, সেগুলো নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না। চাই সেগুলো মৌলিক মাসআলা হোক বা শাখা-প্রশাখাজনিত মাসআলা। অনুরূপভাবে এ তুলনামূলক আলোচনা কোন মূল বিষয়কে স্পর্শ করবে না। চাই সেটা ইলমে তাওহীদের আকীদা বিষয়ক মাসআলা হোক কিংবা ইলমে উসূলে ফিকহের মাসআলাজনিত হোক। তুলনামূলক ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ দেখলেই প্রত্যেকের নিকট তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কখনও কখনও ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে মাঝে মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা হয়ে থাকে তাও আমাদের তুলনামূলক ফিকহ-এর বিষয় নয়। কেননা এটাকে পরিভাষায় তুলনামূলক ফিক্হ হিসেবে ধরা হয় না। তদ্রূপ ফিক্হ বা শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন যেসব মাসআলা আছে সেগুলোও আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না।

তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের উৎপত্তি ও বিকাশ

মাযহাবী কিতাবাদি লেখা শেষ হওয়ার পর মাযহাবসমূহ একটি পূর্ণাঙ্গ অবয়বে

২৭৯. সূরা আল-বাকারাহ : ২২৮।

২৮০. সূরা আল-মায়িদাহ : ৬।

www.waytojannah.com

দাঁড়িয়ে গেল। মাযহাবের লোকদেরও পরিচিতি প্রকাশিত হতে থাকল। এমতাবস্থায় কিছু আলিম তাদের রচিত গ্রন্থসমূহ ভিন্নধর্মী এক পদ্ধতিতে সাজিয়ে নিতে থাকলেন। তারা তাদের গ্রন্থসমূহে লিখিত মাযহাবী ইমামদের মতামত এবং পূর্বকাল ও তাদের সমসাময়িক বিখ্যাত মতামত প্রদানকারী মুজতাহিদদের সকলের মতকে একত্রিত করতে শুরু করলেন। তাদের অনেকে আবার সাহাবায়ে কিরামের মতসমূহকেও এতে লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। শুধু একত্রিত করাই নয়, তারা প্রতিটি মতের সপক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণ রয়েছে কিংবা যেসব যুক্তি সে মতের ধারক-বাহকরা প্রদান করেছে সেগুলোকে তুলে ধরে, সেগুলোর মধ্যকার কোন্‌টি মজবুত আর কোন্‌টি দুর্বল তা নির্ধারণপূর্বক দলীল-প্রমাণাদি ও যুক্তির নিরিখে যে মত প্রাধান্য পায় সেটাকে প্রাধান্য দেয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করল।

তাদের এ কাজটিই ছিল তুলনামূলক ফিক্‌হ চর্চার প্রাথমিক কাজ। তারা যেসব মত লিপিবদ্ধ করেছে তার উদাহরণ হিসেবে সেসব ঘটনা উল্লেখ করার মত, যা কোন কোন সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরস্পর ঘটেছিল। অনুরূপ একটি ঘটনা ছিল এই যে, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে কেউ জানাল যে, আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে কেউ তার স্ত্রীর স্তন্য পান করার মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন যে, "আমার মতে সে (মহিলা) তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে।" তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ঐ লোকের হাত ধরে নিয়ে এসে আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন, "হে আবূ মূসা! তুমি কি এ বয়স্ক ব্যক্তিকে দুগ্ধপোষ্য লোক মনে করেছ? তখন আবূ মূসা আল-আশ'আরী বললেন, তাহলে তোমার মত কি? তখন ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, মহান আল্লাহ্‌ বলেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ, "আর যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর স্তন্য পান করাবে।"[২৮১] আর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "إنما الرضاعة من المجاعة" দুগ্ধপান তো ক্ষুধার্ত অবস্থার কারণে হয়, অথবা যা বাচ্চার ক্ষুধা নিবারণ করে।"[২৮২] এ ব্যক্তি তো তার দুধ পানের কাল শেষ করেছে, দুই বছর পূর্ণ করে অনেক আগেই তার মা থেকে পৃথক হয়েছে। আর দুধ তার পেটও ভর্তি করে না।" তখন আবূ মূসা আল-আশ'আরী বললেন, যতক্ষণ এ পণ্ডিত তোমাদের মাঝে থাকে ততক্ষণ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।[২৮৩]

---

২৮১. সূরা আল-বাকারাহ, ২৩৩।

২৮২. বুখারী, হাদীস নং ২৬৪৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৪৫৫।

২৮৩. আল-বাবরতী, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, আল-'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ, ৫/১৩৪।

www.waytojannah.com

অনুরূপ এক ঘটনা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনারা মাতাকে দুই ভাই থাকলে এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নামিয়ে আনেন, অথচ আল্লাহ্ বলেন : فَانْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ “তার ‘ইখওয়া’ (বা ভাইয়ের সমষ্টি) থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ।”[২৮৪] আর اخوة বা ভাইয়ের সমষ্টি নিঃসন্দেহে اخوان হিসেবে ধর্তব্য হবে না। তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরাই মাতাকে দুই ভাইয়ের কারণে তার অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর উদ্দেশ্য এই যে, ইতোপূর্বে আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার সময়ে এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে দুই ভাই থাকলেই মায়ের অংশ এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশে নেমে যাবে। তারা সবাই اخوة শব্দটিকে একের অধিক ভাই-বোন যাই থাকুক না কেন সেটাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[২৮৫]

তদ্রূপ এক বর্ণনা আমরা দেখতে পাই ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আওযা‘য়ীর আলোচনায়। তারা দুজন একত্রিত হলে ইমাম আওযা‘য়ী ইমাম আবূ হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনাদের কি হলো যে, আপনারা রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় হাত উপরে উঠান না? আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ বললেন, আমরা এটা করি না, কারণ, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বহু সালাত আদায় করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতের শুরুতে তাকবীরের সময় ব্যতীত আর কখনও হাত উঠাতে দেখেন নি। তখন ইমাম আওযা‘য়ী বললেন, ইবন উমর বর্ণনা করছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমাহ, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকুতে মাথা উঠানোর সময় হাত উঠাতেন। এতে দেখা গেল তারা উভয়েই সাহাবাদের কাছ থেকে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে আমল করছেন। তাদের কাছে সে বর্ণনাসমূহ গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে এসেছে।

ইমাম মালিক ও শাফে‘য়ীর মধ্যে অনুষ্ঠিত আরেকটি বিতর্কের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহকে কেউ প্রশ্ন করল যে, কেউ

---

২৮৪. সূরা আন-নিসা, ১১।

২৮৫. ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার মাযহাব ছিল যে, দুই ভাই থাকলে মায়ের অংশ কমবে না। বরং তিন ভাই থাকলে কমবে। মুস্তাদরাকে হাকিম, ৪/৩৩৫; ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, ৯/২৫৮; আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৬/২২৭; যাইলা‘য়ী, তাবয়ীনুল হাকায়েক, ১৮/৩৯৪; ইবনে নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক শারহু কানযুদ দাকায়িক, ২৫/৩০; হাশিয়াতুল ফান্নারী, পৃ.১২৮; আত-তুহফাহ, পৃ.৮৩; আল-মাওসূ‘আতুল কুয়াইতিয়্যাহ, ৩/৩২; আল-আমেদী, আল-আহকাম: ২/২২৫; আল-গাজালী, আল-মানখূল, পৃ. ২২১; আল-মুস্তাসফা, ২/১১২।

www.waytojannah.com

যদি এ শর্তে একটি পাখি ক্রয় করে যে, সে সব সময় শব্দ করতে থাকবে, পরে দেখা গেল যে, সে দিনের কিছু অংশে মাত্র ডাকে। তার বিধান কি? ইমাম মালিক বললেন যে, সে তা ফেরত দিবে। প্রশ্নকারী বের হওয়ার সময় ইমাম শাফে'য়ীকে দরজার পাশে দেখতে পেল তখন তার বয়স ছিল পনের বছর। তিনি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, পাখিটি কি দিনের বেশির ভাগ সময় ডাকে, না বেশির ভাগ সময় চুপ থাকে? লোকটি বলল, বরং বেশির ভাগ সময়ই সে ডাকে। তখন শাফে'য়ী বললেন, তুমি তা ফেরত দিতে পারবে না। লোকটি ইমাম মালিক-এর কাছে প্রবেশ করে তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে আবার জানতে চেয়ে বলল, আমার ব্যাপারটি আবার দেখুন। ইমাম মালিক বললেন, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে আগে যা বলেছি তার বাইরে কিছু নেই। তখন লোকটি বলল, আপনার সাথীদের মধ্যে একজন দরজার পাশে আমাকে জানালো যে, এটা ফেরত দেয়া যাবে না। ইমাম মালিক বললেন, তাকে এখখুনি আমার কাছে হাযির কর। তখন ইমাম শাফে'য়ীকে নিয়ে আসা হলে ইমাম মালিক প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বলেছ যে, ফেরত দেয়া যাবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আপনাকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা আল-কুরাশিয়্যাকে বলেছিলেন, আবূ জাহম তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। আর মু'আবিয়া সে তো অভাবী। তার কোন সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামাকে বিয়ে কর। ইমাম মালিক বললেন, তাতে কি হয়েছে? এতে তোমার কথার প্রমাণ কোথায়? ইমাম শাফে'য়ী বললেন, তাঁর কাঁধ থেকে লাঠি না নামানোর অর্থ বেশি সফর করা। তবে সে অবশ্যই এর মাঝে কোথাও না কোথাও অবস্থান করে থাকে। তবে তার বেশির ভাগ সময় যেহেতু সফরে কাটে, তাই বলা হয়েছে যে সে লাঠি নামায় না। আরবরা এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে এ ধরনের অর্থই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। সুতরাং সে পাখিটির ডাক যদি দিনের বেশির ভাগ সময়ে থাকে তবে সে অবশ্যই সব সময় ডাকে ধরে নিতে হবে। তখন মুসলিম ইবন খালেদ আয-যানজী বললেন, 'তুমি ফতোয়া দাও, তোমার ফতোয়া দেয়ার সময় হয়েছে।'[২৮৬]

এ ধরনের আরও বহু মুনাযারা বা বিতর্কের কথা অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তারপর যখন মাযহাব লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, আর তার অনুসারীরা সেগুলোর উপর ভিত্তি করে মূলনীতিগুলো ঠিক করে নিচ্ছিলেন, তখনই তারা অন্যান্য মাযহাবে এ সমস্ত ব্যাপারে কি বর্ণিত হয়েছে তার প্রতিও দৃষ্টি দিচ্ছিলেন এবং অন্যান্য মাযহাবের দলীল-প্রমাণাদি ও যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে সেগুলোর খণ্ডানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এটাকে তারা নিজেদের মাযহাবের সহযোগিতা বিবেচনা করতেন।

২৮৬ মুকাদ্দিমাতু ইখতিলাফিল ফুকাহা, পৃ. ১০।

www.waytojannah.com

এটা পরবর্তীকালে অনেক সময়ই গোঁড়ামী ও প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকেও নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে অনেকে যে কোনভাবে তাদের মাযহাবকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন অগ্রহণযোগ্য যুক্তি-তর্কও পেশ করতে থাকেন।

এতদসত্ত্বেও একদল সত্যনিষ্ঠ আলিম সব সময়েই ছিল যারা এ সব মাযহাবের মধ্যে যেটা হক্বের সবচেয়ে কাছাকাছি বলে তাদের কাছে প্রতীয়মান হত, সেটার পক্ষে কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ বাস্তবায়ন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة "কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হক্বের উপর জয়ী থাকবে।"[২৮৭]

তুলনামূলক ফিকহ-এর ইতিহাস

তুলনামূলক ফিক্হ-এর ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা সেটাকে সর্বমোট পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি; যার মাধ্যমে ক্রমশ এ বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করেছে এবং বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, প্রাথমিক অবস্থা বা প্রারম্ভিকতা, গ্রন্থ প্রণয়নের যুগ, স্বাধীনভাবে মত পেশ করার যুগ, স্থবিরতার যুগ ও আধুনিক যুগ।

প্রথম পর্যায় : প্রারম্ভিকতা

আগেই আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, ফিক্হ-এর তুলনামূলক কিছু আলোচনা কোন কোন সাহাবার পক্ষ থেকে খুব হালকাভাবে শুরু হয়েছিল। তারপর যখন মাযহাব লিপিবদ্ধ হয়ে গেল এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করল, তখনই প্রখ্যাত আলিমগণ কে কোন্ মাযহাবের লোক তা সুপরিচিত হয়ে গেল। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের কিছু আলিম তাদের গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নতুন ধারার উন্মেষ ঘটায়। তাঁরা প্রসিদ্ধ ইমামগণের বিভিন্ন মতামতকে যেমন তাদের গ্রন্থে স্থান দিলেন তেমনি ইমামগণের পূর্বে বিভিন্ন আলিমগণের মতামত ও তাদের সমসাময়িক আলিমগণের মতামতকেও তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করতে আরম্ভ করলেন। এর্পর তারা প্রতিটি মতের সপক্ষে দলীলের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। সেসব দলীলের মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকলে তাও প্রকাশ করে দিল। যেসব মত প্রাধান্যপ্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হল তাও অকপটে তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করল। এভাবেই তুলনামূলক ফিক্হ-এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। এতে করে কোন কোন ফকীহ অনেক সময় তার মাযহাবের পক্ষপাতিত্বও করতে আরম্ভ করল। তবে এ সময়ের কর্মকাণ্ড খুব বেশি ব্যাপক ছিল না। তারা কিছু বাছাই করা বিষয় পেশ করে সেগুলোতে এক প্রকার তুলনামূলক আলোচনা করতেন, যা

২৮৭ বুখারী, হাদীস নং ৭৩১১ ; মুসলিম, হাদীস নং ১৫৬।

www.waytojannah.com

কোন পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ছিল না।[২৮৮] যেমন,

- ইমাম আবূ ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হি.) এর 'আর-রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযা'য়ী'।
- ইমাম আবূ ইউসুফ রচিত 'ইখতিলাফু আবি হানিফা ওয়া ইবন আবি লাইলা'।
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি.) এর 'আল হুজ্জাতু আলা আহলিল মাদীনাহ'।
- 'ইখতিলাফু আবি হানিফা ওয়াল আওযা'য়ী।
- ইমাম শাফে'য়ী (মৃ. ২০৪ হি.) এর আর-রাদ্দু আলা মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান।
- 'ইখতিলাফুশ শাফে'য়ী মা'আ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান।
- ইখতিলাফুশ শাফে'য়ী মা'আ মালিক।[২৮৯]
- 'আল-ইজমা ওয়াল ইখতিলাফ'।[২৯০]
- মুহাম্মাদ ইবন উমর আল ওয়াকেদী (মৃ. ২০৯ হি.)-এর 'আল-ইখতিলাফ'।[২৯১]
- আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা ইবন ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মাদ আস-সাজী, (মৃ. ৩০৭ হি.) এর 'আল-ইখতিলাফ ফিল ফিকহ'।[২৯২]

এগুলো ছিল তুলনামূলক ফিক্‌হ-এর প্রাথমিক কাজ।

দ্বিতীয় পর্যায় : গ্রন্থ প্রণয়ন

উপর্যুক্ত প্রাথমিক পর্যায়ের পর তুলনামূলক ফিক্‌হ এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হল। সেখানে ফিক্‌হ-এর প্রতিটি অধ্যায়েই তুলনামূলক আলোচনা বিস্তার লাভ করল। তখন আর শুধু নিজের মাযহাবী পক্ষপাতিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। সে সময় অধিকাংশ গ্রন্থে বিভিন্ন মতামতকে পক্ষপাতিত্বহীন অবস্থায় পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও অনেক সময়ই তাদের পর্যালোচনা ও প্রকাশভঙ্গি থেকে তারা কোন মতের দিকে বেশি ঝুঁকে আছেন সেটা প্রকাশ পেতে থাকল।

এ ব্যাপারে যে মহান ব্যক্তিত্বটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার তিনি হলেন, ইমাম তাবারী রাহেমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.)। তিনি তার মূল্যবান গ্রন্থ 'ইখতিলাফুল ফুকাহা' এ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করেন। সম্ভবত এটিই এ পদ্ধতিতে লেখা সর্বপ্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটির

---

২৮৮. বলা হয়ে থাকে যে, এতদসংক্রান্ত সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ। তিনি 'ইখতিলাফুস সাহাবাহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, আবুল ওয়াফা আল-আফগানী কর্তৃক লিখিত, 'ইখতিলাফু আবি হানিফা ও ইবনে আবি লাইলা' এর ভূমিকা, পৃ. ৩। তবে আমাদের কাছে অন্য কোন সূত্র থেকে এটি প্রমাণিত হয়নি।

২৮৯. উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থই ইমাম শাফে'য়ীর আল-উম্ম গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে।

২৯০. এটাও শাফে'য়ীর গ্রন্থ হিসেবে নাদীম উল্লেখ করেছেন। নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৬৭।

২৯১. নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ১১১।

২৯২. কাহহালা, উমর রিদা, মু'জামুল মুআল্লেফীন, ৪/১৮৪।

www.waytojannah.com

প্রথম অংশ স্পেনের ইস্কুরিয়াল লাইব্রেরীতে এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে আছে। বাকী একটি অংশ ছাপা হয়েছে ৩১৯ পৃষ্ঠায়।

আবূ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন জাবির আল-বাগদাদী, আয-যাহেরী, (মৃ. ৩১০ হি.) এর 'কিতাবুল ইখতিলাফ'।

ইবনুল মুনযির (মৃ. ৩১৮ হি.) কৃত 'আল-আওসাত ফিস সুনান ওয়াল ইজমা ওয়াল ইখতিলাফ, ইখতিলাফুল উলামা, আল-ইশরাফ 'আলা মাযাহিবি আহলিল ইলম' এ তিনটি গ্রন্থ এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (মৃ. ৩২১ হি.) কৃত, ইখতিলাফুল ফুকাহা এ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাছাড়া তার আরেকটি গ্রন্থ 'শারহু মা'আনিল আসার' গ্রন্থও এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

আবুল লাইস নাসর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আস-সামারকান্দী (মৃ. ৩৭৩ হি.) এর 'মুখতালাফুর রিওয়ায়াহ বাইনা আবি হানিফা ওয়া মালিক ওয়াশ শাফে'য়ী।

আল-হাসান আল-ওয়াররাক, হাসান ইবন হামেদ ইবন আলী ইবন মারওয়ান আল-বাগদাদী, আল-হাম্বলী (মৃ. ৪০৩ হি.) এর 'ইখতিলাফুল ফুকাহা'।

আবূল হুসাইন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-কুদূরী হানাফী (মৃ. ৪২৮ হি.) কৃত 'আত-তাজরীদ।

আবূ যায়েদ আদ-দাবুসী (মৃ. ৪৩০ হি.) কৃত 'তা'সীসুন নাযর'।

আহমাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী এর 'ইখতিলাফুল ফুকাহা আল-কাবীর' ইখতিলাফুল ফুকাহা আস-সাগীর।[২৯৩]

বাইহাকী আশ-শাফে'য়ী (মৃ. ৪৫৮ হি.) কৃত 'আল-খিলাফিয়াত'।

আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন আলী আশ-শীরাযী, (মৃ. ৪৭৬ হি.) এর 'আন-নুকাত'।

ইবন জামা'আহ আশ-শাফে'য়ী (মৃ. ৪৮০ হি.) কৃত 'আল-ওসায়েল ফী ফুরুকিল মাসায়েল'।

আলী ইবন সা'য়ীদ ইবন আবদির রাহমান আল-আবদারী আশ-শাফে'য়ী (মৃ. ৪৯৩ হি.) কৃত মুখতাসারুল কিফায়াহ। অথবা, 'আল-কিফায়াহ ফী মাসায়িলিল খিলাফ'।

আবূ বকর মুহাম্মাদ আশ-শাসী আশ-শাফে'য়ী (মৃ. ৫০৭ হি.) কৃত 'হিলইয়াতুল উলামা ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা'।

আন-নাসাফী আল-হানাফী (মৃ. ৫৩৭ হি.) কৃত 'মানযূমাহ'।

জারুল্লাহ, আবুল কাসেম মাহমূদ ইবন উমর আয-যামাখশারী, (মৃ. ৫৩৮ হি.) কৃত 'রুয়ুউসুল মাসাইল'।

---

২৯৩. নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৬৬৬।

www.waytojannah.com

Contents

আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল হামীদ আস-সামারকান্দী, আল- হানাফী (মৃ. ৫৫২ হি.) কৃত 'মুখতালাফুর রিওয়ায়াহ্'।[২৯৪]

ইবন হুবায়রাহ আল-হাম্বলী (মৃ. ৫৫৫/৫৬০ হি.) কৃত 'আল-ইশরাফ আলা মাযাহিবিল আশরাফ'।

রদীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আস-সারাখসী আল-হানাফী (মৃ. ৫৭১ হি.) কৃত 'আত-তারীকাতুর রাদওয়ীয়্যাহ'।

মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন শু'আইব, আদ-দাহ্হান আশ-শাফে'য়ী (মৃ. ৫৮৯ হি.) কৃত তাকওয়ীমুন নাযর'।

তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে কাযী আবুল ওয়ালীদ ইবন রুশদ (মৃ. ৫৯৫ হি.) কৃত 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'। তাঁর এ গ্রন্থটির তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি শুধু ইখতিলাফ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং ইখতিলাফ বা ভিন্ন মতের কারণও বর্ণনা করতে সচেষ্ট ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবন বাহরাম আশ-শাফে'য়ী, (মৃ.৭০৫ হি.) এর 'তুহফাতুন নুবাহা ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা'।

আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রাহমান আদ-দিমাশকী আশ-শাফে'য়ী (মৃ. হি. অষ্টম শতাব্দী) কৃত 'রাহমাতুল উম্মাহ ফী ইখতিলাফিল আয়িম্মাহ'। এ গ্রন্থটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিভিন্ন মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

আবদুর রহমান আশ-শা'রানী (মৃ. ৯৭৩ হি.),-এর 'আল-মীযান'।

এছাড়া আরও কিছু গ্রন্থ আছে যেগুলোতে ইখতিলাফ-এর কারণ বিবৃত হয়েছে। যেমন,

আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-বাতলিয়ূসী (মৃ. ৫২১ হি.) এর আল-ইনসাফ ফিত তানবীহ আলা আসবাবিল খিলাফ।

আয-যিনজানী, আবূল মানাকিব শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইবন আহমাদ (মৃ. ৬৫৬ হি.) এর 'তাখরীজুল উসূল আলাল ফুরু'।

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন আবদিল হালিম ইবন তাইমিয়্যাহ, (মৃ. ৭২৮ হি.) এর রাফ'উল মালাম 'আনিল আয়িম্মাতিল আ'লাম।[২৯৫]

---

২৯৪. আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৭/২৪।

২৯৫. এছাড়া আধুনিক কালে আরও কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন, শাহ ওয়ালি উল্যাহ আদ-দেহলভী (মৃ. ১১৭৬ হি.) এর আল-ইনসাফ ফী বয়ানি সাবাবিল খিলাফ ফিল ইখতিলাফ ফিল আহকামিল ফিকহিয়্যাহ। আলী খফীফ, আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা। ড. মুস্তাফা সা'য়ীদ আল-খিন্ন-এর আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাওয়ায়িদিল উসুলিয়্যাহ ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা। ড. আব্দুল্লাহ ইবনে আবদিল মুহসিন আত-তুরকী-এর আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা।

www.waytojannah.com

তৃতীয় পর্যায় : স্বাধীন ও সঠিকভাবে মত প্রকাশ

এ পর্যায়ের অধিকাংশ লেখক কোন সুনির্দিষ্ট মাযহাবী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ফিক্‌হ এর কিতাবসমূহ লিখতে থাকেন। তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলে অন্য মাযহাবের মতামত বর্ণনার প্রতি উৎসাহী ছিলেন না। সুতরাং প্রতিটি মাসআলাতে তুলনামূলক আলোচনা হত না বরং যেখানে খুব প্রয়োজন বোধ করা হত সেখানেই অপরাপর মাযহাবের মতের প্রতি ইঙ্গিত করা হত। এ সব গ্রন্থে সঠিকভাবে তাদের ইমামের মতসমূহ তুলে ধরা হতে থাকে।

এ ধরনের গ্রন্থকারদের মধ্যে ইমাম ইবন কুদামাহ-এর 'আল-মুগনী' গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। যদিও এটি মূলত হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম খিরাকীর আল-মুখতাসারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং এর প্রধান কাজই হলো মাযহাবের দলীল-প্রমাণাদি ফুটিয়ে তোলা, কিন্তু এতে অনেক মাসআলাতেই অন্যান্য মাযহাবের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ রয়েছে। এমনকি মাযহাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে যেসব মনীষীর মতামত বিস্তৃত ছিল সেগুলোকেও যত্নের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে খুব প্রয়োজন না হলে সেদিকে ইঙ্গিত করেননি। অন্য মাযহাব উল্লেখ করার সময় কখনো দু'একটি বাক্য বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। তবে ইবন কুদামাহ রাহেমাহুল্লাহ এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ঐকমত্যের অংশ ও মতবিরোধের অংশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন মতের মধ্যে ভারসাম্য ও প্রাধান্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন।

চতুর্থ পর্যায় : স্থবিরতা

এ সময়ে তুলনামূলক ফিক্‌হ এক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ যুগে ফিকহী কর্মকাণ্ডের স্থবিরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। হিজরী নবম শতাব্দী থেকে ফকীহগণ একই মাযহাবের মধ্যে মাযহাবের ইমাম ও তার ছাত্রদের মাঝে বা মাযহাবের ছাত্রদের মধ্যে যেসব মতবিরোধ ছিল সেগুলো নিরসনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটি কি হবে সেটি নির্ধারণ করা। যাতে করে এর উপর ভিত্তি করে বিচার বা ফতোয়া দেয়া যায়। তাই এ সময় তুলনামূলক ফিক্‌হ চর্চা খুব বেশি এগুতে পারে নি।

তবে এখানে একই মাযহাবের মধ্যে যে সমস্ত ফিকহী মতভেদ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এক প্রকার তুলনামূলক আলোচনা অব্যাহত ছিল। যদিও এটাকে মাযহাবী ফিকহই বলা চলে। তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের মাযহাবে বর্ণিত বিভিন্ন মাসআলার বিধি-বিধানের ব্যাপারে যেসব অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে সেগুলোর নিরসন করা এবং মাযহাবের মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত কি সেটা নির্দেশ করা।

www.waytojannah.com

তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন এক মাযহাব বা একাধিক মাযহাবের মতামতের মধ্য থেকে কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিতে হলে পদ্ধতিগত ও মৌলিক কিছু নীতি-মালার অনুসরণ অপরিহার্য, যাতে করে যে মতকে প্রাধান্য দেয়া হল আর যে মতকে অপ্রাধান্য বলা হল তার একটি নৈতিক ভিত্তি দাঁড় করানো যায়। তাই এ সময়ে তারজীহ বা প্রাধান্য কিভাবে দেয়া হবে তার কিছু নিয়ম-নীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

যেসব গ্রন্থ একই মাযহাবের বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, ইবন আবেদীন কৃত 'রাদ্দুল মুহতার'। এটি ফিকহে হানাফীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বরং পরবর্তী হানাফীদের সমস্ত কিতাবের সামষ্টিক রূপ বলা যেতে পারে।

পঞ্চম পর্যায় : বর্তমান অবস্থা

বর্তমান কালে তুলনামূলক ফিক্হ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা আগের সব অবস্থা অতিক্রম করে গেছে। কোন ইমামের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব না করে ফিকহী বিভিন্ন মতের মধ্যে মূল্যায়ন করার মত সাহসী ভূমিকা বর্তমান কালের আলিমদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। বর্তমান কালে ফিক্হ শাস্ত্রের অবস্থা বর্ণনায় আমরা পূর্বে সেগুলোর বেশ কয়েকটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছি।

তুলনামূলক ফিক্হ-এর পর্যায়সমূহের আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আমরা একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা জরুরী মনে করছি, আর তা হলো, তুলনামূলক ফিকহের কোন কোন গ্রন্থে দু'টি মাযহাবকে, আবার কোথাও তিনটি, কোথাও বা চারটি আবার কোথাও এর চেয়েও কিছু বেশি বা সব মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এ সব বিভিন্ন পর্যায়ের হয়েছে। তবে এ ধরনের ফিকহী আলোচনা যে শুধু ফিক্হ-এর গ্রন্থে হয়েছে তা-ই নয় বরং অনেক তাফসীরের কিতাব যেগুলোতে ফিকহী হুকুম-আহকাম বর্ণিত হয়েছে সেগুলোতে ব্যাপকভাবে তুলনামূলক ফিক্হ চর্চা হয়েছে। যেমন, জাসসাস-এর আহকামুল কুরআন, ইবন আরবীর আহকামুল কুরআন, কুরতুবীর আলজামেউ লি আহকামিল কুরআন বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। তাছাড়া যেসব গ্রন্থে আহকাম বা বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীসগুলোকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেসব গ্রন্থেও তুলনামূলক ফিকহ চর্চা করা হয়েছে। যেমন, আল্লামা নাওয়াবীর শারহে সহীহ মুসলিম, আল্লামা ইবন হাজার এর ফাতহুল বারী, আল্লামা আইনী এর উমদাতুল কারী, ইবন দাকীকিল ঈদের শারহু উমদাতিল আহকাম, শাওকানীর নাইলুল আওতার, সান'আনীর সুবুলুস সালাম শারহি বুলুগিল মারাম।

• তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

আমরা যদি এ বিষয়টি ভালভাবে জেনে থাকি যে, শরী'আতের বিধি-বিধান

www.waytojannah.com

জানার ক্ষেত্রে মানুষের সবার ক্ষমতা এক প্রকার নয়, তাঁদের মধ্যে কেউ আছেন মুজতাহিদ পর্যায়ের জ্ঞানী, আবার কেউ আছেন উপরোক্ত মুজতাহিদদের অনুসরণকারী মুকাল্লিদ। তাছাড়া ফিক্হী প্রতিটি মাসআলাও এক প্রকার নয়। সেগুলোর বিধানের ব্যাপারে খুব কমই ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। বরং বেশির ভাগ মাসআলাতেই আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের প্রতি রহমতস্বরূপ। যাতে করে কারও পক্ষে কোন মাসআলায় কোন একজন বা একাধিক আলিমের মত নেয়া সম্ভব হয়।

যদি তাই হয় তবে একজন মুফতি বা ফতোয়াদাতার জন্য যে বিষয়ে ফতোয়া দিবে সে বিষয়ে তার অন্তর্দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। এটা এভাবে যে, সে আলিমদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সেগুলোতে তুলনামূলক আলোচনা করবে যাতে করে কোন্‌টি প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত তা নির্ধারণ করতে পারে। এভাবে বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে সে এটাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করবে। আর এ জন্যই বিভিন্ন ফিক্‌হ-এর তুলনামূলক অধ্যয়ন-এর মূল উদ্দেশ্য তার জানা থাকতে হবে।

তুলনামূলক ফিক্‌হ-এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ফকীহ আলিমগণের মতামত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান, যে মাসআলায় তাদের মতভেদ হয়েছে সেগুলোতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা জানা, তারা যে সমস্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলেছে তা অবগত হওয়া। যাতে করে তাদের মতসমূহের মধ্যে কোন্ মতটি শরী'আতের মূলনীতিসমূহের সবচেয়ে কাছাকাছি তা জেনে সেটাকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কোন ক্রমেই কোন মাযহাবকে শক্তিশালী করার মন-মানসিকতা নিয়ে এ কাজে ব্রতী হওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ক্রমেই কোন মাযহাবের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব, অপর মাযহাবের বিরোধিতার জন্য তুলনামূলক আলোচনা করা যাবে না। তুলনামূলক ফিক্‌হ আলোচনা করতে গিয়ে পরবর্তী কোন কোন আলিম উপর্যুক্ত দু'ধরনের কাজে পা বাড়িয়েছেন। ফলে তাঁরা তাঁদের ইমামদের ব্যাপারে গোঁড়ামী করেছেন, তাঁদের মাযহাবের জন্য কলমী লড়াই করেছেন। এতে করে কখনো কখনো অন্য ইমামদেরকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেননি। কোন সত্যিকারের আলিমের এ ধরনের কর্মকাণ্ড হতে পারে না। বরং শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা নিন্দনীয় ব্যাপার। এতে করে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আরো বেড়ে যায়, তাদের কথা-বার্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ইসলাম আমাদেরকে এ ধরনের আচরণ থেকে সরাসরি নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Contents

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[২৯৬]

সুতরাং তুলনামূলক ফিক্হ অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সবচেয়ে শক্তিশালী এবং শরী'আতের চাহিদার নিকটবর্তী মত সম্পর্কে অবগত হওয়া।

তুলনামূলক ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে যা জানা প্রয়োজনীয়

তুলনামূলক ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে তুলনাকারীর মধ্যে বেশ কিছু গুণাগুণ থাকা উচিত :

প্রচুর অধ্যয়ন, সদাজাগ্রত, মতামত গ্রহণ ক্ষেত্রে আমানতদারির সাথে গ্রহণ করা, কোন ব্যাপারে নিজের মত দেয়ার ক্ষেত্রে ইনসাফের সাথে প্রদান করা এগুলো অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এগুলো করতে হলে তাকে যা যা করতে হবে তা হলো,

১. কোন্ ইমামের মত কি তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সে ইমামের নিজের গ্রন্থ বা তার ছাত্রদের গ্রন্থ থেকে নিতে হবে। অথবা সে ইমামের মতামত যেসব গ্রন্থে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন করেনি এমন বিশ্বস্ত লোকদের গ্রন্থ থেকে নিতে হবে। যেসব মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করবে সেসব মাযহাবের শক্তিশালী মতটিকেই গ্রহণ করতে হবে। কোনক্রমেই সে মাযহাবের দুর্বল কোন মত গ্রহণ করে সেটাকে রদ করার প্রচেষ্টায় রত হওয়া যাবে না।

২. শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করার পর সে মাযহাবের লোকদের শক্তিশালী যে দলীল-প্রমাণাদি তারা নিজেরা পেশ করেছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কোনক্রমেই সে মাযহাবের দুর্বল কোন দলীল নিয়ে এসে সেটাকে রদ করার প্রবণতা গ্রহণ করা যাবে না।

৩. যেসব ইমামের মতামতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা হবে, সেসব মাসআলায় প্রত্যেক ইমাম তার মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে যেসব উসূল বা মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তা করেছেন সেগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকতে হবে। যাতে করে দলীল থেকে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা জানা যায়। আর এটাও জানা যায় যে, কোথায় তিনি তার মূলনীতির উপর ঠিকমত চলতে সক্ষম হয়েছেন এবং কোথায় তার পক্ষে সেটা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

৪. ইমামদের পেশ করা দলীল-প্রমাণাদি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার পর সে দলীলসমূহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা। অর্থাৎ যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের স্বীকৃত নিয়ম-নীতির পরিপূর্ণ অনুসরণ করে সে অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও

---

২৯৬. সূরা আলে ইমরান : ১০৫।

www.waytojannah.com

মূল্যায়ন করা। সুতরাং ইমামগণ যে হাদীসকে সহীহ বলেছেন তুলনাকারী যেন সে হাদীস দুর্বল হওয়ার দাবি না করে, কিংবা হাদীসবেত্তাগণ যে হাদীসকে শুদ্ধ বলেননি তুলনাকারী যেন সেটাকে শুদ্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে না যান। বরং তার কাজ হবে স্বীকৃত নিয়ম-নীতির অনুসরণ করা।

৫. দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার পর সেগুলোর মধ্যে যে দলীল বা দলীল-প্রমাণাদি প্রাধান্য পাবে সেটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সেটা এমন হবে যে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত করা যাচ্ছে না কিংবা তার উপর উত্থাপিত অভিযোগসমূহের জওয়াব দেয়া সম্ভব। যাতে করে হকের পক্ষে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করা যায়। কোন ক্রমেই নিজের মতের পক্ষে গোঁড়ামী করা যাবে না।

তুলনামূলক ফিকহ্ অধ্যয়নের উপকারিতা

তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের উপকারিতা অনেক। তন্মধ্যে নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো :

১. তুলনামূলক ফিক্‌হ অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত হবে। যেসব মাস্আলায় ইমামদের মতভেদ আছে সেগুলো সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান লাভ হবে।

২. তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের মাধ্যমে ইমামদের বিভিন্ন মতামত জানার পর একজন ফতোয়াদানকারী সময় ও অবস্থাভেদে সঠিক মত নিতে সমর্থ হবে। তার সমাজ ও অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইমামদের মতামত সম্পর্কে গবেষণা করে যেটি তার জন্য উপযোগী সেটা গ্রহণ করা তার পক্ষে সহজ হবে।

৩. তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন মাযহাবের মতামতের দলীল সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। যার ফলে দ্বীন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হবে। ফলে না জেনে কেউ অযথা মন্তব্য করবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ۔

"বলুন, 'এটাই আমার পথ : আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আমি ডাকি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন অবস্থায়---আমি এবং আমার অনুসারিগণও।'"[২৯৭]

৪. কোন মাযহাবের ফিকহের জ্ঞান অর্জিত হলে দ্বীন সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। সাথে সাথে তা অন্ধ তাকলীদের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের করে দলীল-ভিত্তিক অনুসরণের আলোতে উদ্ভাসিত করবে।

৫. যারা বিভিন্ন মাযহাবের মতামত ও তাদের দলীল-প্রমাণাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে এবং ইমামদের দলীল নেয়ার অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে

২৯৭ সূরা ইউসুফ: ১০৮।

www.waytojannah.com

তারা ইমামদের সম্পর্কে উঁচু ধারণা করবে। এক-একটি মাসআলা বের করতে ইমামগণ যে কঠিন পরিশ্রম করেছেন সেটা তার পক্ষে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব হবে। সাথে সাথে দ্বীনের ব্যাপারে একে অপরের সাথে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত থাকবে। যার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহনশীলতার মনোভাব তৈরি হবে। অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে। মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাতে কেউ কাউকে শত্রু জ্ঞান করবে না।

৬. যারা তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়ন করবে তারা ইমামদের দলীল-প্রমাণাদি সম্পর্কে জানার পর এটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ফিকহে ইসলামী বা ইসলামী আইন তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত। অন্য কোন আইন থেকে তাকে কিছু ধার করতে হয়নি। ইমামগণের সকলেই কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসকে তাদের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। প্রয়োজনবোধে তারা কখনও ইস্তিহসান, কখনও মাসালেহ মুরাসালাহ, কখনও সাদ্দুয যারায়ে' গ্রহণ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ ছিল।

৭. তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের মাধ্যমে যে সমস্ত মাসআলাতে ইজমা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জিত হবে। ফলে কেউ ইজমার বিরোধিতা করবে না। কারণ ইজমার বিরোধিতা করা জায়েয নেই। সাথে সাথে যে সমস্ত মাসআলাতে ইজমা হয়েছে তাতে ইজতিহাদের আর প্রয়োজন নেই—এটা বুঝতে সক্ষম হবে।

৮. তুলনামূলক ফিকহ চর্চার মাধ্যমে এটা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমস্ত মাসআলায় বেশি মতবিরোধ রয়েছে, সেগুলোর কোনটিই কোন মৌলিক মাসআলা নয়। নতুবা তাতে মতবিরোধ হতো না। তাছাড়া সেগুলোর অধিকাংশের দলীলও সম্ভবতামূলক। অকাট্য দলীল সম্পন্ন বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কোন বড় ধরনের মতবিরোধ ঘটেনি।

৯. তুলনামূলক ফিক্হ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক ইমাম মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি ও মূলনীতি অনুসরণ করেছেন সেটা জানা যাবে। আর এতে করে তার মধ্যে দলীল-প্রমাণাদিতে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দেয়ার মত যোগ্যতা তৈরি হবে। সে জানতে পারবে কিভাবে দলীল-প্রমাণাদি থেকে মাসআলা বের করা যায়। এভাবে তার সামনে যখনই কোন সমস্যা তৈরি হবে তখনই সে ইমামদের গ্রহণীয় নীতিমালা অনুযায়ী নিজেই কোন একটি সমাধান বের করতে সমর্থ হবে।

১০. তুলনামূলক ফিক্হ চর্চার মাধ্যমে যে কাজটি সে করবে, যে মাসআলাতে সে উত্তর দিবে সে মাসআলা সম্পর্কে তার মনে প্রশান্তি বিরাজ করবে। সে যে কাজে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা সম্পর্কে তার মনের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিধা কাজ করবে না।

www.waytojannah.com

তুলনামূলক ফিকহ আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী

আগেই বলা হয়েছে যে, তুলনামূলক ফিকহ আলোচনার সূত্রপাত ঘটে অনেক আগেই। তবে এ ব্যাপারে যে সমস্ত গ্রন্থ পথিকৃত হিসেবে বিবেচিত সেগুলোর কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ইবন রুশদ : বিদায়াতুল মুজতাহিদ
- ইবন আব্দুল হাদী : আল-মুহারার ফিল হাদীস।
- ইবন আবদিল বার : আল-ইস্তিযকার।
- ইবন আবদিল বার : আত-তামহীদ।
- মুসান্নাফে আবদির রায্যাক।
- মুসান্নাফে ইবন আবি শাইবাহ।
- সান'আনী : সুবুলুস সালাম ফী শারহি বুলুগিল মারাম।
- শাওকানী : শারহু মুনতাকাল আখবার।
- শাওকানী : ফাতহুল কাদীর আল-জামেউ বাইনা ফান্নাইর রিওয়ায়াতি ওয়া দিরায়াতি মিনাত তাফসীর।
- আব্দুল গনী আল-মাকদেসী : উমদাতুল আহকাম।
- ইবন দাকীকিল ঈদ : শারহু উমদাতুল আহকাম।
- ইবন হাজার আল-আসকালানী : ফাতহুল বারী।
- ইবনুল হুমাম : ফাতহুল কাদীর।
- আশ-শীরাযী : আল-মুহায্যাব
- নাওয়াবী : আল-মাজমু' শারহুল মুহায্যাব
- নাওয়াবী : আল-মিনহাজ শারহু সহীহ মুসলিম
- ইবন হাযম : আল-মুহাল্লা বিল আসার ফি শারহিল মাজাল্লা বিল ইখতিসার
- ইবন কুদামা : আল-মুগনী
- মারগীনানী : আল-হিদায়া
- শাফে'য়ী : আল উম্ম
- ইবন আবেদীন : হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার
- আব্দুর রহমান আল-জাযিরী : আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ
- সাইয়্যেদ সাবিক : ফিকহুসসুন্নাহ
- নীমাওয়াইহ : আসারুস সুনান
- যফর আহমাদ উস্মানী: ই'লায়ুস সুনান
- আমীমুল ইহসান : ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার

www.waytojannah.com

Contents

- ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী : আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ
- আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ।

এছাড়া আরও যে সমস্ত গ্রন্থ এ ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

- মুওয়াত্তা লিল ইমাম মালিক
- শারহু মা'আনিল আসার লিত তাহাবী
- আল-জাসসাস : আহকামুল কুরআন
- ইবন আরাবী : আহকামুল কুরআন
- কুরতুবী : আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন
- ইবনুল কাইয়্যেম : ই'লামুল মুআক্কে'য়ীন

তুলনামূলক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

উপর্যুক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, আমাদেরকে তুলনামূলক ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে যা গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকতে হবে তা হলো :

- মাসআলাটির পূর্ণরূপ উপস্থাপন
- প্রত্যেক পক্ষের মতামত তাদের গ্রন্থ থেকে উপস্থাপন
- মতবিরোধের কারণ নির্ধারণ
- দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন ও প্রত্যেক পক্ষের প্রমাণাদি খণ্ডন
- প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত পেশ ও প্রাধান্য দেয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ।

www.waytojannah.com

ত্বাহারাত বা পবিত্রতা অধ্যায়

[ইবাদত অংশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তুলনামূলক ফিকহী মাসায়েল ও তার আলোচনা]

ওযুতে নিয়্যত করার হুকুম

○ মাসআলাটির পূর্ণরূপ উপস্থাপন

ওযুর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সরাসরি চারটি বিষয় করতে বলা হয়েছে। সেখানে নিয়্যত করতে হবে এমন কোন কথা উল্লেখ নেই। তবে তাঁরা অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়্যতের শর্তারোপ করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ "তাদেরকে কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের আদেশ করা হয়েছে।"[২৯৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الأعمال بالنيات 'সমস্ত কাজ-কর্ম নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।'[২৯৯] সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, নিয়্যত বা দৃঢ় সংকল্প হলে ওযু বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি কেউ নিয়্যত ব্যতীতই ওযুর কর্মকাণ্ড যথা মুখ, হাত, মাথা ও পা ধোয়ার কাজ করে। তারপর সালাতের সময় বলে যে, আমি তো এ কাজগুলো করেছি তবে সে সময় ওযু করার কথা চিন্তা করে সেটা করিনি। এমতাবস্থায় তার সে কাজটি ওযু বলে ধর্তব্য হবে কিনা? আর হলে সেটা দ্বারা সে সালাত ও অন্যান্য যে সমস্ত কাজে ওযু দরকার তা পালন করতে পারবে কি না?

○ প্রত্যেক পক্ষের মতামত তাদের গ্রন্থ থেকে উপস্থাপন

ওযুর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিয়্যতের শর্তারোপ করার বিষয়ে আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন।

১. কতিপয় আলিম বলেন, নিয়ত শর্ত। যা ইমাম শাফে'য়ী, মালিক ও আহমদ রাহেমাহুল্লাহ-এর মাযহাব।[৩০০]

২. আরেক শ্রেণীর আলিম বলেন, নিয়ত শর্ত নয়। এটা ইমাম আবূ হানিফা ও সাওরী রাহেমাহুল্লাহ-এর মাযহাব।[৩০১]

---

২৯৮. সূরা আল-বাইয়্যেনাহ, ৫।

২৯৯. বুখারী, হাদীস নং ১, মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

৩০০. নাওয়াবী, আল-মাজমু', ১/২৩২; ইবনে জুযাই, কাওয়ানিনুল আহকামিশ শারইয়্যাহ, পৃ. ২২; ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী ১/১১০; ইবনে হাযম আয-যাহেরী, আল-মুহাল্লা, ১/৯৫।

৩০১. আস-সামারকান্দী, তুহফাতুল ফুকাহা, ১/১৩।

www.waytojannah.com

Contents

○ মতবিরোধের কারণ নির্ধারণ

ইমামগণের উপরোক্ত মতানৈক্যের কারণ হলো, ওযুর ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমটি হলো, এটা কেবলমাত্র একটি ইবাদত, যার অর্থ বোধগম্য নয়। সালাত ইত্যাদির ন্যায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল নৈকট্য লাভ করা। দ্বিতীয়টি হলো, এটা একটি ইবাদত যার অর্থ বোধগম্য। যেমন নাপাকি ধুয়ে ফেলা। ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, নিরেট ইবাদতের জন্য নিয়্যত প্রয়োজন হয়। উপরোক্ত দু'ধরনের ইবাদতের সাথেই ওযুর সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট হলো যে, ওযু দু'টি বিষয় সমন্বয় করে। ইবাদত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। ফিকহ হলো, এ বিষয়ে গভীর দৃষ্টি দেয়া যে, ওযুর সাদৃশ্য কোন্‌টির সাথে সবচেয়ে সুদৃঢ়। সে অনুযায়ী এটার ব্যাপারে বিধান প্রণয়ন করা হবে।[৩০২]

○ দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন ও প্রত্যেক পক্ষের প্রমাণাদি খণ্ডন

প্রথম শ্রেণী যারা নিয়্যতকে শর্তারোপ করেছেন তাদের দলীল—

১. অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় ওযু একটি ইবাদত, এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, এর কারণে আল্লাহ তা'আলা অপরাধ মার্জনা করেন এবং ওযুকারীকে প্রতিদান দেন। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন,

ক. আবূ মালিক আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু হাদীসে এসেছে, الطهور شطر الإيمان 'পবিত্রতা ঈমানের অংশ'।[৩০৩] ঈমান হলো ইবাদত। তার অংশ ওযুও একটি ইবাদত।

খ. উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত একখানা হাদীসে এসেছে : من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتّى تخرج من تحت أظفاره "যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং তা ভাল ও সুন্দরভাবে করবে, তার শরীরের সমস্ত অপরাধ নখের নিচ দিয়ে ঝরে পড়ে যাবে।[৩০৪]

গ. উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে এসেছে : من توضأ هكذا غفرله ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه الى المسجد نافلة "যে ব্যক্তি এভাবে ওযু করবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে, আর নামায ও মসজিদ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া নফল বা অতিরিক্ত ইবাদত হবে।[৩০৫]

---

৩০২. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/৩০।

৩০৩. মুসলিম, হাদীস নং ২২৩।

৩০৪. মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫।

৩০৫. মুসলিম, হাদীস নং ২২৯।

www.waytojannah.com

২. পক্ষান্তরে ওযু একটি অর্থে অবোধগম্য ইবাদত। কেননা, অন্যান্য অঙ্গ ব্যতীত নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গকে বিশেষিত করার যৌক্তিক কোন কারণ নেই।

৩. তারা আরো দলীল দেন, নিয়্যত ব্যতীত তায়াম্মুম সহীহ নয়, এটি সর্বসম্মত মাসআলা, তায়াম্মুম হলো ওযুর বিকল্প, আর বিকল্পের বিধান মূলের বিধান অনুযায়ী হয়। সুতরাং তায়াম্মুমের মতই ওযুতে নিয়্যত লাগবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী যারা নিয়্যতকে শর্ত বলেন না তাদের দলীল

১. আল্লাহর বাণী : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে, তখন তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করবে। এ আয়াতে নিয়্যতের কোন আলোচনা নেই। সুতরাং ওযুতে নিয়্যত ওয়াজিব করা হলো নসের উপর বৃদ্ধিকরণ, যেমনিভাবে তা হলো সাধারণ আয়াতে শর্তারোপ করা। এ দু'টি বিষয়ই হলো নসখ বা রহিতকরণ, আর খবরে ওয়াহিদ দিয়ে নসখ বৈধ নয় (অর্থাৎ হানাফী মাযহাব অনুসারে)।

২. তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপকতা দিয়ে দলীল দেন : وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

"আমরা আকাশ থেকে পবিত্রতাদানকারী পানি বর্ষণ করেছি।" (আল-ফুরকান : ৪৮)

এবং আল্লাহর বাণী : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য।" (আল-আনফাল : ১১)

তাঁরা বলেন, এ আয়াতসমূহ প্রমাণ বহন করে যে, পানি নিজেই ব্যবহারকারীকে পবিত্রতা দানকারী। সুতরাং নিয়্যতের শর্তারোপ করা হলো তাকে সীমাবদ্ধ করা। আর তা হলো এক ধরনের নসখ।

৩. সালাতে ভুলকারী ব্যক্তির হাদীস দিয়েও তারা দলীল দেন, তাতে এসেছে, تَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ "তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ওযু করবে।"[৩০৬]

৪. ওযু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হাদীসসহ অন্য কোন হাদীসে নিয়্যতের আলোচনা নেই, যদি নিয়্যত শর্ত কিংবা ওয়াজিব হতো তাহলে তা অবশ্যই উল্লেখ থাকতো।

৫. তাঁরা আরও বলেন, ওযু হলো পানির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। সুতরাং তার জন্য নিয়্যত ওয়াজিব নয়, যেমন নাপাকি দূরীকরণের ক্ষেত্রে নিয়্যত ওয়াজিব নয়।

৩০৬ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৮৬১।

www.waytojannah.com

○ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত পেশ ও প্রাধান্য দেয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

উপরোক্ত দলীল-প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পক্ষেরই শক্তিশালী দলীল রয়েছে। তবে ওযুর নিয়্যত ফরয করে এমন কোন সরাসরি 'নস' পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহতিয়াত বা যতটুকু সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বিধায় ওযুতে নিয়্যত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ওযুর ফরয

○ মাসআলার পূর্ণরূপ

ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোন কোন কাজ অবশ্যই করতে হবে। সুতরাং যা না হলে ওযু শুদ্ধ হবে না তা-ই ওযুর ফরয বলে স্বীকৃত। আলিমগণ এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পোষণ করেছেন। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

○ মতামতসমূহ

● হানাফীদের নিকট ওযুর ফরয চারটি।[৩০৭] মুখমণ্ডল ধৌত করা, কনুইসহ হাত ধৌত করা, মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা এবং টাখনুসহ পা ধৌত করা।

● মালিকীদের নিকট ওযুর ফরয সাতটি।[৩০৮] নিয়্যত করা, মুখমণ্ডল ধৌত করা, কনুইসহ হাত ধৌত করা, সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা, টাখনুসহ পা ধৌত করা, এক অঙ্গ ধোয়ার পর তা শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা, ওযুর স্থানে পানির সাথে হাত বুলিয়ে নেয়া।

● শাফে'য়ীদের মতে ওযুর ফরয ছয়টি।[৩০৯] নিয়্যত করা, মুখমণ্ডল ধৌত করা, কনুইসহ হাত ধৌত করা, সামান্যতম মাথা মাসেহ করা, টাখনুসহ পা ধৌত করা এবং তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

● হাম্বলীদের নিকট ওযুর ফরয ছয়টি।[৩১০] মুখমণ্ডল ধৌত করা, কনুইসহ হাত ধৌত করা, মাথা মাসেহ করা, টাখনুসহ পা ধৌত করা, তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং এক অঙ্গ ধোয়ার পর তা শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা।

○ মতবিরোধের কারণ

এ মতবিরোধের কারণ হিসেবে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়কে নির্ধারণ করতে পারি :

---

৩০৭. আব্দুর রহমান আল-জাযিরী, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ১/৫৪।

৩০৮. পূর্বোক্ত, ১/৫৭।

৩০৯. পূর্বোক্ত, ১/৫৯।

৩১০. পূর্বোক্ত, ১/৬০।

www.waytojannah.com

১. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কোন কোন অব্যয়ের অর্থ নির্ধারণে মতপার্থক্য। যেমন, بِرُؤُوْسِكُمْ এর باء এবং واو কি ধারাবাহিকতার উপর প্রমাণবহ কি না তা নির্ধারণে মতপার্থক্য।

২. পবিত্র কুরআনে ওযু করার জন্য যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার উপর হাদীসে বর্ণিত কোন কিছু বাড়ানো যাবে কি না?

৩. যদি যায় তবে সেটি কোন ধরনের দলীল দ্বারা সম্ভব? মুতাওয়াতির কিংবা মাশহুর হাদীসের প্রয়োজন হবে। নাকি খবরে ওয়াহিদ দ্বারাও সম্ভব?

৪. বিভিন্ন হাদীসে ওযুর যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, তাতে কোথাও কম-বেশী বর্ণনা রয়েছে। প্রত্যেক ইমাম তার কাছে যা এসেছে সে অনুসারে মতামত পেশ করেছেন।

৫. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় যা যা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তা কোন পর্যায়ের বিধান হবে সেটা নিরূপণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য।

○ দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্‌র দলীল হচ্ছে, পবিত্র কুরআনের বাণী :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ٠

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসেহ কর এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও।" [সূরা আল-মায়িদাহ : ৬]

সূরা আল-মায়িদাহ্-এর এ আয়াতের হুকুম অকাট্য। সুতরাং এগুলোই ফরয। আর অন্যান্য হাদীসে যে অতিরিক্ত বর্ণনা এসেছে সেগুলো ফরয নয়। ওয়াজিব অথবা সুন্নাত হিসেবে ধর্তব্য হবে। কারণ, কুরআনের মর্যাদা হাদীসের চেয়ে বেশি। হাদীস দিয়ে কুরআনের আদেশের মধ্যে বর্ধিতকরণ সম্ভব নয়। করলে কুরআনের আদেশের ক্ষেত্রে রহিতকরণের বিধান আপতিত হয়। সুতরাং ফরয চারটিই থাকবে।

ইমাম মালিক ও অন্যান্য সকল ইমামও উপরোক্ত আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে থাকেন। তবে তাদের নিকট এর বাইরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে যে সমস্ত কথা ও কাজের বর্ণনা এসেছে, সেগুলোও ফরয হিসেবে ধর্তব্য হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ওযুর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, তা হচ্ছে,

www.waytojannah.com

১. উসমান ইবন্ আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩১১]

سُئِلَ ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأُتِىَ بِمِضَاةٍ فَاَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِى الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بُطُوْنَهُمَا وَظُهُوْرَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُوْنَ عَنِ الْوُضُوْءِ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ

قَالَ اَبُوْ دَوُدُ اَحَادِيْثُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ اَنَّهُ مَرَّةً فَاِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا وَقَالُوْا فِيْهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوْا فِىْ غَيْرِهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا عِيْسَى اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى عَلْقَمَةَ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا اِلَى الْكُوْعَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَذَكَرَ الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُوْنِى تَوَضَّأْتُ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ وَاَتَمَّ ٠

২. আলী ইবন্ আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩১২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلِىٌّ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَقَدْ اَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيْكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَاَصْغَى الْاِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَاَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْاُخْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى الْاِنَاءِ جَمِيْعًا فَاَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ اَلْقَمَ اِبْهَامَيْهِ مَا اَقْبَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُوْرَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيْعًا فَاَخَذَ حَفْنَةً

---

৩১১. বুখারী : ১৬৪; মুসলিম: ২২৬; আবূ দাউদ : ১০৮, ১০৯।

৩১২. আবূ দাউদ: ১১৫; নাসায়ী: ৯২।

www.waytojannah.com

Contents

مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذلك قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيْثَ عَلِيٍّ لِأَنَّهُ قَالَ فِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيْهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا .

وَفِيْ رِوَايَةٍ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَا : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيْ : عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّ فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّ مَايُرِيْدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا فَأَتَى بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنَ الْكَفِّ الَّذِيْ يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ هٰذَا .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : عن عبد خير قال : صلينا الغداة فأتيناه فجلسنا اليه [اى علي] فدعا بوضوء فأتى بركوة فيها ماء وطست قال فافرغ الركوة على يده اليمنى فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا بكف كف ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم وضع يده في الركوة فسح بها رأسه بكفيه جميعا مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبيكم ﷺ فاعلموه .[৩১৩]

---

৩১৩. মুসনাদে আহমাদ: ১/১২২

www.waytojannah.com

৩. আবদুল্লাহ ইবন্ যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩১৪]

ففی روایة البخاری عن عبد اللّٰه بْنِ زَیْدٍ اَنَّهُ اَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلٰی یَدَیْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ اَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا . فَغَسَلَ یَدَیْهِ اِلَی الْمِرْفَقَیْنِ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا اَقْبَلَ وَمَا اَدْبَرَ ، وَغَسَلَ رِجْلَیْهِ اِلَی الْكَعْبَیْنِ ، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، ﷺ .

وَفِی رِوَایَةٍ لَهُ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ اَتٰی رَسُوْلَ اللّٰهِ . ﷺ . فَاَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِیْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَیَدَیْهِ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِهِ وَاَدْبَرَ ، وَغَسَلَ رِجْلَیْهِ .

وَفِیْ وَرِیَةٍ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاءُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَیْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِیَّ یَذْكُرُ اَنَّهُ رَأَی رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَیَدَهُ الْیُمْنٰی ثَلاَثًا وَالْاُخْرٰی ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَیْرِ فَضْلِ یَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَیْهِ حَتّٰی اَنْقَاهُمَا .

৪. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩১৫]

قال احمد بن منیع : ثنا ابو بدر ، عن عمرو بن قیس ، عن رجل ، عن عمرو بن شعیبه عن ابیه ، عن جده قال : جاء اعرابی إلی النبی ﷺ . فقال : یا رسول اللّٰه ، اخبرنی عن الوضوء ؟ فدعا بماء فغسل كفیه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعیه ثلاثة ومسح برأسه وأذنیه یدا بمؤخر رأسه ثم بمقبله ثم ادخل اصبعیه فی أذنیه . قال ابو بدر : لا ادری اذكر مرة او مرتین او ثلاثا . ثم غسل رجلیه ، ثم قال : هكذا الوضوء ، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم . او ظلم رأساءَ .

قلت : رواه ابوداؤد فی سننه بتمامه دون قوله : یدا بموخر أرسه ثم بمقبله ، ورواء النسائی وابن ماجه باختصار ، كلهم من طریق موسی ابن ابی عائشة ، عن عمرو بن شعیب به .

---

৩১৪. বুখারী : ১৮৫, ১৯১, ১৮৬, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯; মুসলিম : ২৩৬।

৩১৫. আবূ দাউদ : ১৩৫; ইতহাফুল খিয়াতুল মাহারাহ বি যাওয়ায়িদিল মাসানিদিল আশারাহ, ১/৮৮।

www.waytojannah.com

Contents

وفى رواية : ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين فى اذنه ، ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه ، اخرجه ابو داود والنسائى ، وصححه ابن خزيمة ٠

৫. রুবাই'য় বিনতে মু'আওয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা :[৩১৬]

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْنَا فَحَدَّثَنَا اَنَّهُ قَالَ اسْكُبِى لِىْ وَضُوْءًا فَذَكَرَتْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فِيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا . قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مَعْنَى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَقِيْلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِىْ بِشْرٍ قَالَ فِيْهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ٠

৬. আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩১৭]

عنى ابى امامة قال : توضأ النبى ﷺ فغسل وجهه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس ٠

৭. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩১৮]

عن ايوب بن عبد الله ابو خالد القرشى قال : رأيت الحسين بن ابى الحسن دعا بوضوء بكوز فجى ، من ماء فصب فى تور فغسل يديه ثلاث مرات ومضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه الى المرفقين ثلاث مرات ومسح رأسه ومسح اذنيه وخلل لحيته وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال حدثنى انس بن مالك ان هذا وضوء رسول الله ﷺ ٠

الأحاديث المختارة للضياء المقدسى ٠ (م/٤٤٥)

عن ابى محمد الحمانى قال رأيت انس بن مالك بالزاوية فقلت اخبرنى عن وضوء رسول الله ﷺ كيف كان فإنه بلغنى انك كنت توضئته قال نعم فدعا بوضوء

৩১৬. আবূ দাউদ : ১২৬।

৩১৭. তিরমিযী : ৩৫।

৩১৮. সুনান দারা কুতনী : ১/১০৬।

www.waytojannah.com

فأتى بطست وبقدح تحت كما نحت في ارضه فوضع بين يديه فأكفأ على يده من الماء فانعم غسل كفيه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم اخرج يده اليمنى فغسلها ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة غير انه امرهما على اذنيه فمسح عليهما ثم ادخل كفيه في الماء ·

৮. আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩১৯]

عن ابن عباس قال : اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ ؟ فدعا بأناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه واذنيه ·

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ·

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ·

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ·

৯. মিকদাদ ইবন মা'দীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩২০]

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، وَفِي رِوَايَةٍ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ

৩১৯. আবূ দাউদ, ১৩৭; নাসায়ী: ১০১, ১০২।

৩২০. আবূ দাউদ : ১২১।

www.waytojannah.com

Contents

الله ﷺ توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما الى المكان الذى منه بدا ، وفى رواية : ومسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وادخل اصابعه فى صماخ اذنيه ·

১০. বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা :[৩২১]

عن يزيد بن البراء بن عازب قال : قال ابى : احجتمعوا فلا ريكم كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ وكيف كان يصلى فإنى لا ادرى ما قدر صحبتى اياكم قال فجمع بنيه وأهله ودعا بوضوء فمضمض واستنثق وغسل وجهه ثلاثا وغسل اليد اليمنى ثلاثا وغسل يده هذه ثلاثا يعنى اليرسى ثم مسح رأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل هذه الرجل يعنى اليمنى ثلاثا وغسل هذه الرجل ثلاثا يعنى اليسرى قال هكذا ما الوت ان اريكم كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ ثم دخل بيته فصل صلاة لا ندرى ما هى ثم خرج فأمر بالصلاة فأقحت فصل بنا الظهر فاحسب انى سمعت منه ايات من يس ثم صلى العصر ثم صلى بنا المغرب ثم صلى بنا العشاء وقال ما ألوت ان اريكم كيف رسول الله ﷺ يتوضأ وكيف كان يصلى ·

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোই ওযুর ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এসেছে। সেগুলোর ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে।

○ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

ওযুর ফরয নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে। কোন কোন স্থানে শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে কোন কোন মতকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে কোন মতকে অপর মতের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। পরবর্তী বিভিন্ন মাসআলায় আমরা সেটার প্রতিফলন দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ্।

মাথা মাসেহ-এর পরিমাণ

○ মাসআলার পূর্ণরূপ

আলিমগণ সকলে একমত যে, মাথা মাসেহ করা ওযুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। (তাঁরা সকলে এ বিষয়ে একমত যে, মাথা মাসেহ-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে, পুরো মাথা মাসেহ

৩২১. মুসনাদে আহমাদ : ৪/২৮৮।

www.waytojannah.com

করা; কেননা সহীহ হাদীসে তা এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মাথা মাসেহ-এর ফরয কতটুকু? কতটুকু মাসেহ করলে ওযুর জন্য তা যথেষ্ট হবে? এ ব্যাপারে আলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

○ **মতামতসমূহ**

● ইমাম মালিক (রহ) ও ইমাম আহমদ রাহেমাহুমাল্লাহ্-এর মতে পুরো মাথা মাসেহ করা ওয়াজিব।

● ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম মালিক (রহ)-এর কতিপয় শিষ্য ও আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে, মাথার আংশিক মাসেহ করা ফরয। তবে এ অংশ নির্ধারণে আবার কয়েকটি মত রয়েছে :

১. ইমাম মালিক (রহ)-এর কয়েকজন এই অংশটিকে এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা সীমিত করেছেন।

২. তাঁদের কেউ কেউ দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত করেছেন।

৩. ইমাম আবূ হানিফা (রহ) মাথা সম্পর্কে বলেন, এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করতে হবে। তার সাথে সাথে যে হাত দিয়ে মাসেহ করা হবে তার পরিমাণও নির্ধারণ করে বলেন, যদি তিন আঙ্গুলের চেয়ে কম অংশ দ্বারা মাসেহ করা হয়, তাহলে মাসেহ যথেষ্ট হবে না।

৪. ইমাম শাফে'য়ী (রহ) মাসেহকারী ও মাসেহকৃত স্থান, কোন একটিরও সীমা নির্ধারণ করেননি।

○ **মতবিরোধের কারণ**

এখানে মতবিরোধের কারণ হিসেবে আমরা দু'টি বিষয় নির্ধারণ করতে পারি :

১. পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ এখানে باء শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ। কেননা,

ক. এ অব্যয়টি কখনো অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী : تُنْبِتُ بِالدُّهْنِ এর تاء বর্ণে ضمة ও باء বর্ণে كسرة যে ক্বেরাত অনুযায়ী।

খ. আবার কখনো এ অব্যয়টি কোন কিছুর অংশকে বোঝায়। যেমন, أخذت بثوبه "আমি তার কাপড় ধরলাম" অর্থাৎ তার কাপড়ের আংশিক ধরলাম। এ অর্থে الباء অব্যয়টির ব্যবহার কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

২. কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ মাথা মাসেহ করেছেন। সুতরাং এটা নির্ধারণে মতবিরোধ হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয হিসেবে নাকি সুন্নাত হিসেবে ছিল।

www.waytojannah.com

কারণ, আরবী ভাষায় ব্যবহৃত 'বা' (باء) অব্যয়টি দু'টি অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। তা হলো (ক) অতিরিক্ত (খ) আংশিককরণ।

সুতরাং যারা মনে করেন এ অব্যয়টি উক্ত আয়াতে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁরা পুরো মাথা মাসেহ করা আবশ্যক করেছেন। আর যারা এ অব্যয়টিকে আংশিককরণ অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাঁরা মাথার কিছু অংশ মাসেহ করা অত্যাবশ্যক করেছেন।

○ **দলীল-প্রমাণাদি**

ইমাম মালিক ও আহমাদ ইবন হাম্বলের পক্ষে দলীল :

উপরোক্ত আয়াতে باء অব্যয়টি অতিরিক্ত অথবা বর্ণনামূলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ মাথাই মাসেহ করতে হবে।

তাছাড়া সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবন্ যায়েদ (রা)-এর হাদীসে এসেছে : 'অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। তিনি প্রথমে দু'হাত সামনে থেকে পিছনে নিলেন। অতঃপর পিছন থেকে সামনে আনলেন। তিনি দু'হাত দিয়ে মাথার অগ্রভাগ থেকে ঘাড়ের পশ্চাৎ দিক পর্যন্ত মাসেহ করেন। অতঃপর দু'হাতকে প্রারম্ভস্থল পর্যন্ত ফিরিয়ে আনেন।

ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ীর মতের পক্ষে দলীল :

ইমাম আবূ হানিফা ও শাফে'য়ীর মতে উক্ত আয়াতে باء অব্যয়টি অংশ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কিছু অংশ মাসেহ করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্র মতে এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করতে হবে, কারণ, মুগীরাহ ইবন শু'বা (রা)-এর হাদীসে এসেছে "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযু করার সময় তাঁর মাথার অগ্রভাগে ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন।"[৩২২]

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ্ উক্ত হাদীসকে সুনির্দিষ্টকরণের অর্থে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি কাজ। এর দ্বারা এটুকুই করতে হবে এমনটি বোঝায় না।

○ **প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা**

এ মাসআলায় হাম্বলী ও মালিকীগণ যে দলীল প্রদান করেছেন সেটার বিপরীতে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ্ কর্তৃক উপস্থাপিত দলীল শক্তিশালী হলেও লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, কোন হাদীসে এমন কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য আসেনি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র মাথার চার ভাগের এক

৩২২. মুসলিম : ২৭৪।

www.waytojannah.com

ভাগের উপর মাসেহ করে ক্ষান্ত হয়েছেন। বরং হাদীসদৃষ্টে দেখা যায় যে, তিনি মাথার সামনের অংশ মাসেহ করার পর বাকী অংশ পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন। এ হিসেবে সাবধানতা হিসেবে পুরো মাথা মাসেহ করাই যুক্তিযুক্ত।

কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ

○ মাসআলার পূর্ণরূপ

এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত যে, চামড়ার (পা) মোজার উপর মাসেহ করা সুন্নাত। এমনকি ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ এটাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করা যাবে কি না? আর চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে তা কাপড়ের মোজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না?

○ মতামতসমূহ

● ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের মতে, কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয।[৩২৩] ইমাম ইবন হাযমও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[৩২৪] হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও অনুরূপ মত পোসণ করেছেন।[৩২৫]

● পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা, মালিক এবং ইমাম শাফে'য়ীর মতে কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করলে ওযু হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

○ মতবিরোধের কারণ

আলোচ্য মাসআলায় এ সংক্রান্ত হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপণের ব্যাপারে মতভেদই মতবিরোধের কারণ। তাছাড়া এ ব্যাপারে সাহাবীদের যে সমস্ত আমল রয়েছে সেগুলো কি সাহাবীগণের ইজতিহাদপ্রসূত নাকি সেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে তা নির্ণয়ে মতভেদও এ মাসআলায় মতবিরোধের একটি কারণ।

অনুরূপভাবে কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসগুলো খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের, অথচ পা ধোয়ার আয়াতটি অকাট্য। সুতরাং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কি অকাট্য কোন আয়াতকে বিশেষায়িত করা যাবে কি না, এ সংক্রান্ত উসুলী বিরোধও এ মতভেদের অন্যতম কারণ।

---

৩২৩. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী: ১/৩৭৩।

৩২৪. ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা: ২/৫৭।

৩২৫. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী: ১/৩৭৪।

www.waytojannah.com

○ **দলীল-প্রমাণাদি**

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ্-এর মতের সপক্ষে দলীল হচ্ছে মুগীরা ইবন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। যেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড়ের মোজা এবং জুতোর উপর মাসেহ করেছেন।[৩২৬]

অনুরূপভাবে এ ব্যাপারে নয়জন সাহাবী থেকে বর্ণনা এসেছে যে, তাঁরা কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করেছেন।[৩২৭]

অন্যান্য ইমামের নিকট এতদসংক্রান্ত হাদীস খুব শক্তিশালী নয় যে, এর দ্বারা আল্লাহ্র কিতাবের বিধানের মোকাবেলায় দাঁড় করানো যাবে বা তাকে বিশেষায়িত করা যাবে।

○ **প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা**

চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু সে তুলনায় সাধারণ কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করা তত শক্তিশালী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া শুধুমাত্র কাপড়ের মোজায় মাসেহ করা হয়েছে এমনটি কোন হাদীসে প্রমাণিত হয়নি। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

পানিতে নাপাকি পড়ার পর যদি সে পানি পরিবর্তিত না হয়

○ **মাসআলার পূর্ণরূপ**

পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্য তিনটি : স্বাদ, গন্ধ ও রং। যে পানিতে কোন নাপাকি মিশ্রিত হয়ে পানির কোন বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন না করে, এ ধরনের পানি কি পবিত্র বা এর দ্বারা কি পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব?

○ **মতামতসমূহ**

● ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, তা পবিত্র। পানির পরিমাণ কম হোক বা বেশি।[৩২৮]

● অপরাপর আলিমের নিকট পানি কম হলে তা অপবিত্র হবে, বেশি হলে অপবিত্র হবে না। কিন্তু তারা পানির কম বা বেশি হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

ক. ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে, বেশি পানি প্রতীয়মান হয়, যখন কোন ব্যক্তি পানির এক পাশে নাড়া দেয়ার দরুন অপর পাশের পানি আন্দোলিত না হয়।[৩২৯]

---

৩২৬. আবূ দাউদ, সুনান, ১/৩৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৫২।

৩২৭. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী: ১/৩৭৪।

৩২৮. ইবনে আবদুল বার, আল-ইস্তিযকার ২/১০৩-১০৫; আল-মুগনী ১/৩৯; আল-মারদাওয়ী, আল-ইনসাফ ১/৯৮; আল-হাত্তাব, মাওয়াহিবুল জালীল ১/৭০।

৩২৯. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/৮০; আল-মুগনী ১/৩৯।

www.waytojannah.com

খ. ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমাদের মতে, বেশি পানির পরিমাণ 'হাজার' অঞ্চলের দুই মটকা সমপরিমাণ। আর তা হলো প্রায় পাঁচশত রিতিল সমপরিমাণ।[৩৩০]

গ. কোন কোন ইমাম এর কোন সীমা নির্ধারণ করেন নি।[৩৩১]

ঘ. কোন কোন ইমাম থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, এই পানি ব্যবহার মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।[৩৩২]

○ **মতানৈক্যের কারণ**

এ বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্যের কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে বাহ্যিক পরস্পর বিরোধী হাদীসের বর্ণনা।

○ **দলীল-প্রমাণাদি**

অল্প নাপাকি ক্রিয়াশীল-এ মতের প্রবক্তাদের দলীল :

১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إذا استيقظ أحدكم من نومه . الحديث

"যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তবে সে যেন তার হাত পানির পাত্রে না ডুবিয়ে দেয় কেননা সে জানে না তার হাত কোথায় ছিল।"[৩৩৩]

এ হাদীসে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, সামান্য নাপাকি অল্প পানিকে নাপাক করে দেয়।

২. এমনিভাবে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه

"তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ বা অপ্রবাহিত পানিতে প্রস্রাব করে তাতে গোসল না করে।"[৩৩৪]

বাহ্যত এ হাদীসও ইঙ্গিত বহন করে যে, সামান্য নাপাক অল্প পানিকে অপবিত্র করে দেয়। কারণ, যদি তা না হত তবে নিষেধ করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

৩. তাছাড়া তারা হাদীস দিয়েও দলীল দেন, যাতে বদ্ধ পানিতে জুনুব বা সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র ব্যক্তির গোসল করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে :

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال يتناولها تناولا .

---

৩৩০. আল-মুগনী ১/৩৯।

৩৩১. আল-ইস্তেযকার ২/১০০।

৩৩২. মাওয়াহিবুল জালীল ১/৭০।

৩৩৩. বুখারী, ১৬২; মুসলিম : ৩৭৮।

৩৩৪. বুখারী, ৩৩৯; মুসলিম : ২৮২।

"তোমাদের কেউ সম্পূর্ণ অপবিত্র হলে যেন বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে কি করবে? তিনি বললেন, একটু একটু করে গ্রহণ করবে।"[৩৩৫]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায় যে, নাপাকি পড়লে পানি অপবিত্র হয়ে যায়; সুতরাং সে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে যারা বলেন যে, সামান্য নাপাকি পড়া পানিতে কোন প্রভাব ফেলে না, এ মতের প্রবক্তাদের দলীল :

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস

ان أعرابيا قام الى ناحية المسجد فبال فيها ، فصاح به الناس فقال رسول الله ﷺ دعوه فلما فرغ امر رسول الله ﷺ بذنوب ماء فصب على بوله · متفق عليه

"এক বেদুঈন মসজিদের কিনারে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগলো। ফলে লোকেরা হৈচৈ শুরু করলো। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। লোকটি যখন তার কাজ সম্পন্ন করলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি বালতি পানি আনার নির্দেশ দিলেন, পানি তার প্রস্রাবে ঢেলে দেয়া হলো।"

এ হাদীসের বাহ্যিক অংশ থেকে বোঝা যায়, সামান্য নাপাকি অল্প পানিকে নষ্ট করে না। কেননা, ঐ স্থানটি উক্ত পানি ঢেলে দেয়ার দ্বারা পবিত্র হয়ে গিয়েছিল।

২. আবূ দাউদ (রহ) আবূ সা'য়ীদ খুদরী ((রা))-এর হাদীস উল্লেখ করেন :

سمعت رسول الله ﷺ يقال له انه يستاقى من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذرة الناس فقال النبى ﷺ ان الماء لا ينجسه شيء ·

"আবূ সা'য়ীদ (রা) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি যে, আপনার জন্য বুদা'আহ কূপ থেকে পানি আনা হয়। আর সেটি এমন এক কূপ যাতে কুকুরের গোশত, হায়েযের কাপড় ও মানুষের মল-মূত্র ফেলা হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় পানিকে কোন কিছু অপবিত্র করে না।"

○ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

আলিমগণ এসব হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ভিন্ন দিক অবলম্বন করেছেন। ফলে তাদের মাযহাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে।

---

৩৩৫. মুসলিম : ২৮৩।

www.waytojannah.com

১. যেসব আলিম বেদুঈন সাহাবী ও আবূ সা'য়ীদ (রা)-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন, তারা বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত উক্ত উভয় হাদীস বোধগম্য নয়। বাহ্যিকভাবে বর্ণনা অনুযায়ী আমল করাটাই হলো ইবাদত।

২. অল্প নাপাক মিশ্রিত পানিকে যারা মাকরূহ বলেছেন তারা ঐ সব হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত উভয় হাদীস মাকরূহ-এর উপর এবং বেদুঈন সাহাবী ও আবূ সা'য়ীদ (রা)-এর হাদীসদ্বয় তাদের বাহ্যিকতার উপর অধিষ্ঠিত।

৩. পক্ষান্তরে ইমাম শাফে'য়ী ও আবূ হানিফা (রহ) এভাবে সমন্বয় সাধন করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত উভয় হাদীস সামান্য পানি ও আবূ সা'য়ীদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীস বেশি পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ্ কর্তৃক দুই মটকা পানি বেশি হিসেবে নির্ধারণ করার কারণ হচ্ছে, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে বলা হয়েছে,

عن ابن عمر قال : سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال : ان كان الماء قلتين ، لم يحمل خبثا .

"ইবন উমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যাতে হায়েনা জন্তু জানোয়ার ও গবাদি-পশু বিচরণ করে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যখন পানি দুই মশক হবে তখন সেটি কোন অপবিত্রতা বহন করে না।"[৩৩৬]

পানিতে পাক কিছু পড়ার পর যদি সে পানি পরিবর্তিত হয়

○ **মাসআলার পূর্ণরূপ**

জাফরান অথবা অন্য কোনো পবিত্র বস্তু পানিতে মিশ্রিত হওয়ার ফলে যদি তার তিন বৈশিষ্ট্যের কোনো একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে সে পানি সমস্ত আলিমদের নিকট পবিত্র। কিন্তু সেটা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব কি না?

○ **মতামতসমূহ**

এ জাতীয় পানির ব্যাপারে আলিমদের দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে :

ক. তা অন্যকে পবিত্রকারী নয়। এটা ইমাম মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদের অভিমত।[৩৩৭]

---

৩৩৬. আবূ দাউদ : ৬৩; তিরমিযী : ৬৭; নাসায়ী : ৫২; ইবনে মাজাহ : ৫১৭; মুসনাদে আহমাদ : ২/১২।

৩৩৭ আল-মুগনী: ১/২১।

www.waytojannah.com

Contents

খ. তা নিজে যেমন পবিত্র অন্যকেও পবিত্রকারী। যদি তার পরিবর্তন গরম করে পাকানোর কারণে না হয় অর্থাৎ রান্না করা বস্তুর সাথে না হয়।[৩৩৮] এটা ইমাম আবূ হানিফার মত। ইমাম আহমদ থেকেও অনুরূপ একটি মত রয়েছে। যা ইবন কুদামাহ ও ইবন তাইমিয়্যাহ পছন্দ করেছেন।

○ **মতানৈক্যের কারণ**

এ মাসআলায় আলিমদের মতানৈক্যের কারণ হলো :

এইসব পবিত্র বস্তু মিশ্রিত পানি স্বাভাবিক পানির অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে অস্পষ্টতা।

যেসব আলিম মনে করেন, এসব পানি স্বাভাবিক পানির অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা মিশ্রিত বস্তুর দিকে সংযোগ করে বলা হয়, অমুক পানি, অমুক স্থানের পানি ইত্যাদি পানি দিয়ে ওযু করা বৈধ নয়। কেননা, ওযুর বৈধতা কেবল স্বাভাবিক পানির মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যেসব আলিম মনে করেন, এসব পানি স্বাভাবিক পানিরই অন্তর্ভুক্ত। তারা এ ধরনের পানি দিয়ে ওযু করা জায়েয মনে করেন।

○ **দলীল-প্রমাণাদি**

এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীস থেকে সরাসরি কোন নস বা দালীলিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। উভয় পক্ষই এখানে যুক্তির সাহায্য নিয়েছেন।

যারা মনে করেন যে, এটি পবিত্রকারী নয় তাদের যুক্তি হলো :

১. এ ধরনের পানিকে সরাসরি পানি বলা হয় না বরং বলা হয় গোলাপ জল, দুধের পানি ইত্যাদি।

২. এ ধরনের পানি আর পানি নামে অভিহিত হয় না। কারণ, এগুলো দ্বারা পিপাসা নিবারণ করা যায় না।

৩. কেউ যদি কাউকে পানি কিনতে ওকীল করে পাঠায়, আর যদি ওকীল এ ধরনের পানি নিয়ে আসে, তবে মুআক্কিল তার ওকীল থেকে সেটা গ্রহণ করতে বাধ্য নয়।

৪. তাছাড়া এটি এমন এক পানি যা পরিত্যাগ করা সম্ভব। যেমন তরকারীর ঝোল। সুতরাং এ ধরনের পানি পবিত্রকারী নয়।[৩৩৯]

পক্ষান্তরে যারা মনে করেন যে, এগুলো দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব, তাদের যুক্তি হলো :

---

৩৩৮. আল-মুগনী : ১/২১; আল-ইনসাফ : ১/৫৬।

৩৩৯. আল-মুগনী : ১/২২, শারহু আল-মুন্তাহা, পৃ. ৫৮।

www.waytojannah.com

১. আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "যদি তোমরা পানি না পাও তবে তায়াম্মুম কর।" [সূরা আন-নিসা : ৪৩, আল-মায়িদাহ : ৬] আর এগুলো অবশ্যই এক প্রকার পানি সুতরাং এগুলোর উপস্থিতিতে তায়াম্মুম করা সিদ্ধ হতে পারে না। কারণ আয়াতে ماء শব্দটিকে نكرة হিসেবে আনা হয়েছে, যা عام বা ব্যাপক। আর ব্যাপকার্থে এ ধরনের পানিও এক প্রকার পানি।

২. হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন,

ان الصعيد الطيب طهور مالم تجد الماء ولو إلى عشر حجج فاذا وجدت الماء فأمس بشرتك ·

"যতক্ষণ পানি না পাও ততক্ষণ তোমার জন্য মাটিই পবিত্রতা লাভের মাধ্যম হিসেবে যথেষ্ট যদিও তা দশ বছর হয়। তারপর যখনই পানি পাবে তখনই তা নিজের শরীরে লাগাও।"[৩৪০] আর যার কাছে উপরোক্ত ধরনের পানি থাকবে সে অবশ্যই পানি পেয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। সুতরাং তার জন্য তায়াম্মুম নয়।

৩. অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম তাদের সফরে অধিকাংশ সময়ে চামড়ার প্যাকেটে পানি নিতেন। সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে যেত। তাঁদের কাছ থেকে এরকম কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, তারা সে সমস্ত পানি দ্বারা ওযু না করে তায়াম্মুম করেছিলেন। সুতরাং সেগুলো দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব।

৪. তাছাড়া এ ধরনের পবিত্র পানিতে পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হওয়া, যেমন পানিতে তেল পড়া। সুতরাং এগুলো দ্বারা ওযু করা যাবে না এমনটি বলা যায় না।[৩৪১]

○ **প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা**

উপরোক্ত সমস্ত যুক্তি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এ ধরনের পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয এবং এগুলো অবশ্যই পবিত্রকারী। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো থেকে পানির বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে না, ততক্ষণ সেগুলো পানির হুকুম থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা নয়। তাছাড়া ওযুর জন্য পবিত্র পানি শর্ত। কোন পবিত্র কিছু সেটাতে মিশতে পারবে না এমন কোন শর্ত কোথাও আসে নি।

তবে মিশ্রণের কম বা বেশি হওয়ার ব্যাপারটিও এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যদি খুব বেশি মিশ্রিত হয়ে থাকে তবে সেটা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।[৩৪২] কারণ,

---

৩৪০. মুসনাদে আহমাদ : ৫/১৪৬।

৩৪১. আল-মুগনী : ১/২১-২২।

৩৪২. ইবনে রুশদ : বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৫৮।

www.waytojannah.com

তখন সেটার নামই পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন, রং, কালি বা ঝোল। এ সমস্ত ব্যাপারে আলিমগণ একমত যে, এগুলো দ্বারা ওযু শুদ্ধ হবে না।[৩৪৩]

পবিত্রতায় ব্যবহৃত হওয়ার পর সে পানির বিধান

○ মাসআলার পূর্ণরূপ

কোন পবিত্র পানি দিয়ে কেউ ওযু বা গোসল করল। সে পানির বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে তা দিয়ে কি আবার পবিত্রতা অর্জন করা যাবে?

○ মতামতসমূহ

পবিত্রতায় ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে ইমামদের তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়। তা হলো :

১. কেউ কেউ কোন অবস্থাতেই এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ মনে করেন না। এটি ইমাম শাফে'য়ী, আবূ হানিফা ও আহমদ (রহ)-এর মাযহাব।[৩৪৪]

২. কোন কোন ইমামের মতে, এ ধরনের পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন মাকরূহ। তবে এ পানির উপস্থিতিতে তায়াম্মুম বৈধ মনে করেন না। এটি ইমাম মালিক (রহ) ও তাঁর অনুসারীদের মাযহাব।[৩৪৫]

৩. কেউ কেউ এ ধরনের পানি ও স্বাভাবিক পানির মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য মনে করেন না। এটি আবূ সাওর, দাউদ ও তাঁর অনুসারীদের মতামত।[৩৪৬] অনুরূপভাবে এটি ইমাম আবূ হানিফা, শাফে'য়ী ও আহমদ থেকে দ্বিতীয় আরেকটি মত।

৪. ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ্ এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমী মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের পানি অপবিত্র।[৩৪৭]

○ মতানৈক্যের কারণ

এ বিষয়ে মতানৈক্য হয়ত এ কারণে হয়েছে যে, স্বাভাবিক পানি এ ধরনের পানিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এমনকি কেউ কেউ এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে মনে করেন, এ পানিকে পানি না বলে এঁটো বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

তাছাড়া মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণ হলো : طهور (তাহুরুন) বা 'পবিত্রকারী' শব্দটি কি পুনঃপুনঃ পবিত্রতা অর্জনের অর্থে ব্যবহৃত হয় কি না।

---

৩৪৩. ইবনে কুদামাহ : ১/২০।

৩৪৪. আল-মুগনী : ১/৩১; আন-নাওয়াবী, আল-মাজমূ' ১/১৫১।

৩৪৫. মাওয়াহিবুল জালীল, ১/৬৬।

৩৪৬. আল-মুগনী : ১/৩১; ইমাম ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা ১/১৮৩।

৩৪৭ আল-হিদায়া, ফাতহুল কাদীর ও ইনায়াসহ ১/৮৮, ৮৯।

www.waytojannah.com

○ **দলীল-প্রমাণাদি**

যাঁরা বলেন, طهور এ শব্দগঠনটি فعول এর ওজনে হওয়ায় ক্রিয়া আধিক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তারা বলেন, যা পবিত্র পানি দ্বারা পুনঃ পবিত্রতা দাবি করে। তারা তাদের মতের সপক্ষে আরও দলীল দেন যে,

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ان الماء لا يجنب বা "পানি অপবিত্রতা বহন করে না।"[৩৪৮]

২. রুবায়্যি' (রা) থেকে ওযুর পদ্ধতি বর্ণনা সম্বলিত হাদীসে এসেছে, ومسح راسه بما بقى من وضوئه فى يديه مرتين "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে দুবার মাথা মাসেহ করেছেন।"[৩৪৯]

৩. হাদীসে এসেছে, واذا توضأ النبى ﷺ كادوا يقتتلون على وضوئه অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাঁর ওযুর পানির বাকী অংশ নিয়ে কাড়াকাড়িতে লিপ্ত হয়ে পড়তেন।[৩৫০] যদি তাই হয়, তবে সে বাকী পানিতে ওযুতে ব্যবহৃত কিছু না কিছু পানি অবশ্যই পড়ে থাকবে। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওযুর পানির বাকী অংশ নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতায় ব্যবহৃত পানি নাপাক নয়, বরং পবিত্রকারী।

পক্ষান্তরে যেসব ইমাম মনে করেন যে, فعول শব্দগঠনটি পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তাঁরা বলেন طهور শব্দটি ঐ সব জিনিসের নাম যা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা হয়। সুতরাং এ পানি দিয়ে পুনঃ পবিত্রতা অর্জন সমীচীন হবে না। তাদের দলীল :

১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, لا يغتسل احدكم فى الماء الدائم وهو جنب "তোমাদের কেউ যেন অপবিত্র অবস্থায় বদ্ধ বা অপ্রবাহিত পানিতে গোসল না করে।"[৩৫১] মূলত এ ধরনের পানি থেকে বারণ করার উদ্দেশ্য হলো, যেন তা ব্যবহৃত পানি না হয়ে যায়।

---

৩৪৮. আবূ দাউদ : ৬২; তিরমিযী : ৬৫; ইবনে মাজাহ : ৩৭০। হাদীসের অর্থ বর্ণনায় আল্লামা মানাভী বলেন, بضم اوله اى : لا ينتقل له حكم بالجنابة "আল-মানাভী: আত-তাইসীর শারহুল জামিউস সাগীর, ১/৬০৪। কোন কোন আলিম এর ব্যাখ্যায় বলেন, اى لا يتنجس باستعمال الجنب منه ولا يظهر فيه اثر جنابته "অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তির ব্যবহারের কারণে এটি নাপাক হয়ে যায় না।" মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী: শারহু সুনানি ইবন্ মাজাহ ১/১৩২।

৩৪৯. মুসনাদে আহমাদ ৬/৩৫৮।

৩৫০. বুখারী : ১৭৮।

৩৫১. মুসলিম : ২৮৩।

www.waytojannah.com

২. তাঁরা আরো বলেন, এ পানি দিয়ে নামাযের প্রতিবন্ধক বস্তু দূরীভূত করা হয়েছে। তাই এ পানি পুনঃ পবিত্রতা অর্জনে ব্যবহার করা যথেষ্ট হবে না। যেমন নাপাকি দূরীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানিকে পুনঃ ব্যবহার করা যায় না।

এ মতের ধারকরা আবার নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ হাদীসসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এ জাতীয় পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকে মাকরূহ বলেছেন।

○ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপর্যুক্ত মতামত ও দলীল পেশের পর আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, উভয় পক্ষেই শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। তবে সুস্পষ্টভাবে এ ব্যবহৃত পানি পবিত্রকারী বলার মত কোন 'নস' নেই। যা ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্‌র দ্বিতীয় আরেকটি মত। কিন্তু অনেকের মনে এ ধরনের পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খটকা লাগে বলেই এ ধরনের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকে মাকরূহ বলেছেন।

মানুষ ও গৃহপালিত চতুষ্পদ হালাল জন্তু ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পানীয়ের বিধান

○ মাসআলার পূর্ণরূপ

মুসলিম ব্যক্তির[৩৫২] এবং চতুষ্পদ হালাল জন্তুর উচ্ছিষ্ট পানি[৩৫৩] পাক হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে উপরোক্ত দু'শ্রেণীর উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী যেমন : কুকুর, বাঘ, ভালুক, গাধা ইত্যাদি এবং অমুসলিমের উচ্ছিষ্ট পানির হুকুম কি? সেটা দিয়ে কি পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব?

○ মতামতসমূহ

ক. চতুষ্পদ হালাল জন্তু ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে মতামত :

১. ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ্ মনে করেন, সমস্ত প্রাণীর উচ্ছিষ্টই পবিত্র। এটিই ইমাম মালিক-এর মাযহাব।[৩৫৪]

২. ইমাম মালিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায়, পবিত্রতার বিধান থেকে তিনি শুধু শূকরকে পৃথক করেছেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র শূকরের উচ্ছিষ্ট ব্যতীত সমস্ত প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পানিই পবিত্র। কারণ শূকরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।[৩৫৫]

---

৩৫২. আল-মাজমূ' : ১/১৭২; মাওয়াহিবুল জালীল ১/৫১।

৩৫৩. আল-মুগনী: ১/৭০।

৩৫৪. আল-মুগনী : ১/৬৪; আল-ইস্তিযকার ২/২১১,২১২; মাওয়াহিবুল জালীল ১/৫১।

৩৫৫. আল-ইস্তিযকার ২/১১৫।

www.waytojannah.com

৩. কেউ কেউ তা থেকে শূকরসহ কুকুরকেও পৃথক করেছেন। এটি ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এর মাযহাব।[৩৫৬]

৪. আবার কোনো কোনো আলিম উক্ত বিধান থেকে সমস্ত হিংস্র প্রাণীকে পৃথক করেছেন।[৩৫৭]

৫. এক শ্রেণীর আলিম এই মত পোষণ করেন যে, উচ্ছিষ্টের বিধান প্রাণীর গোশতের অনুযায়ী, যদি গোশত হারাম হয় তাহলে উচ্ছিষ্ট নাপাক। আর যদি গোশত মাকরূহ হয় তাহলে উচ্ছিষ্টও মাকরূহ। গোশত যদি হালাল হয় তাহলে উচ্ছিষ্টও পবিত্র। এটিই ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আহমদ রাহেমাহুল্লাহ্-এর মত।[৩৫৮]

খ. মুশরিকের উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে মতামত

১. কেউ কেউ বলেন, তা অপবিত্র। এটি ইমাম মালিক (রহ)-এর মাযহাব ও আহমদ (রহ) থেকে একটি বর্ণনা।[৩৫৯]

২. কেউ কেউ বলেন, তা মাকরূহ। যদি সে মুশরিক মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকে।[৩৬০]

৩. আবার কেউ কেউ বলেন, মুশরিকের উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র, যদি পান করার সময় মুশরিকের মুখে মদ অথবা অন্য কোনো অপবিত্র জিনিস না থাকে। আর এটিই অধিকাংশ আলিমের মত।[৩৬১]

---

৩৫৬. আল-মাজমূ' : ১/১৭১, ১৭৩; আশ-শারহুল কাবীর মা'আল ইনসাফ ২/৩৫৫।

৩৫৭. ইবনে রুশদ আল-জাদ্দ, আল-মুকাদ্দিমাত ১/২০।

৩৫৮. আল-হিদায়া মা'আ ফাতহিল কাদীর ১/১০৯-১১৮, আল-মাজমূ' ১/১৭৩।
উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানিফার নিকট জীব জন্তু চার প্রকার :
১. যাদের গোশত খাওয়া হালাল, তাদের উচ্ছিষ্ট পানীয়ও পবিত্র। ২. হিংস্র জন্তু; যেমন: বাঘ, হায়েনা, ভাল্লুক ইত্যাদি, এগুলোর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। অনুরূপভাবে কুকুর ও শূকর। ৩. হিংস্র পাখি, যেমন বাঘ, শকুন ইত্যাদি, এগুলোর উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র হলেও ব্যবহার করা মাকরূহ, অনুরূপভাবে বিড়াল ও ইঁদুর। ৪. খচ্চর ও গৃহপালিত গাধা; এগুলোর উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত। যদি এগুলোর উচ্ছিষ্ট পানি ব্যতীত আর কোন পানি পাওয়া না যায়; তবে ওযু ও তায়াম্মুম দু'টিই করতে হবে। ঘোড়ার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফার ভিন্ন ভিন্ন মত এসেছে, তবে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে যে, ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পবিত্র। [ফাতহুল কাদীর: ১/১০৯-১১৮]
অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদও ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্-এর কাছাকাছি মত পোষণ করে থাকেন। তাঁর মতে: ১. যাদের গোশত খাওয়া হালাল, তাদের উচ্ছিষ্টও পবিত্র। ২. হিংস্র জন্তু এবং কুকুর ও শূকরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। ৩. তবে তিনি হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্টকে অপবিত্র বলে থাকেন। ৪. অনুরূপভাবে গৃহপালিত গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্টকেও অপবিত্র মনে করেন। ৫. কিন্তু তিনি বিড়াল ও তার থেকে ছোট পর্যায়ের সৃষ্টির উচ্ছিষ্টকে অপবিত্র মনে করেন না। [আল-ইনসাফ: ১/৩৫৪-৩৫৮]

৩৫৯. ইমাম মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ্ ১/৬, ১৪; ইমাম তাহাভী, মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, পৃ. ১২১; ইবন্ জুযাই, আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ৩৪; আল-ইনসাফ: ২/৩৬২।

৩৬০. ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১/৫০।

৩৬১. আল-মুগনী : ১/৬৯; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ পৃ. ৩৪; আবূল ওয়ালিদ আল-বাজী, আল-মুন্তাকা ১/৫৬।

www.waytojannah.com

○ মতানৈক্যের কারণ

এ বিষয়ে তাঁদের মতানৈক্যের তিনটি কারণ

১. কিতাবুল্লাহর বাহ্যিক আয়াতের সাথে কিয়াসের বিরোধ।

২. 'আসার' তথা সাহাবা ও তাবেয়ীদের থেকে আগত বর্ণনাসমূহের সাথে কিয়াসের সাংঘর্ষিক হওয়া।

৩. 'আসার' তথা সাহাবা ও তাবেয়ীদের থেকে আগত বর্ণনাসমূহ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়া।

○ উপর্যুক্ত কারণসমূহের ব্যাখ্যা ও দলীল-প্রমাণাদি

১. কিতাবুল্লাহর বাহ্যিক আয়াতের সাথে কিয়াসের বিরোধপূর্ণ হওয়ার বর্ণনা:

সমস্ত প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পবিত্রতা প্রমাণকারী কিয়াস হলো : শরীয়তের দৃষ্টিতে যবেহ করা ব্যতীত কোনো প্রাণীর স্বাভাবিক মৃত্যুই হলো ঐ প্রাণীর নাপাক হওয়ার কারণ। সুতরাং কোনো প্রাণীর জীবিত থাকাটাই তার পবিত্রতার কারণ। অতএব, প্রত্যেক প্রাণীই পবিত্র। সুতরাং তাদের উচ্ছিষ্টও পবিত্র।

পক্ষান্তরে এই কিয়াসের সাথে শূকর ও মুশরিক-এর ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহর আয়াত সাংঘর্ষিক :

ক. শূকরের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন : فَإِنَّهُ رِجْسٌ "নিশ্চয়ই ইহা অপবিত্র।" (আল-আনআম : ১৪৫)

যা অপবিত্র তা নাপাক, তাই এক শ্রেণীর আলিম জীবিত প্রাণী থেকে শুধু শূকরকেই পৃথক করেছেন। আর যারা শূকরকে পৃথক করেননি তারা আল্লাহর বাণীকে নিন্দার অর্থে গ্রহণ করেছেন।

খ. মুশরিক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ "নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।" (সূরা তাওবা : ২৮)

যারা এ আয়াতটিকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করেছেন তারা উপরোক্ত কিয়াস থেকে মুশরিকদেরকে পৃথক করেছেন।

২. 'আসার' তথা সাহাবা ও তাবেয়ীদের থেকে কুকুর, বিড়াল ও হিংস্র প্রাণীর ক্ষেত্রে আগত বর্ণনাসমূহের সাথে উপরোক্ত কিয়াসের সাংঘর্ষিক হওয়া :

ক. কুকুরের ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত :

اذا ولغ الكلب فى إناء احدكم فليرقه وليغسله سبع مرات وفى بعض طرقه اولاهن بالتراب وفى بعضها وعفروه الثامنة بالتراب .

www.waytojannah.com

"যদি তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয় তাহলে তোমরা তা ঢেলে দিয়ে সাতবার ধুয়ে নিবে। কোন কোন বর্ণনায় প্রথমবার মাটি দিয়ে ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে "তোমরা অষ্টমবার মাটি দিয়ে ধুয়ে নিবে।"[৩৬২]

খ. বিড়ালের প্রসঙ্গে ইবন সীরিন (রহ) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين .

"পাত্রে বিড়াল মুখ দেয়ার পর তা এক অথবা দু'বার ধোয়ার দ্বারা তা পবিত্র হয়।"[৩৬৩]

গ. হিংস্র প্রাণী সম্পর্কে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

عن ابن عمر قال : سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال ان كان الماء قلتين لم يحمل خبثا .

"একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হিংস্র ও চতুষ্পদ প্রাণীর পানীয় পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, পানি যদি দুই মটকা পরিমাণ হয় তাহলে তা নাপাকি ধারণ করে না।"[৩৬৪]

৩. 'আসার' তথা সাহাবা ও তাবেয়ীদের থেকে আগত বর্ণনাসমূহ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়া :

পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতসমূহ কিছু কিছু প্রাণীর উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়া বোঝায়, তবে অন্য কতিপয় বর্ণনা এর বিপরীত বিধান বর্ণনা করছে। যেমন,

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ঐ সমস্ত ঝর্ণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যেগুলোতে কুকুর ও হিংস্র প্রাণী অবতরণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

لها ما حملت فى بطونها ولنا ما غبر طهور .

"প্রাণীরা যা তাদের পেটে ধারণ করেছে তা তাদেরই জন্য। আর অবশিষ্ট অংশ যা আমাদের জন্য ছেড়েছে তা পবিত্র।"[৩৬৫]

---

৩৬২. মুসলিম : ২৮০; নাসায়ী : ৩৩৯।

৩৬৩. মুস্তাদরাকে হাকিম : ৫৭১ ; ত্বাহাভী, শারহু মুশকিলুল আসার ২৬৪৯; শারহু মা'আনিল আসার, ৫২; দারা কুতনী:১/৬৭, হাদীস নং ২।

৩৬৪. আবূ দাউদ : ৬৩; তিরমিযী : ৬৭; নাসায়ী : ৫২; ইবনে মাজাহ: ৫১৭; মুসনাদে আহমাদ: ২/১২।

৩৬৫. ইবনে মাজাহ: ৫১৯; ইবনুল জাওযী, আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ, ১/৬৬ (৪৬); ইবনে হাজার, তালখীসুল হাবীর, ১/২৯ (১৫); আলবানী, তামামুল মিন্নাহ পৃ. ৪৮। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

www.waytojannah.com

২. এই ধরনের বর্ণনায় ইমাম মালিক (রহ) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا .

"হে কূপের মালিক! তুমি আমাদেরকে জ্ঞাত কর না। কেননা, আমরা ও হিংস্র প্রাণী পরস্পরই ঝর্ণাসমূহতে অবতরণ করে থাকি।"[৩৬৬]

৩. আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, কাবশা (রা) ওযুর পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে পানি পানের উদ্দেশ্যে একটি বিড়াল উপস্থিত হল। আবূ কাতাদা (রা) বিড়ালটির উদ্দেশ্যে পাত্রটি কাত করে দিলে সে পানি পান করে চলে যায়। তারপর আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

انها ليست بنجس انما هى من الطوافين عليكم والطوافات .

"বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়, কেননা, তা তোমাদের নিকট অধিক পরিমাণে আনাগোনাকারী একটি প্রাণী।"[৩৬৭]

এসব বর্ণনার ব্যাখ্যা ও উপরোক্ত কিয়াসের সাথে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে আলিমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

১. ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ্‌র মতে, কুকুরের উচ্ছিষ্ট ঢেলে দিয়ে পাত্রটি ধোয়ার বিধানটি কেবলমাত্র একটি ইবাদত, যার কোন যৌক্তিক কারণ নেই।

২. ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এর মত, তিনি জীবিত প্রাণী থেকে কুকুরকে পৃথক করেছেন। কেননা বাহ্যিক হাদীস এর উচ্ছিষ্টের অপবিত্রতা প্রমাণ করে। এমনিভাবে উপরোল্লিখিত আয়াতের কারণে তিনি শূকরকেও জীবিত প্রাণী থেকে পৃথক করেছেন।

৩. ইমাম আবূ হানিফা (রহ) এর মত– তিনি হিংস্র প্রাণী, বিড়াল ও কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ মূলত এগুলোর গোশত হারাম হওয়ার কারণে বর্ণিত হয়েছে। আর নির্দিষ্ট এসব প্রাণী দ্বারা ব্যাপকতা উদ্দেশ্য। সুতরাং সমস্ত প্রাণীর উচ্ছিষ্ট তাদের গোশতের বিধান অনুসারে হবে।

○ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনার পর আমাদের নিকট ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতটিই অধিক প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। কারণ, হিংস্রতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণ। যার সাথে ক্ষতি ও অপবিত্রতার আশংকা বেশি। সুতরাং এটাকেই মূল হিসেবে ধরা যেতে পারে। আর মুশরিকের ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, আমাদের দ্বীনে যে সমস্ত

---

৩৬৬. ইমাম মালিক : মুয়াত্তা, ৪৩; দারা কুতনী : সুনান, ১৮; আবদুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ ১/৭৭।

৩৬৭. আবূ দাউদ : ৭৫; তিরমিযী : ৯২; নাসায়ী: ৬৮; মুসনাদে আহমাদ : ৫/৩০৩।

www.waytojannah.com

Contents

নিষিদ্ধ বিষয় আছে সেগুলো সম্পর্কে সাবধান থাকা। তারা যদি সেগুলো গ্রহণ না করে থাকে এবং পবিত্র থাকা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় তবে তাদের উচ্ছিষ্ট পানি অপবিত্র হবে না।

ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ

এ ব্যাপারে মূল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী : أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ "অথবা তোমাদের কেউ মল ত্যাগ করে এলো বা স্ত্রী সহবাস করল।" (নিসা : ৪৩) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী : لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ "আল্লাহ তা'আলা অপবিত্র ব্যক্তির নামায ওযু করার পূর্ব পর্যন্ত কবুল করেন না।"[৩৬৮]

আলিমগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা ওযুভঙ্গের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন; কারণ এসব বিষয়ে সহীহ বর্ণনা এসেছে। সেগুলো হচ্ছে : ১. প্রস্রাব;[৩৬৯] ২. পায়খানা;[৩৭০] ৩. বায়ু;[৩৭১] ৪. মযি;[৩৭২] ৫. অদি।[৩৭৩] এর সবগুলোই শরীর থেকে

---

৩৬৮. বুখারী: ১৩৫; মুসলিম: ২২৫; মুসনাদে আহমাদ: ২/৩০৮।

৩৬৯. পেশাব করলে ওযু ভেঙ্গে যায় এর প্রমাণ, সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। সেখানে এসেছে, كنا فى سفر فامرنا ان لا نزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من بول او نوم او غائط "আমরা সফরে ছিলাম; তখন আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন আমরা তিনদিন তিনরাত্রি পেশাব, ঘুম এবং পায়খানার কারণে আমাদের মোজাসমূহ না খুলি, তবে জানাবাতের কারণে খুলতে হবে।" [তিরমিযী: ৯৬; নাসায়ী: ১২৬; ইবনে মাজাহ: ৪৭৮; মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৩৯]

৩৭০. পায়খানা করলে ওযু ভঙ্গ হবে এর প্রমাণ, পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নিসা: ৪৩, আল-মায়িদাহ: ৬; এবং সাফওয়ান ইবন আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীস।

৩৭১. বায়ু বের হলে ওযু নষ্ট হবে, এর প্রমাণ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا وضوء الا من صوت او ريح "কোন আওয়াজ বা বাতাস বের না হলে ওযুর প্রয়োজন নেই"। [তিরমিযী: ৭৪; ইবনে মাজাহ: ৫১৫; মুসনাদে আহমাদ ২/৪৭১; সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ২৭; অনুরূপভাবে বুখারী: ১৩৭; মুসলিম : ৩৬১ ; لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا শব্দে।

৩৭২. মযি বলা হয় ঐ স্বচ্ছ সাদা হালকা আঠাল পানিকে যা যৌনাকাঙ্ক্ষার সময়ে বের হয়ে থাকে। এর দ্বারা ওযু নষ্ট হয় এর প্রমাণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, يغسل ذكره ويتوضأ "সে তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং ওযু করবে"। [মুসলিম: ৩০৩]

৩৭৩. অদি বলা হয়; ঐ সাদা ময়লা গাঢ় পানিকে, যা পেশাবের পর অথবা কোন ভারী বস্তু বহন করার পর বের হয়ে থাকে। এর দ্বারা ওযু নষ্ট হয় এর প্রমাণ, সাহাবা ও তাবেয়ীদের থেকে বিভিন্ন 'আসার' বা বর্ণনা। যেমন, ইকরিমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, هى ثلاثة المذى والودى والمنى فاما الودى فهو الذى يكون مع البول وبعده فيه غسل الفرج والوضو ايضا واما المنى فهو الماء ادفق الذى يكون فيه الشهوة ومنه يكون الولد ففيه الغسل "ইকরিমা বলেন, এগুলো তিন প্রকার; তন্মধ্যে অদি, যা পেশাবের

www.waytojannah.com

বের হয়। এ সংক্রান্ত সাতটি এমন মাসআলা আছে যেগুলোর ব্যাপারে ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন।

শরীর থেকে নির্গত নাপাকির কারণে ওযু ভঙ্গ

○ **মাসআলার পূর্ণরূপ**

শরীর থেকে কিছু কিছু জিনিস বের হয়, সে সমস্ত জিনিস বের হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান কি?

○ **মতামতসমূহ**

শরীর থেকে নির্গত নাপক বস্তু থেকে ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ তিন মাযহাবে বিভক্ত হয়েছেন।

১. তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু বের হওয়া বস্তুকে ওযু ভাঙ্গার কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কোন্ স্থান থেকে বের হলো বা কিভাবে বের হলো সেটা বড় কথা নয়। ইমাম আবূ হানিফা, তাঁর কতিপয় অনুসারী ও ইমাম আহমদ (রহ) এ মতের অনুসারী। তাঁদের মতে, শরীরের যে কোনো অংশ থেকে যে কোনভাবে নাপাকি নির্গত হয়ে বেয়ে পড়লে ওযু ভেঙ্গে যাবে। যেমন, রক্ত বের হওয়া, শিরা থেকে কোন কারণে রক্ত নেয়া, শিঙ্গার মাধ্যমে বের হওয়া রক্ত ও বমি। তবে ইমাম আবূ হানিফার মতে, কফ বা শ্লেষ্মা এর ব্যতিক্রম।[৩৭৪] ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, যদি কেউ মুখ ভর্তি করে কফ বের করে তবে তাও ওযু নষ্ট করে।[৩৭৫]

২. অপর একশ্রেণীর আলিম এক্ষেত্রে দু'নিগর্মন স্থল, সামনের পেশাবের রাস্তা ও পিছনের রাস্তা বা পায়ুপথকে বিবেচনা করে বলেন, এ দু'পথ দিয়ে যা কিছু বের হবে, চাই তা রক্ত হোক কিংবা পাথর এবং সুস্থতা কিংবা অসুস্থতা যে অবস্থায়ই বের হোক তা ওযু ভঙ্গকারী। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে হলেন– ইমাম শাফে'য়ী ও তাঁর কিছু শিষ্য।[৩৭৬]

৩. অন্য একশ্রেণীর আলিম এক্ষেত্রে নির্গত নাপাকি, নির্গত স্থল ও নির্গত হওয়ার অবস্থা বিবেচনা করে বলেন, উভয় পথ দিয়ে যেসব বস্তু স্বাভাবিকভাবে বের হয়

সাথে ও তার পরে বের হয়, তাতে লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ওযু করতে হবে। আর মনি বা বীর্য, যা সবেগে টপকে বের হয়, যাতে যৌনানুভূতি থাকে আর যাতে সন্তান হয়; এর দ্বারা গোসল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। [মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক: ১/১৫৯; মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ: ১/৯১: অনুরূপ বর্ণনা ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত। দেখুন, মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ: ১/৯২; আল-বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা: ১/১১৫]

৩৭৪. আল-মারগিনানী: আল-হিদায়া ১/৪৬।

৩৭৫. পূর্বোক্ত।

৩৭৬. আল-মুগনী ১/২৪৭।

www.waytojannah.com

(যেমন, প্রস্রাব, পায়খানা, মযি, অদি ও বায়ু ইত্যাদি) তাতে ওযু ভেঙ্গে যাবে। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ইমাম মালিক ও তাঁর অধিকাংশ শিষ্য।[৩৭৭] তাঁদের নিকট যা অস্বাভাবিকভাবে বের হবে তাতে ওযু ভাঙ্গবে না। সুতরাং ইস্তেহাযা বা মেয়েদের মাসিক সংক্রান্ত ব্যতীত রোগের কারণে বের হওয়া রক্ত, অনবরত যাদের পেশাব পড়ে তাদের সে পেশাবের কারণে ওযু ভাঙ্গবে না। অনুরূপভাবে পাথর ইত্যাদি বের হলেও তাদের নিকট ওযু ভাঙ্গবে না।

○ **মতানৈক্যের কারণ**

আলিমগণের এ বিষয়ে মতানৈক্যের কারণ হলো, বাহ্যিক আয়াত ও বাহ্যিক বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, দু'রাস্তা দিয়ে বের হওয়া প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু ও মযি ইত্যাদির কারণে ওযু ভেঙ্গে যায়। আর এ ব্যাপারে আলিমগণও একমত। কিন্তু কি কারণে শরী'আতে এগুলো বের হলে ওযু নষ্ট হবে বলেছে, তা নির্ধারণে তিনটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে :

১. ওযু করার বিধানটি কেবল সর্বসম্মত এসব বিষয়ের সাথে সংযুক্ত, এগুলো কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই শুধু এগুলোতেই ওযু নষ্ট হবে, অন্য কিছুতে ওযু নষ্ট হবে না। যেমনটি ইমাম মালিক (রহ)-এর মত।

২. এসব বিষয়ের সাথে ওযুর বিধানটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে সংশ্লিষ্ট যে, এগুলো শরীর থেকে নির্গত নাপাকি। আর নাপাকির কারণে পবিত্রতায় ব্যাঘাত ঘটে। যেমনটি ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মত।

৩. তৃতীয় সম্ভাবনা হলো : ওযুর বিধানটি এসব বিষয়ের সাথে এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংশ্লিষ্ট যে, এগুলো দু'রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু। যেমনটি ইমাম শাফে'য়ী-এর মত।

সুতরাং সর্বশেষ উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত অনুযায়ী সর্বসম্মত এসব নাপাকি থেকে ওযুর বিধানটি হলো খাস বা নির্দিষ্ট যা দিয়ে আম তথা ব্যাপকতা বোঝানো উদ্দেশ্য। আর ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, এসব খাস বা নির্দিষ্ট বিষয় তাদের খুসুস তথা নির্দিষ্টতার উপরই নির্দিষ্ট থাকবে। ইমাম আবূ হানিফা ও শাফে'য়ী (রহ) এক্ষেত্রে একমত যে, এসব নির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা ব্যাপকতা উদ্দেশ্য। তবে তা কোন্ ধরনের ব্যাপকতা এক্ষেত্রে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

○ **দলীল-প্রমাণাদি**

ইমাম মালিক (রহ) তাঁর মাযহাবের সপক্ষে বলেন, মূল হলো—কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে তার নির্দিষ্টতার উপরই ধারণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন কোন দলীল না আসে।

---

৩৭৭ আল-মুয়াত্তা ১/২২; আল-ইস্তিযকার ২/২৬৯; মাওয়াহিবুল জালীল ১/২৯১।

www.waytojannah.com

ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এর দলীল : তিনি দলীল হিসেবে বলেন, উদ্দেশ্য হলো নির্গমণ পথ, বের হওয়া বস্তু নয়। কেননা, আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি নিম্নরাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হয় তাহলে ওযু ওয়াজিব, আর যদি শরীরের উপরের কোন অংশ দিয়ে বায়ু বের হয় তাহলে ওযু ওয়াজিব নয়। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই বের হওয়া বস্তু এক ও অভিন্ন। তবে তাদের নির্গমণস্থল ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, নির্গত স্থলের বিষয়টিই প্রধান ও মুখ্য।

ইমাম আবূ হানিফা (রহ) দলীল হিসেবে বলেন :

১. উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্গত নাপাকি। কেননা পবিত্রতার ক্ষেত্রে নাপাকিই ব্যাঘাত ঘটায়। সুতরাং নাপাকি বের হলেই ওযু করতে হবে। কোত্থেকে বের হলো সেটা বড় কথা নয়।

২. সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, ان رسول الله ﷺ قاء فأفطر فتوضأ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বমি করে রোযা ভেঙ্গেছেন অতঃপর ওযু করেছিলেন।"[৩৭৮]

৩. উমর ও ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উভয়ের নাক থেকে নির্গত রক্তের কারণে ওযু ওয়াজিব করেছিলেন।[৩৭৯]

৪. অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মুস্তাহাযা' মহিলাকে প্রতি সালাতের জন্য ওযু করতে আদেশ করেছিলেন।[৩৮০]

৫. ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নির্গত প্রতিটি নাপাকির কারণে ওযু নষ্ট হওয়ার পক্ষে মত পেশ করেছেন। আর যেহেতু তাদের কোন বিরোধিতাকারী প্রমাণিত হয়নি সুতরাং এটি ইজমা বা সর্বসম্মত মত হিসেবে বিবেচিত হবে।[৩৮১]

○ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপর্যুক্ত মতামত ও তাদের দলীল বিবেচনা করার পর ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ এর মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত বলে মনে হয়; কারণ তাঁর মতের সপক্ষে বহু হাদীস ও 'আসার' রয়েছে। তাছাড়া তা অনেকটা পবিত্রতার সাথে বেশি সম্পর্কযুক্ত। পবিত্রতা বিষয়ে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন জরুরী।

---

৩৭৮. তিরমিযী: ৮৭; মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪৪৯।

৩৭৯. মুয়াত্তা মালিক : ৭৭; আল-ইস্তিযকার : ২/২৬৭।

৩৮০. বুখারী : ২২৮; আবূ দাউদ : ২৯২।

৩৮১. আল-মুগনী : ১/২৪৭।

www.waytojannah.com

ঘুমের কারণে ওযু ভেঙ্গে যাওয়া

○ মাসআলার পূর্ণরূপ

ওযু ভাঙ্গার ব্যাপারে উপর্যুক্ত কারণসমূহের মধ্যে ঘুম কোন স্পষ্ট কারণ নয়। তাহলে ঘুমালে ওযু থাকবে কি না? যদি ওযু ভঙ্গ হয় তবে কেমন ঘুমের কারণে ভাঙ্গবে?

○ মতামতসমূহ

ঘুমের ক্ষেত্রে ইমামগণের তিনটি মাযহাব পাওয়া যায়।

● কিছু কিছু ইমামের নিকট ঘুম ওযু ভঙ্গকারী। কম অথবা বেশি উভয় প্রকার ঘুমের কারণে ওযু ওয়াজিব। হাসান বসরী, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, মুযানী, আবূ উবাইদ, আওযা'য়ী প্রমুখ ইমাম এ মত পোষণ করেন।[৩৮২]

● আরেক শ্রেণীর ইমামের মতে, ঘুম 'হদস' বা ওযু ভঙ্গকারী নয়। ফলে ঘুমের কারণে ওযু ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ ঘুমের মধ্যে অন্য কোন ওযু ভঙ্গকারী বিষয় পাওয়া গেলে ওযু ভেঙ্গে যাবে। ইবন উমর, আবূ মূসা আশ'আরী, ইবনুল মুসাইয়্যাব, আবূ মিজলায, হুমাইদ আল-আ'রাজ, শু'বাহ এবং শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ উপরোক্ত মত গ্রহণ করেছেন।[৩৮৩]

● অপর এক শ্রেণীর ইমাম হালকা ও গভীর ঘুমের পার্থক্য করে বলেন, অধিক পরিমাণ গভীর ঘুমের কারণে ওযু ওয়াজিব, সামান্য ঘুমে নয়। আর এটিই অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব। ইমাম আবূ হানিফা, মালিক, শাফে'য়ী ও আহমাদ ইবন্ হাম্বল-এর মত এটি।

তবে যেহেতু বিশেষ কিছু অবস্থায় ঘুমের আধিক্যের কম-বেশি হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে অজু ভঙ্গের ব্যাপারটি কোন্ কোন্ অবস্থায় বেশি ঘটে থাকে, তাই এ বিষয়ে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত মতভেদ ঘটেছে :

১. ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, যে ব্যক্তি শয্যা অবস্থায় কিংবা সিজদারত অবস্থায় ঘুমাবে, তার ওপর ওযু ওয়াজিব। ঘুমটি দীর্ঘ হোক কিংবা খাটো। আর যে ব্যক্তি বসে ঘুমাবে তাঁর ওপর ওযু ওয়াজিব নয়, তবে যদি এ ঘুমটি দীর্ঘক্ষণ হয়। রুকুকারীর ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ)-এর মাযহাবে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়।

---

৩৮২. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত্ব ১/১৪৪: আল-মাজমু' ২/১৭: আল-কুরতুবী, আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন ৫/২২১।

৩৮৩. আল-আওসাত : ১/১৫৩; আল-মাজমু' ২/১৭; আল-মুগনী : ১/২৩৪; আল-বা'লী, আল-ইখতিয়ারাত, পৃ. ১৬।

www.waytojannah.com

একবার তিনি বলেন, রুকুকারীর হুকুম দাঁড়ানো ব্যক্তির ন্যায়, আবার তাঁর অন্য উক্তিতে পাওয়া যায়—তার বিধান সিজদাকারী ব্যক্তির ন্যায়।[৩৮৪]

২. ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এর মতে, প্রত্যেক ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবেই ঘুমাক, তার ওপর ওযু ওয়াজিব। হ্যা, কেবল বসা অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়।[৩৮৫]

৩. ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর শিষ্যদের মতে, ওযু কেবলমাত্র শুয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপরই ওয়াজিব। তাঁরা এমন ঠেস দিয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তিকেও শুয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যার ঠেস দেয়া বস্তু সরিয়ে নিলে সে পড়ে যাবে।[৩৮৬]

৪. ইমাম আহমদ (রহ)-এর মতে, যেকোন ধরনের ঘুম ওযু ভঙ্গকারী। তবে সামান্য ঘুম, দাঁড়িয়ে হোক কিংবা বসে হোক, তা ওযু ভঙ্গকারী নয়, কিন্তু এতেও শর্ত হচ্ছে, সে কোন কিছুর সাথে ঠেস দিয়ে ঘুমাবে না বা কোন কাপড়ে নিজেকে জড়িয়ে ঘুমাবে না।[৩৮৭]

○ মতানৈক্যের কারণ ও দলীল-প্রমাণাদি

মতানৈক্যের মূল কারণ, এ ব্যাপারে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো পরস্পর বিরোধপূর্ণ হওয়া। যেমন :

১. এক্ষেত্রে এমন কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলো ঘুমের কারণে ওযু ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে না।

ক. ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে এসেছে,

عن ابن عباس انه قال : نمت عند ميمونة زوج النبى ﷺ ورسول الله ﷺ عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله ﷺ ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذ نى فجعلنى عن يمينه فصلى فى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم نام رسول الله ﷺ حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاة المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ ٠

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়মুনা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, ওযু করে তের রাকাআত নামায আদায় করলেন, তারপর তার নিকট ঘুমিয়ে পড়লেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর তিনি ওযু না করে নামায পড়লেন।"[৩৮৮]

---

৩৮৪. আল-মুন্তাকা : ১/৪৯।

৩৮৫. আল-মাজমু' ২/১৭।

৩৮৬. ফাতহুল কাদীর ১/৪৭।

৩৮৭. বাহুতী, আর-রাওদুল মুরবি' : ১/২৪৫।

৩৮৮. বুখারী : ১৩৮, ৬৯৮, ৭২৬; মুসলিম : ৭৬৩।

www.waytojannah.com

এ হাদীসখানা ঘুম ওযু ভঙ্গকারী না হওয়ার প্রমাণ।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعله يستغفر فيسب نفسه .

"নামাযে যখন তোমাদের কাউকে ঘুম পেয়ে বসে, তখন সে যেন শুয়ে তার ঘুম দূর করে নেয়। কেননা, হয়ত সে তার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে তাকে গালি দিয়ে বসবে।"[৩৮৯] আলোচ্য হাদীসে নামায না পড়ার জন্য ওযু ভঙ্গ হবে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, সে ক্ষমা প্রার্থনার স্থলে গালি-গালাজ করতে পারে এ আশংকা রয়েছে। সুতরাং হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া দ্বারা ওযু ভাঙ্গবে না।

গ. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون .

"সাহাবায়ে কিরাম (রা) মসজিদে নববীতে এমনভাবে ঘুমাতেন যে, তাদের মাথা হেলে-দুলে পড়তো। তারপর তারা ওযু না করেই নামায পড়তেন।"[৩৯০]

২. আবার এক্ষেত্রে এমন কিছু হাদীস আছে যেগুলো প্রমাণ বহন করে যে, ঘুম ওযু ভঙ্গকারী। যেমন :

ক. সাফওয়ান বিন আসসাল (রা)-এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে অপবিত্রতা ব্যতীত পায়খানা, প্রস্রাব ও ঘুমের কারণে মোজা না খোলার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৯১] হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্রাব, পায়খানা ও ঘুমের মধ্যে ওযু ভঙ্গের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করেননি। সুতরাং প্রস্রাব ও পায়খানার মত ঘুমও ওযু ভঙ্গকারী।

খ. আলী (রা)-এর হাদীস : العين وكاء السه ومن نام فليتوضأ "চোখ হলো পশ্চাদদ্বারে হেলান দেওয়ার বস্তু স্বরূপ, যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেন ওযু করে নেয়।"[৩৯২] এ হাদীসগুলো প্রমাণ বহন করে যে, সাধারণ ঘুমই ওযু ভঙ্গকারী।

---

৩৮৯. বুখারী : ২১২; মুসলিম : ৭৮৬।

৩৯০. মুসলিম : ৩৭৬; আবূ দাউদ : ২০০।

৩৯১. তিরমিযী : ৯৬; নাসায়ী: ১২৬; ইবনে মাজাহ : ৪৭৮; মুসনাদে আহমাদ : ৪/২৩৯।

৩৯২. আবূ দাউদ : ২০৩।

www.waytojannah.com

গ. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস,

اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ٠

"তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে যেন পাত্রে হাত দেয়ার পূর্বেই তা ধুয়ে নেয়।"[৩৯৩]

এসব হাদীস দৃশ্যত পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে আলিমগণ দু'টি মাযহাব অবলম্বন করেছেন।

১. কোন এক ধরনের হাদীস প্রাধান্যদানের মাযহাব

২. সমন্বয় সাধনের মাযহাব।

যারা প্রাধান্যদানের মাযহাব অবলম্বন করেছেন

যারা প্রাধান্যদানের মাযহাব গ্রহণ করেছেন, তারা দু'টি মতে বিভক্ত :

১. হয়ত তারা ঘুমের কারণে ওযুর অত্যাবশ্যকীয়তাকে বাদ দিবেন, ঐ সব হাদীস অনুযায়ী সেগুলোতে ওযু না করার কথা আছে।

২. অথবা কম বা বেশি উভয় প্রকার ঘুমের কারণে ওযু ওয়াজিব করবেন, ঐসব হাদীস অনুযায়ী সেগুলোতে ঘুমের কারণে ওযু করার কথা এসেছে।

যারা সমন্বয়সাধনের পথ অবলম্বন করেছেন

যারা সমন্বয় সাধনের মাযহাব গ্রহণ করেছেন, তারা ঘুমের কারণে ওযু ভঙ্গকারী হাদীসসমূহকে অধিক পরিমাণ ঘুমের ক্ষেত্রে এবং ঘুমের কারণে ওযু ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণকারী হাদীসসমূহকে সামান্য ঘুমের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছেন। আর এটিই হচ্ছে অধিকাংশ আলিমের মাযহাব। কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার তুলনায় সমন্বয় সাধন করাটাই অধিকাংশ উসূল শাস্ত্রবিদের নিকট অধিক শ্রেয়।

সে হিসেবে ইমাম শাফে'য়ী (রহ) এসব হাদীস থেকে কেবলমাত্র বসে ঘুমানোর অবস্থাটিকে পৃথক করেছেন। কেননা সহীহ্ সূত্রে সাহাবীদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বসে বসে ঘুমাতেন এবং ওযু না করেই নামায পড়তেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা (রহ) শুধুমাত্র শুয়ে ঘুমানো অবস্থায় ওযুকে ওয়াজিব করেছেন। কেননা, এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إنما الوضوء على من نام مضطجعا "ওযু কেবল মাত্র শুয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।"[৩৯৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت

---

৩৯৩. বুখারী : ১৬২; মুসলিম : ২৭৮।

৩৯৪. আবূ দাউদ ২০২; তিরমিযী : ৭৭; দারা কুতনী : ১/১৬০। তবে হাদীসটি দুর্বল।

www.waytojannah.com

Contents

مفاصله "যে সিজদারত অবস্থায় ঘুমাবে তার উপর ওযু ওয়াজিব নয়; যতক্ষণ না সে সটান শুয়ে পড়বে; কারণ যখন শুয়ে পড়ে তখন তার রগগুলো ঢিলা হয়ে পড়ে।"[৩৯৫] তিনি এর সাথে সেটাকেও সম্পৃক্ত করেছেন যে অবস্থায় শরীরের রগগুলো ঢিলা হয়ে পড়ে। যেমন, এমনভাবে ঠেস দিয়ে ঘুমানো যে, যদি ঠেস দেয়া বস্তুটি সরিয়ে দেয়া হয় তবে পড়ে যাবে।

○ **প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা**

বিভিন্ন হাদীসদৃষ্টে মনে হয়, তন্দ্রাযুক্ত ঘুমের কারণে ওযু নষ্ট হয় না। অনুরূপভাবে বসে বসে এমন ঘুমও ওযু ভঙ্গকারী নয় যাতে কেউ তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। কিন্তু যদি কেউ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তবে সর্বাবস্থায় তার ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ, ঘুম স্বতঃ কোন ওযু ভাঙ্গার কারণ নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে মানুষের পিছনের রাস্তা খুলে যায়, যাতে করে সেখান থেকে কোন কিছু বের হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং যদি কেউ তার পিছনের রাস্তা দিয়ে কি বের হলো সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকে বা কিছু বের হলো কি হলো না সন্দেহে থাকে তবে অবশ্যই তাকে ওযু করতে হবে।

নারী স্পর্শের কারণে ওযু ভঙ্গ

○ **মাসআলাটির পূর্ণরূপ**

হাত অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা নারী স্পর্শের কারণে কি ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে? মহিলাদের স্পর্শ কি ওযু ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

○ **মতামতসমূহ**

১. এক দল আলিম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ধরনের আবরণ ব্যতীত কোন মহিলাকে স্পর্শ করে তা হলে তার ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোন মহিলাকে চুম্বন করলেও ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, চুম্বন করাও হল এক ধরনের স্পর্শ করা। চাই চুম্বনকারী স্বাদ গ্রহণ করুক অথবা না করুক। এটি ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ্ ও তাঁর শিষ্যদের অভিমত। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, স্পর্শকারীর ওযু ভঙ্গ হলে, যাকে স্পর্শ করা হয়েছে তার ওযুও কি ভঙ্গ হবে? তাছাড়া তারা যদি পরস্পর মাহরাম হয় তাহলেও কি একই বিধান? এ ব্যাপারে ইমাম শাফে'য়ী থেকে নিম্নোক্ত মত বর্ণিত হয়েছে :

---

৩৯৫. মুসনাদে আহমাদ ১/২৫৬; মুসান্নাফে ইবন আবি শাইবাহ, ১/১২২; মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ৪/৩৬৯। হাদীসটি দুর্বল।

www.waytojannah.com

ক. তাঁর এক মতে শুধু স্পর্শকারীর ওযুই ভঙ্গ হবে, যাকে স্পর্শ করা হয়েছে, তার নয়। অন্য বর্ণনায় তিনি উভয়ের ওযু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে মত প্রদান করেছেন।

খ. মাহরামের ব্যাপারে এক বর্ণনায় তিনি মাহরাম মহিলা ও স্ত্রীর পার্থক্য করে বলেন, স্ত্রীকে স্পর্শ করার দ্বারা ওযু ভঙ্গ হবে, মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করার দ্বারা নয়। অপর বর্ণনায় তিনি উভয়ের ব্যাপারে একই বিধান প্রদান করে উভয়কে স্পর্শ করার কারণে ওযু ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে মত প্রদান করেছেন।[৩৯৬]

২. অন্য এক দল আলিমের মতে, নারী স্পর্শ করার দ্বারা আবরণ দিয়ে হোক অথবা আবরণ ছাড়া হোক, যদি স্বাদ গ্রহণ করা হয় অথবা স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছে করা হয়ে থাকে, তবে তা দ্বারা ওযু ভঙ্গ হবে। তবে চুম্বন করার ক্ষেত্রে স্বাদ গ্রহণ শর্ত নয়। এটি ইমাম মালিক ও তাঁর অধিকাংশ শিষ্যের মাযহাব।[৩৯৭] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলও এ মত পোষণ করেন।[৩৯৮]

৩. এক দল আলিম নারী স্পর্শ করার দ্বারা ওযু ভঙ্গ হওয়াকে অস্বীকার করেন। যা ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মাযহাব।[৩৯৯] ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ্ থেকেও অনুরূপ মত রয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহেমাহুল্লাহ্ এ মতকে গ্রহণ করেছেন।

৪. আবার কারও কারও মতে, যদি ইচ্ছাকৃত স্পর্শ করে তবে ওযু ভঙ্গ হবে, নতুবা নয়। ইমাম দাউদ আয-যাহেরী এ মতের প্রবক্তা।

৫. কারও কারও মতে, যদি ওযুর অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করে তবেই কেবল ওযু ভঙ্গ হবে, নতুবা নয়। এটি ইমাম আওযা'য়ীর মত।[৪০০]

○ মতানৈক্যের কারণ

এ মাসআলায় মতানৈক্যের মূল কারণ দু'টি :

১. আরবী ভাষায় لمس শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকা।

২. এক্ষেত্রে কতিপয় হাদীসের ভাষ্য বাহ্যিকভাবে কিতাবুল্লাহর বিধানের বিপরীত হওয়া।

---

৩৯৬. আল-মাজমূ' ২/২৬-৩০।

৩৯৭. মাওয়াহিবুল জালীল ১/২৯৬-২৯৮।

৩৯৮. আল-মাজমূ' ২/৩০; আশ-শারহুল কাবীর ২/৪৬; আলমারদাওয়ী, আল-ইনসাফ ২/৪২।

৩৯৯. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/৫৪; আল-মাজমূ' ২/৩০; আশ-শারহুল কাবীর মা'আল ইনসাফ ২/৪৩।

৪০০. উপরোক্ত দু'টি মত ইমাম নাওয়াবী তাঁর আল-মাজমূ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ২/৩০।

www.waytojannah.com

দলীল-প্রমাণাদি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, أَوْلاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ [সূরা আন-নিসা : ৪৩, আল-মায়িদাহ : ৬] এ আয়াতে বলা হয়েছে, মহিলাদের لمس হলে ওযু ভঙ্গ হবে। আরবী ভাষায় "লামসুন" (لمس) শব্দটির কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

ক. আরবগণ لمس (লামসুন) শব্দটিকে হাত দ্বারা স্পর্শ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

খ. আবার কখনো তারা এর দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন।

১. এক শ্রেণীর আলিম ওযুর আয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত لمس (লামসুন) শব্দ দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য করেছেন।

২. আবার কেউ কেউ এর দ্বারা হাতের মাধ্যমে স্পর্শ করাকে উদ্দেশ্য করেছেন।

যেসব আলিম হাত দ্বারা স্পর্শের কারণে ওযু ভঙ্গ হয় বলেন, তাঁরা দলীল দেন যে, لمس (লামসুন) শব্দটি মৌলিকভাবে হাত দ্বারা স্পর্শ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং রূপক অর্থে সহবাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যখন কোন শব্দের মৌলিক ও রূপক অর্থ উভয়টির সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে মৌলিক অর্থে শব্দটিকে ধারণ করাই অধিক শ্রেয়। তবে যদি রূপক অর্থ প্রমাণকারী কোন দলীল পাওয়া যায়, তখন রূপক অর্থটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

যারা আয়াতে বর্ণিত لمس শব্দটির অর্থ হাতের স্পর্শ বুঝেছেন; তারা আবার এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন।

তাদের কারও কারও মতে, আয়াতটি ব্যাপক হিসেবেই থাকবে। সুতরাং হাতের স্পর্শই ওযু বিনষ্টকারী।

আবার তাদের একদল বলেন যে, আয়াতটির অর্থ عام বা ব্যাপক হলেও এর দ্বারা خاص বা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্পর্শ দ্বারা স্বাদ গ্রহণ। সুতরাং সে স্পর্শই ওযু নষ্টকারী, যাতে স্বাদ গ্রহণ রয়েছে।

পক্ষান্তরে যারা لمس দ্বারা সহবাস করা বুঝেন, তারা স্পর্শের কারণে ওযু নষ্ট না হওয়ার পক্ষে মত দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, এখানে এ শব্দটি থেকে উভয় অর্থই নেয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে স্পষ্ট এসেছে যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার পর ওযু ব্যতীতই নামায আদায় করেছেন। হাদীসে এসেছে,

عن عائشة أن النبى ﷺ كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأ ·

www.waytojannah.com

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুমু খেয়ে ওযু না করেই নামায পড়তেন।"[৪০১]

অন্য হাদীসে এসেছে,

عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت كنت أنام بين يدى رسول الله ﷺ ورجلاى فى قبلته فإذا سجد غمزنى ، فقبضت رجلى فإذا قام بَسَطْتُهُمَا .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম। আর আমার দু'পা থাকত তাঁর কেবলার দিকে। যখন তিনি সিজদা দিতেন তিনি তখন আমাকে হাত দিয়ে চাপ দিতেন, ফলে আমি পা গুটিয়ে নিতাম; তারপর যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন আমি আবার তা প্রসারিত করতাম।"[৪০২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلى وانا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمزر رجلى فضحمتها إلى ثم يسجد .

"তোমরা আমাদের [মহিলাদেরকে] কত খারাপ তুলনা করছ, আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে এক করে নিয়েছ, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যখন আমি তাঁর সামনে পড়ে থাকতাম, তারপর যখন তিনি সিজদা করতে চাইতেন, আমার পায়ে হাত দিয়ে চাপ দিতেন, তখন আমি আমার দু'পা নিজের দিকে টেনে নিতাম। তারপর তিনি সিজদা করতেন।"[৪০৩]

অন্য হাদীসে এসেছে,

عن عائشة قالت : إن كان رسول الله ﷺ ليصلى وإنّى لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله .

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতেন। আর আমি তাঁর সামনে জানাযার মত হয়ে পড়ে থাকতাম। যখন তিনি বিতরের সালাত আদায় করতে চাইতেন তিনি আমাকে তাঁর পা দিয়ে জাগিয়ে দিতেন।"[৪০৪]

---

৪০১. নাসায়ী, ১৭০; অনুরূপ বর্ণনা আবূ দাউদ ১৭৯; তিরমিযী ৭৯; ইবনে মাজাহ : ৫০২।

৪০২. বুখারী : ৩৮২; মুসলিম : ৫১২।

৪০৩. আবূ দাউদ : ৭১২।

৪০৪. নাসায়ী : ১৬৬।

www.waytojannah.com

Contents

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عن عائشة قالت : فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان .

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায় পেলাম না। তারপর ভাল করে খুঁজতে আরম্ভ করলাম। এতে আমার হাত তার দু'পায়ের তালুর উপর পড়ল। তিনি মসজিদে [অথবা সিজদারত অবস্থায়] ছিলেন, আর তার দু'পা খাড়া করা অবস্থায় ছিল।"[৪০৫]

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপরোক্ত দলীল-প্রমাণাদি বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ এর মতই এখানে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কারণ, তাঁর পক্ষে বহু হাদীসের দলীল বিদ্যমান।

গোপনাঙ্গ স্পর্শের কারণে ওযু ভেঙ্গে যাওয়া

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

কেউ যদি তার গোপনাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে কি তার ওযু নষ্ট হয়ে যাবে? কোন আবরণের মাধ্যমে স্পর্শ কিংবা আবরণবিহীন স্পর্শ কি সমান? কোন প্রকার চাহিদা সহ স্পর্শ ও চাহিদা ব্যতীত স্পর্শ কি সমান?

o মতামতসমূহ

গোপনাঙ্গ স্পর্শ করা প্রসঙ্গে আলিমগণ তিন মাযহাবে বিভক্ত হয়েছেন :

১. কোন কোন আলিমের নিকট যে কোনভাবে গোপনাঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটি ইমাম মালিক, শাফে'য়ী ও তাঁর শিষ্যদের ও ইমাম আহমদ (রহ) এর মাযহাব।[৪০৬]

এ শ্রেণীর আলিমগণ আবার কয়েকভাগে বিভক্ত হয়েছেন,

ক. তাদের কেউ কেউ গোপনাঙ্গ স্পর্শের দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা এবং স্বাদ গ্রহণ না করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ফলে স্বাদ গ্রহণের সাথে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে ওযু ওয়াজিব করেছেন। স্বাদের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে নয়।

খ. আবার তাদের কেউ কেউ হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করা বা না করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হাতের তালুর অংশ দিয়ে স্পর্শ করার দ্বারা ওযু ওয়াজিব করেছেন।

---

৪০৫. মুসলিম : ৪৮৬।

৪০৬. আল-ইস্তিযকার ৩/৩২; আল-মুহাল্লা ১/২৩৭; আশ-শারহুল কাবীর মা'আল ইনসাফ ২/২৮; আল-মাজমূ' ২/৪০-৪১; আল-ইনসাফ ২/২৬-৪১।

www.waytojannah.com

Contents

হাতের পিঠ দিয়ে স্পর্শ করার কারণে নয়। এ দু'ধরনের বিবেচনা ইমাম মালিক (রহ)-এর শিষ্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

গ. কোন কোন আলিম ইচ্ছাপূর্বক ও অনিচ্ছার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ইচ্ছার ক্ষেত্রে ওযু ওয়াজিব করেছেন। আর অনিচ্ছার ক্ষেত্রে করেননি। যা ইমাম মালিক (রহ)-এর একটি বর্ণনা ও দাউদ ও তাঁর শিষ্যদের মত।

২. কোন কোন আলিমের মতে, এক্ষেত্রে কোনভাবেই ওযু ভঙ্গ হবে না। এটি ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর শিষ্যদের মাযহাব। তাছাড়া, এটি ইমাম আহমাদ-এরও অন্য একটি মত।[৪০৭]

৩. কোন কোন আলিমের মতে, এক্ষেত্রে ওযু করা সুন্নাত। ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে এমন নয়। ইবন আবদুল বার বলেন, এটিই মালিকী মাযহাবের পশ্চিমাঞ্চলীয় আলিমদের সর্বশেষ কথা। তাছাড়া এটি ইমাম আহমাদ থেকেও এক বর্ণনা রয়েছে, যা শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ পছন্দ করেছেন। অনুরূপভাবে মতভেদ থেকে মুক্ত থাকার পর্যায়ে এটি হানাফী মাযহাবেরও একটি মত।[৪০৮]

o মতানৈক্যের কারণ ও দলীল-প্রমাণাদি

এক্ষেত্রে আলিমগণের মতানৈক্যের কারণ হলো এ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীস রয়েছে। এ হাদীস দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও পূর্বাপর নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ।

o দলীল-প্রমাণাদি

প্রথম মতের অনুসারী আলিমদের প্রমাণ হচ্ছে : বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, إذا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "তোমাদের কেউ যখন গোপনাঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেন ওযু করে নেয়।"[৪০৯] গোপনাঙ্গ স্পর্শের কারণে ওযু ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। যা ইমাম মালিক (রহ) তাঁর 'মুয়াত্তা'য় বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন মাঈন ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ) এ হাদীসখানাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। তবে কুফাবাসীগণ এ হাদীসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

৪০৭. আল-আওসাত : ১/১৯৮; আশ-শারহুল কাবীর ২/২৭; আল-মাজমূ' ২/৪২।

৪০৮. আল-ইস্তিযকার ৩/৩৪; আল-মাজমূ' ২/৪২; আশ-শারহুল কাবীর মা'আল ইনসাফ ২/২৭; আল-ইখতিয়ারাত, পৃ. ১৬; আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, পৃ. ৭৯।

৪০৯. আবূ দাউদ : ১৮১; নাসায়ী: ১৬৩; ইবনে মাজাহ ৪৭৯।

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় মতের অনুসারী আলিমগণ উপরোল্লিখিত হাদীসের বিপরীত একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যা তাল্‌ক ইবন আলী (রা)-এর হাদীস নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন,

عن قيس بن طلق عن أبيه رضى الله عنه قال كنا جلوسا عند النبى ﷺ فجاء رجل كانه بدوى فقال يا نبى الله ما ترى فى مس الرجل ذكره فى الصلاة فقال له النبى ﷺ وهل هو إلا مضغة أو قال بضعة منك ·

"আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, ইতোমধ্যে তাঁর নিকট এক ব্যক্তি ছিল, যাকে গ্রাম্য বলে মনে হচ্ছিল। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি ওযু করার পর তার গোপনাঙ্গ স্পর্শ করলে তার বিধান কি ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি তো কেবল তোমার শরীরেরই একটি গোশত বা অংশ ?!"[৪১০]

এই হাদীসখানা বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং কুফাবাসীগণ সহ অধিকাংশ আলিম এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

এ দুই হাদীসের ব্যাখ্যায় আলিমগণ দু'টি মাযহাব অবলম্বন করেছেন :

১. প্রাধান্যদান অথবা রহিতকরণ পদ্ধতি,

২. সমন্বয় সাধনের মাযহাব বা পথ।

প্রথমত প্রাধান্য দেয়ার মাযহাব

১. যে সমস্ত আলিম বুসরা (রা)-এর হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন কিংবা এটাকে তালক ইবন আলী (রা)-এর হাদীসের জন্য রহিতকারী মনে করেছেন, তাঁরা বলেন, গোপনাঙ্গ স্পর্শের কারণে ওযু ভঙ্গ হবে।

২. যারা তালক ইবন আলী (রা)-এর হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাদের নিকট গোপনাঙ্গ স্পর্শের দ্বারা ওযু ভঙ্গ হবে না।

দ্বিতীয়ত সমন্বয় সাধনের মাযহাব

যারা সমন্বয় সাধনের পথকে বেছে নিয়েছেন, তারা উল্লিখিত দু'টি হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে,

১. গোপনাঙ্গ স্পর্শের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে ওযু ওয়াজিব, কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়।

২. অথবা বুসরা (রা)-এর হাদীসখানা দ্বারা ওযু করা সুন্নাত বোঝাবে। আর তাল্‌ক (রা)-এর হাদীসখানা দ্বারা ওযু করা ওয়াজিব নয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

---

৪১০. ইবনুল জারুদ, আল-মুন্তাকা ১/১৮, নং ২১; নাসায়ী : ১৬৫; মুসনাদে আহমাদ : ৪/২২।

www.waytojannah.com

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

বিভিন্ন পর্যায় বিবেচনা করে তৃতীয় মতটি সর্বাধিক বেশি প্রাধান্যযুক্ত মত বলে মনে হয়। যাতে শরী'আতের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অভিমত।

উটের গোশত খাওয়ার কারণে ওযু ওয়াজিব হওয়া

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

আগুনে রান্না করা গোশ্ত খাওয়ার কারণে ওযু ভেঙ্গে যাবে কিনা সে ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রথম শতাব্দীতে আগুনে রান্না করা খাবার খাওয়ার কারণে ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী ফকীহগণ ওযু ভেঙ্গে যাবে না বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

কিন্তু আগুনে রান্না করা গোশতের মধ্যে বিশেষ করে উটের গোশতের কারণে ওযু ভঙ্গ হবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

o মতামতসমূহ

উটের গোশ্ত খাওয়ার কারণে ওযু ভঙ্গ হবে কিনা এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

১. ইমাম আহমদ ও ইসহাকসহ এক শ্রেণীর মুহাদ্দিসদের নিকট উটের গোশত খাওয়ার ফলে ওযু ভেঙে যায়।

২. ইমাম আবূ হানিফা ও কতিপয় আলিমের মতে উটের গোশ্ত খাওয়ার কারণে ওযু ভঙ্গ হয় না।

o মতানৈক্যের কারণ

বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হাদীস থাকার কারণে এরূপ মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।

o দলীল-প্রমাণাদি

যারা উটের গোশ্ত খাওয়ার কারণে ওযু ভঙ্গ হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের দলীল :

ক. জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

ان رجلا سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ ، قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل ·

www.waytojannah.com

"এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমরা কি ছাগলের গোশত খাওয়ার কারণে ওযু করবো? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তুমি ইচ্ছা করলে ওযু করতে পারো, আবার ইচ্ছা করলে ওযু না-ও করতে পারো। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, আমরা কি উটের গোশত খাওয়ার পর ওযু করবো ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খাওয়ার পর তুমি ওযু করবে।"[৪১১]

খ. বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন :

سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها .

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উটের গোশত খাওয়ার পর ওযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা ওযু করবে। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছাগলের গোশত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তা খাওয়ার পর ওযু করবে না।"[৪১২]

২. আর যাঁরা উটের গোশত খাওয়ার কারণে ওযু না ভাঙ্গার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে যে সমস্ত দলীল-প্রমাণ পেশ করেন তা হচ্ছে:

ক. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন,

كان أخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضؤ مما مست النار .

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সর্বশেষ আমল হল, আগুনে পাকানো খাবার গ্রহণের দ্বারা ওযু না ভাঙ্গা।"[৪১৩]

খ. অন্য হাদীসে এসেছে,

عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ছাগলের গোশত খাওয়ার পর ওযু না করেই সালাত আদায় করেছিলেন।"[৪১৪]

---

৪১১. মুসলিম : ৩৬০।

৪১২. আবূ দাউদ : ১৮৪ , তিরমিযী : ৮১, ইবনে মাজাহ : ৪৯৪।

৪১৩. আবূ দাউদ : ১৯১।

৪১৪. বুখারী : ২০৭; মুসলিম : ৩৫৪।

Contents

গ. যেহেতু তাদের নিকট এটা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি চার খলিফার (রা) আমল। তারা কোন গোশত খাওয়ার কারণেই ওযু ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে ছিলেন না।[৪১৫] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أكلت مع النبى ﷺ وأبى بكر ، وعمر خبزا ولحما فصلوا ، ولم يتوضأوا .

এ সমস্ত ব্যাপক হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, উটের গোশত খাওয়ার কারণেও ওযু ভঙ্গ হয় না। কারণ, উটের গোশতও সাধারণ গোশতের মতই।

০ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

বিভিন্ন হাদীসদৃষ্টে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের মাযহাব অত্যন্ত শক্তিশালী মনে হলেও খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল থেকে বোঝা যায় যে, উটের গোশত খাওয়ার পর ওযু করা জরুরী নয়, তবে উত্তম।

নামাযে হেসে ফেলার পর ওযু সম্পর্কে

০ মাসআলাটির পূর্ণরূপ

আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নামায়ে শব্দ করে হেসে ফেললে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নামাযে হেসে ফেললে কি ওযুও ভেঙ্গে যাবে? এ বিষয়টি নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে।

০ মতামতসমূহ

১. ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্‌র মতে, নামাযে শব্দ করে হেসে ফেলার ফলে ওযুও ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৪১৬]

২. অধিকাংশ আলিমের মতে, নামাযে শব্দ করে হেসে ফেললে নামায নষ্ট হলেও ওযু ভঙ্গ হবে না।

০ মতানৈক্যের কারণ

এ মাসআলায় মতভেদের কারণ, একটি মুরসাল হাদীসের সাথে স্বাভাবিক নিয়ম ও কিয়াসের বিরোধিতা।

০ দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ এ ব্যাপারে আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস দিয়ে দলীল দেন। যাতে এসেছে,

---

৪১৫. ইবনে মাজাহ : ৪৮৯; মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩০৪; অনুরূপ বর্ণনা আরও দেখুন, মুসনাদে তায়ালাসী : ১৭৫৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ : ১/৬৫।

৪১৬. আল-মাজমূ' ২/৬১।

www.waytojannah.com

. عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال بينا نحن نصلي خلف رسول الله ﷺ إذا أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة فضحكنا منه فأمرنا رسول الله ﷺ بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها .

আবুল মালীহ ইবন উসামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে সালাত আদায় করছিলাম। এমতাবস্থায় এক অন্ধ ব্যক্তি এসে গর্তে পতিত হলো। আমরা হেসে ফেললাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পুনরায় পূর্ণভাবে ওযু করার নির্দেশ দিলেন এবং প্রথম থেকে সালাত আদায় করার আদেশ করলেন।"[৪১৭]

অন্যান্য ইমাম এ ব্যাপারে বলেন যে, ওযু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে সহীহ কোন 'নস' পাওয়া যায়নি। সুতরাং ওযু ভঙ্গ হবে না। তাছাড়া ওযু ভঙ্গ হওয়া কিয়াসের মধ্যেও পড়ে না। সুতরাং ওযু ভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ নেই। তারা ইমাম আবূ হানিফা (রহ) এর প্রদত্ত দলীলের বিপরীতে বলেন যে,

ক. এটি একটি মুরসাল হাদীস।[৪১৮]

খ. এবং এ হাদীসটি উসূলের বিপরীত।[৪১৯] কারণ, নামাযের বাইরে কেউ যদি সশব্দে হেসে ফেলে তবে তার ওযু ভঙ্গ হবে না, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই, তাহলে নামাযের মধ্যে সশব্দে হেসে ফেললে ওযু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারটি কিয়াস ও সাধারণ বিবেকের বিরোধী কথা।[৪২০]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ এখানে একটি হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। এটি এটাই প্রমাণ করে যে, ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে সবকিছুর উপর স্থান দিতেন। তিনি যদিও অধিক পরিমাণ কিয়াস-এর পক্ষে ছিলেন। তারপরও যখনই কোন হাদীস পেতেন তখনই সে হাদীসের উপর আমল করতে সচেষ্ট থাকতেন। হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল হাদীসকেও কিয়াসের উপর স্থান দিতেন। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্কতাবশত ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্-এর মতই গ্রহণ করা উচিত।

৪১৭. দারা কুতনী : ১/১৬২; মুসান্নাফে আবদির রায্যাক: ২/৩৭৬; আল-বায়হাকী ফিল কুবরা ১/১৪৬।

৪১৮. এ ব্যাপারে ইমাম যাইলা'য়ী তাঁর নাসবুর রায়া গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, ১/৪৭; আল-মাজমূ' ২/৬১; ইবন হাজার, তালখীসুল হাবীর, ১/১১৫; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/৫১; ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ পৃ. ৩৭; তাঁর মন্তব্য وهو مرسل صحيح—এটি একটি বিশুদ্ধ মুরসাল হাদীস।

৪১৯. ফাতহুল কাদীর, ১/৫১।

৪২০. পূর্বোক্ত।

www.waytojannah.com

লাশ বহনের ফলে ওযু

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ :

কেউ লাশ বহন করে নিয়ে গেল। তার ওযু কি ভেঙ্গে যাবে? নামায আদায়ের জন্য তাকে কি ওযু করতে হবে?

o মতামতসমূহ

এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে :

১. ইমাম ইবন হাযম আয-যাহেরীর মতে, মৃত বহনের ফলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৪২১]

২. অন্যান্য সকল ইমামের নিকট মৃত বহনের কারণে ওযু ভঙ্গ হবে না।[৪২২]

o মতানৈক্যের কারণ

এ ব্যাপারে একটি হাদীসের অর্থ সংক্রান্ত বিরোধের কারণে এ মতভেদ ঘটেছে। হাদীসটির ব্যাখ্যা একেকজন একেক রকম করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি বাহ্যত কিয়াসেরও পরিপন্থী।

o দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম ইবন হাযম রাহেমাহুল্লাহ্ এ বিষয়ে বর্ণিত একটি হাদীস দিয়ে দলীল দেন-

عن أبى هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ .

"যে ব্যক্তি লাশ গোসল করাবে সে যেন গোসল করে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করবে সে যেন ওযু করে।"[৪২৩]

অন্যান্য ইমাম বলেন, মৃত ব্যক্তিকে বহনের ফলে ওযু ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ স্পষ্ট নয়। সুতরাং ওযু ভঙ্গ হবে না। তাছাড়া এক বর্ণনায় এসেছে,

أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ .

"ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সা'য়ীদ ইবন যায়েদ-এর এক সন্তানকে আতর ও কাপড় পরিয়ে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু ওযু করেন নি।"[৪২৪]

---

৪২১. আল-মুহাল্লা, ১/২৫০।

৪২২. আল-ইস্তেযকার, ২/১৩৭।

৪২৩. আবূ দাউদ : ৩১৬১; মুসনাদে আহমাদ, ২/৪৫৪।

৪২৪. মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ৪৭; বুখারী, কিতাবুল জানায়েয-এর অধ্যায় বিন্যাসে।

www.waytojannah.com

তাঁরা ইমাম ইবন হাযম কর্তৃক প্রদত্ত হাদীসের ব্যাপারে কয়েকটি মত প্রকাশ করেছেন :

ক. হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

খ. হাদীসটি শুদ্ধ হলেও এর অর্থ, যারা লাশ বহন করবে তারা যেন সালাতুল জানাযাতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকে এবং ওযু করে নেয়।[৪২৫]

গ. হাদীসটি মানসূখ।[৪২৬]

ঘ. খাত্তাবী বলেন, এখানে ওযুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মুস্তাহাব হিসেবে। ওযু ভঙ্গ হয়েছে বলে নয়।[৪২৭]

ঙ. হাদীসটি সরাসরি কিয়াসের বিপরীত। কারণ, কাঠ বহন করার কারণে ওযু ভঙ্গ হওয়ার মত কোন কিছু ঘটে না।

চ. ওযুর শর'য়ী অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাত-মুখ ধোয়া।

০ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে বহন করলে ওযু ভঙ্গ হবে না, এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কারণ, ইমাম ইবন হাযম কর্তৃক পেশকৃত দলীলে অনেক সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর যাতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে তা প্রমাণ হিসেবে দুর্বল।

তাওয়াফের জন্য ওযুর বিধান

০ মাসআলাটির পূর্ণরূপ

আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ঘর নেই যার তাওয়াফ করা যায়। এ তাওয়াফ পবিত্র অবস্থায় করাই নিয়ম। কিন্তু ওযু ব্যতীত কি তাওয়াফ করা যাবে?

০ মতামতসমূহ

এ ব্যাপারে ফকিহ্গণ দু'টি মতে বিভক্ত হয়েছেন :

১. ইমাম মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদ-এর মতে, তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত।[৪২৮]

---

৪২৫. আল-ইস্তিযকার, ২/১৩৭-১৩৮।

৪২৬. পূর্বোক্ত।

৪২৭. খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান, ১/৩০৭।

৪২৮. আল-মুদাওয়ানাহ ১/৩১৫; মাওয়াহিবুল জালীল ৩/৬৭; আল-উম্ম ২/১৭৮; আল-মাজমু' ৮/১৫; আল-মুগনী ৫/২২২।

www.waytojannah.com

২. ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আহমদের এক বর্ণনায়, তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত নয়।[৪২৯] ইমাম আহমদের এ মতটিকে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ পছন্দ করেছেন।

০ মতানৈক্যের কারণ

তাওয়াফ কি সালাতের হুকুম রাখে? নাকি রাখে না? এ ব্যাপারে মতভেদই মূলত এ মতানৈক্য ঘটিয়েছে।

০ দলীল-প্রমাণাদি

যাঁরা তাওয়াফের জন্য ওযুকে শর্ত করেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে :

* কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন এ দু' অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সালাত ও তাওয়াফ উভয়ের বিধান একই। উভয়টির জন্যই ওযু শর্ত। হাদীসে এসেছে,

إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلى ما يفعل الحاج . غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرى .

"এটি (হায়েয) এমন একটি জিনিস যা আল্লাহ্ প্রতিটি আদম কন্যার উপর লিখে রেখেছেন, সুতরাং হাজীরা যা করে তুমি তা করে যাও, তবে যতক্ষণ না পবিত্র হচ্ছ ততক্ষণ তুমি আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করবে না।"[৪৩০]

* অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا انكم تكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير .

"আল্লাহ্র ঘরের চারপাশে তাওয়াফ করা সালাতের মতই, তবে তোমরা সেখানে কথা বলে থাক। সুতরাং তোমাদের কেউ কথা বললে, কল্যাণমূলক কথা ব্যতীত আর কোন কথা যেন না বলে।"[৪৩১]

আর যারা তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত করেন না তাঁদের যুক্তি হলো,

* তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত করে সরাসরি কোন 'নস' পাওয়া যায় না।

---

৪২৯. সারাখসী, আল-মাবসূত ৪/৩৮; আল-হিদায়া মা'আ ফাতহিল কাদীর ৩/৫০; আল-মুগনী ৫/২২৩; আল-ইখতিয়ারাত : পৃ. ১১৯।

৪৩০. বুখারী : ৩০৫; মুসলিম : ১২১১।

৪৩১. তিরমিযী : ৯৬০; নাসায়ী : ২৯২২; দারমী ১৮৪৭।

www.waytojannah.com

Contents

* রাসূল ও সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্নভাবে তাওয়াফ করতেন। তাদের কেউই তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি।

* ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাওয়াফ হয়ে যায়, অথচ তাদের ওযু রাখা না রাখার বিষয়টি জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত করা ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার। আর শরী'আতে কষ্টকর কিছুই নেই।

* যাঁরা তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত করেন, তাঁদের দলীলের জওয়াবে যাঁরা শর্ত করেন না তাঁরা বলেন যে, যে সমস্ত কাজ হায়েযের কারণে নিষিদ্ধ, হায়েয চলে গেলে তা করার জন্য ওযুর দরকার হয় না। যেমন, রোযা। হায়েযের কারণে রোযা নিষিদ্ধ। কিন্তু হায়েয চলে গেলে রোযা রাখার জন্য ওযু করতে হবে এমনটি নয়। সুতরাং তাওয়াফের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করা যাবে না এটা ঠিক, কিন্তু হায়েয চলে গেলেই যে ওযু লাগবে তেমন কোন দলীল নেই। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় হাদীসের জওয়াবে তাঁরা বলেন যে, مثل الصلاة এর অর্থ مثل الصلاة أجرا বা তাওয়াফ নামাযের মতই সওয়াবের কাজ। কারণ, প্রকৃত অর্থে কোনভাবেই তাওয়াফ নামাযের মত নয়।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফ অত্যন্ত পবিত্র অবস্থায় হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ কোন অবস্থায় অপবিত্র অবস্থায় করা ঠিক নয়। কিন্তু শর্ত হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে শক্তিশালী দলীলের অভাব রয়েছে। শর্ত না হলেও পবিত্র অবস্থাতেই প্রত্যেকের তাওয়াফ করা উচিত। আর সেটা দ্বীনের ব্যাপারে সাবধানতারও দাবি।

ফরয গোসলের জন্য নিয়্যতের বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

কোন কারণে যদি কারও গোসল করা ফরয হয়, সে গোসলের জন্য কি নিয়্যত তথা মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের দৃঢ় সংকল্প করার প্রয়োজন আছে? যদি কেউ নিয়্যত বা মনে মনে দৃঢ় সংকল্প না করে গোসল করে বা কোন কারণে—যেমন বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেল কিংবা কোন খাদের পানিতে পড়ে গিয়ে—তার সারা শরীর ধোয়া হয়ে যায়, এতেই কি তার ফরয গোসল আদায় হয়ে যাবে?

o মতামতসমূহ

আলিমগণ ওযুতে নিয়্যতের ব্যাপারে যে ধরনের মত প্রকাশ করেছেন, গোসলের ক্ষেত্রে নিয়্যতের বিধান সম্পর্কেও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন :

www.waytojannah.com

১. ইমাম মালিক, শাফে'য়ী, আহমদ, দাউদ ও তাঁর অনুসারীদের মতে নিয়্যত করা শর্ত।

২. ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর শিষ্যদের মতে, নিয়্যত করা সুন্নাত। নিয়্যত ব্যতীত পূর্ণ পবিত্রতা হয়ে যায়।[৪৩২]

o মতানৈক্যের কারণ

ওযুতে তাদের মতভেদের হুবহু কারণই হলো, গোসলের ক্ষেত্রে তাদের মতভেদের কারণ।[৪৩৩]

o দলীল-প্রমাণাদি

যাঁরা নিয়্যত শর্ত করেন তাঁদের দলীল হচ্ছে,

انما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه .

"প্রতিটি আমলের ভিত্তি তার নিয়্যতের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যা সে নিয়্যত করে, সুতরাং যার হিজরত হবে দুনিয়ার প্রতি, সেটা পাওয়ার জন্য, অথবা কোন মহিলার দিকে, তাকে বিয়ে করার জন্য, তাহলে তার হিজরত সে দিকেই হবে, যার জন্য সে হিজরত করেছে।"[৪৩৪]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, গোসলের জন্যও নিয়্যতের প্রয়োজন পড়বে।

পক্ষান্তরে যাঁরা নিয়্যত শর্ত করেন না, তাঁরা বলেন, এ হাদীসটি ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। গোসল ইবাদতের মাধ্যম হলেও সরাসরি ইবাদত নয়। সুতরাং এর জন্য নিয়্যত শর্ত নয়। মূলকথা হলো, পবিত্রতা অর্জন। সেটা অর্জিত হবেই, নিয়্যত করা হোক বা না হোক। যেমনিভাবে নাপাকি ধোয়ার ক্ষেত্রে নিয়্যত লাগে না, তেমনিভাবে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রেও নিয়্যত লাগবে না।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপর্যুক্ত দলীল ও যুক্তি বিশ্লেষণে মনে হয়, এখানে যে মতভেদ তা ওযুর ক্ষেত্রে নিয়্যতের মতভেদের মতই। (দ্র. পৃ. ১৯৯)

---

৪৩২. ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ১/১০৫; হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ পৃ. ৫৬; হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশ শারহিল কাবীর ১/১৩৩; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ ১/৭২, কাশশাফুল কানা' ১/১৫২, ১৫৪।

৪৩৩. এ মাসআলাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ওযু সংক্রান্ত প্রথম মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪৩৪. বুখারী : ১; মুসলিম: ১৯০৭।

www.waytojannah.com

ফরয গোসলের জন্য কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ :

গোসল বলতে সাধারণত সারা শরীর ধৌত করা বোঝায়। ফরয গোসলের সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া কি জরুরী, যা না হলে গোসল শুদ্ধই হবে না?

o মতামতসমূহ

এ মাসআলায় তিনটি মত রয়েছে :

১. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয নয়। এটি ইমাম মালিক ও শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ্-এর মাযহাব।[৪৩৫]

২. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয। এটি ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আহমদের মাযহাব।[৪৩৬]

o মতানৈক্যের কারণ

অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ম বর্ণনায় বাহ্যত বিপরীতধর্মী হাদীসসমূহের উপস্থিতি। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের فَاطَّهَّرُوْا আয়াতের সঠিক চাহিদা নির্ধারণ সংক্রান্ত মতভেদ।

o দলীল-প্রমাণাদি

যাঁরা কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয মনে করেন না, তাঁদের দলীল হচ্ছে :

১. উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে সে হাদীসে এসেছে,

عن أم سلمة رضى اللّٰه عنها قالت : قِلت : يا رسول اللّٰه انى امرأة أشد شعر رأسى أفانْقُضُهُ لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة ؟ فقال لا إنما يكفيك أن تحتى على رأسك ثلاث حثيات .

"উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এমন একজন মহিলা, আমি আমার মাথার চুল বেঁধে রাখি। যখন আমি জানাবতের গোসল করব তখন কি সেগুলো খুলব? অপর বর্ণনায় এসেছে, এবং হায়েযের পরের গোসল থেকেও কি অনুরূপ মাথার চুলের খোপা খুলতে হবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তোমার জন্য তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি দেয়াই যথেষ্ট।"[৪৩৭]

---

৪৩৫. আল-মুদাওয়ানাহ ১/১৫; আল-উম্ম ১/২৫; আল-আওসাত ১/৩৭৮।

৪৩৬. আল-মাবসূত ১/৪৪; আল-হিদায়া মা'আ ফাতহিল কাদীর ১/১৫; আল-মুগনী ১/২৮৯।

৪৩৭ মুসলিম : ৩৩০। তবে এর পরে আরো বাড়তি আছে, ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين অর্থাৎ তারপর তুমি তোমার উপর পুরোপুরিভাবে পানি প্রবাহিত করে পবিত্র হবে।

www.waytojannah.com

এ হাদীসে গোসল করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা বলা হয়নি। সুতরাং তা ফরয হতে পারে না। সর্বোচ্চ সুন্নাত হতে পারে।

২. এক হাদীসে এসেছে, عشر من الفطرة وذكر منها المضمضة والاستنشاق "দশটি বিষয় ফিতরাত এর বিষয়" তন্মধ্যে রয়েছে, "কুলি করা, নাকে পানি দেয়া।"[৪৩৮]

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নাকে পানি দেয়া ও কুলি করা সুন্নাত। ফরয নয়।

পক্ষান্তরে যারা গোসলের জন্য কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয বলেন, তাদের দলীল হচ্ছে :

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا - المائدة ٦-٥ অর্থাৎ যদি তোমরা জানাবতের অবস্থায় থাক, তবে ভালভাবে পবিত্র হও। নিঃসন্দেহে ভালভাবে পবিত্র হতে হলে শরীরের সব স্থানে যতটুকু সম্ভব পানি পৌঁছাতে হবে। আর কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া সম্ভব। সুতরাং ফরয গোসলের জন্য কুলি ও নাকে পানি দেয়া ফরয।

২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস। সেখানে জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এসেছে,

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه .

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন তাঁর দু'হাত ধোয়ার মাধ্যমে তা শুরু করতেন। তারপর তাঁর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে নিতেন, তারপর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন, তারপর ওযু করতেন, তারপর পানি নিয়ে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতেন। অতঃপর তাঁর মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি দিতেন। তারপর সারা শরীরে পানি দিতেন, তারপর তিনি তাঁর দু'পা ধুতেন।" তাছাড়া নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে, "অতঃপর তিনি তিনবার নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার কুলি করলেন।"[৪৩৯]

৩. অনুরূপ এক বর্ণনা মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও বর্ণিত আছে, সেখানে এসেছে,

---

৪৩৮. মুসলিম : ২৬১।

৪৩৯. বুখারী : ২৪৮; মুসলিম: ৩১৬; নাসায়ী ২৪৬; ইবনে হিব্বান: ১১৯০।

www.waytojannah.com

قالت ميمونة وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض علي جسده ثم تحول من مكانه فغسل قد . . .

মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি দু'বার অথবা তিনবার তাঁর দু হাত ধুইলেন। তারপর তিনি তাঁর বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন, তারপর তিনি তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন, অতঃপর সে হাত মাটিতে মুছে নিলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন এবং তাঁর মুখ ও দু' হাত ধুলেন, তারপর তিনি তাঁর সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর তিনি তাঁর স্থান থেকে সরে গেলেন এবং তাঁর দু'পা ধুলেন।"[৪৪০]

৪. তাছাড়া পূর্বোল্লেখিত উম্মে সালামার হাদীসে বাড়তি এসেছে,

ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين অর্থাৎ তারপর তুমি তোমার উপর পুরোপুরিভাবে পানি প্রবাহিত করে পবিত্র হবে। আরবী ভাষায় إفاضة শব্দের অর্থ পূর্ণভাবে পানি পৌছানো। সুতরাং পূর্ণভাবে পানি সব স্থানে পৌছাতে হলে কুলি ও নাকে পানি দেয়া জরুরী।

৫. অন্য হাদীসে শরীরকে ভালভাবে পবিত্র করার নির্দেশ রয়েছে, এমনকি শরীরের পশমকেও, যেমন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر .

"আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রতিটি চুলের নীচে নাপাকি রয়েছে সুতরাং তোমরা চুল পরিষ্কার কর এবং শরীর পরিচ্ছন্ন রাখ।"[৪৪১]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপর্যুক্ত দলীলসমূহ বিবেচনা করে বোঝা যায় যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয হওয়াই দলীল-প্রমাণাদির দিক থেকে শক্তিশালী মত। তাছাড়া এর মাধ্যমে দ্বীনের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনও সম্ভব।

---

৪৪০. বুখারী : ২৫৭; মুসলিম : ৩১৭।

৪৪১. আবূ দাউদ ২৪৮; তিরমিযী : ১০৬।

হায়েয-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ :

হায়েয প্রতিটি সুস্থ আদম কন্যারই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে তার জরায়ুর রেহেম এর সুস্থতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আদম কন্যাদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের সময় পর্যন্ত এ রক্ত প্রবাহিত থাকে। এ ব্যাপারে শরী'আতের কি কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে?

o মতামতসমূহ

হায়েযের সর্বোচ্চ সময়

১. সর্বোচ্চ কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। এ মতটি ইমাম আওযা'য়ী, ইমাম ইবনুল মুনযির ও শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ পছন্দ করেছেন।[৪৪২]

২. ইমাম মালিক-এর মতে, হায়েযের সর্বোচ্চ সময় পনের দিন। এটি ইমাম শাফে'য়ী ও আহমদ (রহ)-এরও মত।[৪৪৩] আবার তাদের থেকে অন্য বর্ণনায় সর্বোচ্চ সতের দিনও এসেছে, যা যাহেরীদের মাযহাব।[৪৪৪]

৩. ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে সর্বোচ্চ সময় দশ দিন।[৪৪৫]

হায়েযের সর্বনিম্ন সময়

১. ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, হায়েযের সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই, বরং তা এক মুহূর্তও হতে পারে।[৪৪৬] আর এ মতটি শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ পছন্দ করেছেন।[৪৪৭]

২. ইমাম শাফে'য়ী ও আহমদ (রহ)-এর মতে সর্বনিম্ন সময় হলো এক দিন ও এক রাত।[৪৪৮]

---

৪৪২. আল-আওসাত ২/২২৮; আল-ইখতিয়ারাত পৃ. ২৮।

৪৪৩. আল-মুদাওয়ানাহ ১/৫৪; আল-ইস্তিযকার ৩/২৩৯; আশ-শারহুস সগীর ১/৩০৪; আল-উম্ম ১/৬৭; আল-আওসাত ২/২২৭; আল-মাজমূ' ২/২৮০; আল-মুগনী: ১/৩৮৮; আল-ইনসাফ ২/৩৯৪।

৪৪৪. আল-আওসাত ২/২২৮; আল-ইস্তিযকার ৩/২৪১; আল-মাজমূ' ২/৩৮০, ৩৮১, আশ-শারহুল কাবীর ২/৩৯৩; আল-মুহাল্লা ২/১৯১।

৪৪৫. আত-তাহাবী, মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা ১/১৬৫; আল-মাবসূত ৩/১৪৭; আল-হিদায়া মা'আল ফাতহ ১/১৬১।

৪৪৬. আল-মুদাওয়ানাহ ১/৫৪; আল-ইস্তিযকার ৩/২৩৯; আশ-শারহুস সগীর ১/৩০৪।

৪৪৭ আল-ইখতিয়ারাত পৃ. ২৮; আল-মুহাল্লা ২/১৩৯; আল-আওসাত ২/২২৯; আল-মাজমূ' ২/৩৮০; আল-ইনসাফ ২/৩৯৪।

৪৪৮. আল-উম্ম ১/৬৭; আল-আওসাত ২/২২৭; আল-মাজমূ' ২/৩৮০; আল-মুগনী ১/৩৮৮; আল-ইনসাফ ২/৩৯২।

www.waytojannah.com

৩. ইমাম আবূ হানিফার (রহ) মতে সর্বনিম্ন সময় হলো তিনদিন।[৪৪৯]

o মতানৈক্যের কারণ

এ বিষয়ে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে দু'টি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

এক. এ অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপণে মতভেদ।

দুই. তাছাড়া বাস্তব অভ্যাসের ক্ষেত্রে ভিন্নতাও এ বিষয়ে মতভেদের একটি বিরাট কারণ।

o দলীল-প্রমাণাদি

প্রথম দু মতের অনুসারীগণ তাঁদের মতের সমর্থনে বলেন যে, শরী'আতে সরাসরি এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত হয় নি। সুতরাং এ ব্যাপারে মানুষের অভ্যাস ও বাস্তবতার ভিত্তিতেই এ সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এরপর তাঁরা প্রত্যেকে তাদের কাছে সর্বোচ্চ সময় সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে ততটুকু নির্ধারণ করেছেন।

তন্মধ্যে ইমাম মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদ-এর এক মতে, এর সর্বোচ্চ সময়সীমা পনের দিন। কারণ, বেশির ভাগ সময়ই পনের দিন হওয়াটাই শ্রুত হয়েছে। তাই এটিই সাধারণ নিয়ম হবে। সালেম ইবন আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একজন মুস্তাহাযা মহিলা কতদিন নামায ছাড়বে? তিনি বলেন, পনের দিন।[৪৫০] আতা বলেন, "হায়েয একদিন থেকে পনের দিন পর্যন্ত।"[৪৫১]

কিন্তু যারা সতের দিন নির্ধারণ করেন তাদের মত হচ্ছে, এ ব্যাপারে যেহেতু কোন সহীহ বর্ণনা নেই, সেহেতু বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কোন কোন মহিলার হায়েয সতের দিন পর্যন্ত বহাল থাকে। ইমাম আহমদ বলেন, আমি সবচেয়ে বেশি যে সময় শুনেছি তা হচ্ছে, সতের দিন। ইবনুল মুনযির বলেন, আমার কাছে সংবাদ আছে যে, আল-মাজেশূন গোত্রের মহিলাদের হায়েয সতের দিন পর্যন্ত থাকে। ইবন মাহদী এক লোক সম্পর্কে বলেন, সে তাকে জানিয়েছে যে, তার স্ত্রীর হায়েয সতের দিন পর্যন্ত থাকে। সুতরাং যা বাস্তব তা মেনে নিয়ে হায়েযের সর্বোচ্চ সময় সতের দিন হওয়াই যুক্তিযুক্ত।[৪৫২]

আবার তাদের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত নেই বলেন, তাদের মত হচ্ছে এই যে, যেহেতু এ ব্যাপারে সরাসরি কোন সহীহ 'নস' নেই, সেহেতু এখানে

---

৪৪৯. মুখতাসারু ইখতিলফিল উলামা ১/১৬৫; হিদায়া মা'আল ফাতহ, ১/১৬০।

৪৫০. আল-মুদাওয়ানাহ ১/৫৪।

৪৫১. বুখারী, হায়েয অধ্যায়; দারমী ১/২১০; দারা কুতনী ১/২০৮।

৪৫২. আল-আওসাত ২/২২৮; আল-ইস্তিযকার ৩/২৪১; আল-মাজমূ' ২/৩৮০, ৩৮১, আশ-শারহুল কাবীর ২/৩৯৩; আল-মুহাল্লা ২/১৯১।

www.waytojannah.com

অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আর অভিজ্ঞতার কোন শেষ নেই। কোন এলাকা, গোত্র, সমাজ, রাষ্ট্র ও জলবায়ুর প্রভাবে এটার কমবেশি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং কোনভাবেই তা নির্ধারণ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ যে সময় নির্ধারণ করেছেন, তার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে,

عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله ﷺ : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام .

১. ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সময় তিনদিন। আর সর্বোচ্চ সময় দশ দিন।"[৪৫৩]

২. তাছাড়া আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة .

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সর্বনিম্ন হায়েয হচ্ছে তিনদিন। আর সর্বোচ্চ দশদিন।"[৪৫৪]

৩. ওকী ইবন জাররাহ রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন,

وقال وكيع : الحيض ثلاث إلى عشر فما زاد فهي مستحاضة .

"ওকী ইবন জাররাহ বলেন, হায়েয হচ্ছে তিন দিন থেকে দশ দিনের মধ্যে। এর বেশি যা তা মুস্তাহাযা।"[৪৫৫]

০ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

বিভিন্ন দলীল-প্রমাণাদি বিশ্লেষণপূর্বক যা প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে, এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ কর্তৃক গ্রহণকৃত হাদীসটি দুর্বল। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবন মিনহাল ও মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন আনাস এ দু'জনই দুর্বল। তাছাড়া এ বিষয়টি অভিজ্ঞতা ও স্থান, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য। তাই ইসলাম এ বিষয়টি নির্ধারণ করে দিবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারটি অনির্দিষ্ট রেখেছেন। যেমন :

---

৪৫৩. দারা কুতনী ১/২১৯।

৪৫৪. দারা কুতনী ১/২০৯; দারমী ১/২৩১।

৪৫৫. পূর্বোক্ত।

www.waytojannah.com

কোন হাদীসে বলেন,

ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ فقال : لتنظر الليالى والأيام التى كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب فلتصل .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলার রক্ত সব সময় আসত। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, সে যেন মাসের সেই রাত ও সেই দিনগুলো অপেক্ষা করে, এ বিপদে পড়ার আগে যেগুলোতে তার হায়েয আসত। মাসের সে দিনগুলোতে সে সালাত পরিত্যাগ করবে, তারপর যখন সে দিনগুলো পার হয়ে যাবে, তখন সে গোসল করবে এবং নির্দিষ্ট স্থানে কাপড় বেঁধে নিবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে।"[৪৫৬]

এ হাদীসেও হায়েযের কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ হায়েযের সময় অবশ্যই অনির্ধারিত।

নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়

০ মাসআলাটির পূর্ণরূপ :

নিফাস প্রসূতির রক্তস্রাব এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময় কত হতে পারে। এ ব্যাপারটি কি নির্ধারিত? নির্ধারিত হলে তা কত?

০ মতামতসমূহ

নিফাস প্রসূতির রক্তস্রাবের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মেয়াদ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

সর্বনিম্ন মেয়াদ

১. ইমাম আবূ হানিফা, মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদ-এর মতে, নেফাসের সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই।[৪৫৭]

---

৪৫৬. আবূ দাউদ : ২৭৪; নাসায়ী : ২০৮; মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৩; মুয়াত্তা : ১৩৬।

৪৫৭ আল-হিদায়া মা'আ ফাতহিল কাদীর ১/১৮৭; আল-মুগনী ১/৪২৮; আল-আওসাত : ২/২৫২; আল-মাজমূ' ২/৫২৪, ৫২৫।

www.waytojannah.com

২. এক শ্রেণীর আলিমের মতে, এর মেয়াদ সীমিত। তবে তারা তা নির্ধারণে কয়েকটি মতে বিভক্ত হয়েছেন।

ক. ইমাম আবূ হানিফা (রহ) থেকে এক বর্ণনায় তা পঁচিশ দিন।

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, এগার দিন।[৪৫৮]

গ. হাসান আল-বসরী (রহ) বলেন, বিশ দিন।[৪৫৯]

নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ

১. ইমাম মালিক (রহ)-এর প্রথম মত হলো : ষাট দিন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর উক্ত মত থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেন, এ বিষয়ে মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত করা হবে। তবে ইমাম মালিক (রহ)-এর অনুসারীগণ তাঁর প্রথম মতটির উপর অনঢ় রয়েছেন। এটি ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এরও মত।[৪৬০]

২. অধিকাংশ আহলে ইলম সাহাবীর মতে, এর সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো চল্লিশ দিন। এটি আবূ হানিফা (রহ) ও ইমাম আহমদের মাযহাব।[৪৬১]

৩. কোন কোন আলিম বলেন, এক্ষেত্রে মহিলা তার সমপর্যায়ী নারীদের সাথে তুলনা করে নিজেকে বিবেচনা করবে। যদি তার মেয়াদ তাদের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সে হলো রুগ্না (মুস্তাহাযা)।[৪৬২] এটি ইমাম আওযা'য়ীর অভিমত।

৪. এক শ্রেণীর আলিম ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে পার্থক্য করে বলেন, ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো ত্রিশ দিন, আর মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিন।[৪৬৩]

৫. হাসান বলেন, পঞ্চাশ দিন।[৪৬৪]

৬. শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, নেফাসের কোন সর্বোচ্চ সীমা নেই।[৪৬৫]

---

৪৫৮. আল-ইস্তিযকার ৩/২৫০; আল-আওসাত ২/২৫৩।

৪৫৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৩৯।

৪৬০. আল-মুগনী ১/৪২৭; তিরমিযী ১/২৫৮; আল-বায়হাকী ১/৩৪২; ইবনে হুবায়রা, আল-ইফসাহ ১/৯৯; আল-ইস্তিযকার ৩/২৪৯; ইবনে আবদিল বার, আত-তামহীদ ১৬/৭৪; আল-মাজমূ' ২/৫২৪।

৪৬১. আল-ইস্তিযকার ৩/২৪৯; আত-তামহীদ ১৬/৭৪; আল-ইফসাহ ১/৯৯; আল-হিদায়া মা'আল ফাতহ ১/১৮৮; আল-মুগনী ১/৪২৭; আল-মাজমূ" ২/৫২৪।

৪৬২. আল-ইস্তিযকার ৩/২৯৪।

৪৬৩. আল-মুহাল্লা ২/২০৬; আল-মাজমূ' ২/৫২৫।

৪৬৪. আল-ইস্তিযকার ৩/২৯৪; আল-বাইহাকী ১/৩৪২; আল-মাজমূ' ২/৫২৪।

৪৬৫. আল-ইখতিয়ারাত পৃ. ৩০।

www.waytojannah.com

o মতানৈক্যের কারণ

১. এক্ষেত্রে এমন কোন হাদীস নেই যার ওপর আমল করা সম্ভব।

২. এক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থা বিভিন্ন হওয়ার কারণে অভিজ্ঞতার আলোকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দুষ্কর।

o দলীল-প্রমাণাদি

প্রত্যেকেই এখানে অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের যার কাছে যা পৌঁছেছে সে হিসেবে প্রত্যেকে তাদের মতামত পেশ করেছে।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

এখানেও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মেয়াদ নির্দিষ্ট নেই। যেহেতু এ রক্ত চেনার উপায় আছে সেহেতু যতক্ষণ এটা আসতে থাকবে ততক্ষণ সেটা নেফাসের রক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। ৪০ কিংবা ৬০ চূড়ান্ত কথা নয়।

মৃত জন্তুর চামড়া সংক্রান্ত বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

কোন জন্তু মারা গেলে সেটার চামড়া দ্বারা কি উপকৃত হওয়া যাবে? যদি যায় তবে কোন্ ধরনের জন্তুর চামড়ায় এবং কিভাবে?

o মতামতসমূহ

মৃত জন্তু দিয়ে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

১. ইমাম যুহরীর মতে, কাঁচা অথবা পাকানো যে কোন ধরনের চামড়া দিয়ে উপকৃত হওয়া বৈধ।[৪৬৬]

২. আবার কারও কারও মতে, মৃত জন্তুর পাকানো চামড়া দিয়েও উপকৃত হওয়া বৈধ নয়।[৪৬৭] এ মতটি সাহাবাদের মধ্যে উমর, ইবন উমর, আয়েশা ও ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত।

৩. ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ী ও দাউদ আয-যাহেরী রাহেমাহুমুল্লাহ্ পাকা ও কাঁচা চামড়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে, পাকানো চামড়া

---

৪৬৬. আল-আওসাত ২/২৫৯, ২৬৮; আল-ইসরাফ ১/১১২; আল-মাজমূ' ১/২১৭।

৪৬৭. আল-ইসরাফ ১/১১১; আল-মাজমূ' ১/২১৭।

www.waytojannah.com

পবিত্র।[৪৬৮] তবে ইমাম আবূ হানিফা এ বিধান থেকে শূকরকে আলাদা করেছেন। আর ইমাম শাফে'য়ী শূকর ও কুকুরকে আলাদা সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ এদের চামড়া পাকানোর পরও পবিত্র হয় না।[৪৬৯] দাউদ আয-যাহেরীর মতে, যে কোন চামড়াই পাকানোর পর পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং এর দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। এমনকি শূকরেরও।

৪. ইমাম আহমদ রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, যে সমস্ত জন্তু হালাল, কেবলমাত্র সে সমস্ত জন্তুর চামড়া পাকানোর ফলে পবিত্র হয়, অন্যগুলো নয়। এ মতটিকে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা পছন্দ করেছেন।[৪৭০]

৫. ইমাম মালিক (রহ) থেকে এ বিষয়ে দু'টি মত পাওয়া যায়।

ক. প্রথম মতটি হলো ইমাম আবূ হানিফা ও শাফে'য়ী (রহ)-এর ন্যায়।[৪৭১]

খ. তাঁর দ্বিতীয় মত হলো—পাকানো দ্বারা চামড়া পবিত্র হয় না বরং এসব চামড়াকে শুকনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।[৪৭২] এটি ইমাম আহমদ-এরও একটি মত।

o মতানৈক্যের কারণ

তাদের মতভেদের কারণ হলো, এক্ষেত্রে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত হওয়া।

o দলীল-প্রমাণাদি

১. মায়মুনা (রা)-এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায় সাধারণভাবে মৃত প্রাণীর চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। এ হাদীসে এসেছে :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال وجد النبيُّ ﷺ شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي ﷺ هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها ·

৪৬৮. আল-হিদায়া ফাতহুল কাদীরসহ ১/৯২; আল-উম্ম ১/৫৫; আল-মাজমু' ১/২১৭; আল-ইনসাফ ১/১৬২।

৪৬৯. পূর্বোক্ত।

৪৭০. আল-ইনসাফ ১/১৬২।

৪৭১. এটি ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনা। আল-ইসরাফ ১/১১০।

৪৭২. আল-ইসরাফ ১/১১০; আল-মাজমূ' ১/২১৭, ২২১; আল-ইনসাফ ১/১৬১, ১৬৪।

www.waytojannah.com

"একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন—"তোমরা কেন এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হলে না?" সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এটা তো মৃত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হারাম তো শুধু এটা খাওয়া।"[৪৭৩]

২. ইবনু ওকাইম (রা)-এর হাদীসে এসেছে,

عن عبد الله بن عكيم الجهني قال : اتانا كتاب النبي ﷺ ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে চামড়া দিয়ে উপকৃত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্রে লিখেছেন, "তোমরা কাঁচা চামড়া ও রগ দিয়ে উপকৃত হয়ো না।"[৪৭৪]

৩. কোন কোন বর্ণনায়, পাকানোর পর উপকৃত হওয়ার অনুমতি এবং পাকানোর পূর্বে উপকৃত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন,

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ أيما إهاب دبغ فقد طهر .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে চামড়াই পাকানো হয়, তা পবিত্র হয়ে যায়।"[৪৭৫]

৪. অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এসেছে,

عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت .

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত জন্তুর চামড়া যখন পাকানো হয় তখন তা দ্বারা উপকৃত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[৪৭৬]

এসব বর্ণনার পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে আলিমগণ এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন।

---

৪৭৩. বুখারী ১৪৯২; মুসলিম ৩৬৩।

৪৭৪. আবূ দাউদ ৪১২৭; তিরমিযী ১৭২৯; নাসায়ী ৪২৪৯; ইবনে মাজাহ ৩৬১৩; মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১০।

৪৭৫. তিরমিযী ১৭২৮; ইবনে মাজাহ ৩৬০৯; অন্য শব্দে মুসলিম ৩৬৬।

৪৭৬. মুসনাদে আহমাদ ৬/৭৩।

www.waytojannah.com

* এক শ্রেণীর আলিম ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীস অনুযায়ী সমন্বয় সাধন করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কাঁচা ও পাকা চামড়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

* অপর এক শ্রেণীর আলিম নসখের তথা রহিতকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁরা ইবন ওকাইম (রা)-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন। কেননা, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর একমাস পূর্বে বলেছিলেন।

* অন্য একশ্রেণীর আলিম মায়মুনা (রা)-এর হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের মতে, উক্ত হাদীসে ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের চেয়েও বেশি কিছু সন্নিবেশিত করে, যা ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ীর (রহ)-এর মাযহাব।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করলে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ীর মতই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে মনে হয়। তাঁরা অধিকাংশ হাদীসের মধ্যে আমল করতে চেষ্টা করেছেন।

www.waytojannah.com

সালাত অধ্যায়

বিতর কি ওয়াজিব?

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

সর্বসম্মত মত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এর বাইরে কোন সালাত ফরয নেই। ফুকাহায়ে কিরামের নিকট 'ফরয' হল : শরীয়ত প্রবর্তক যে কাজ হওয়া আবশ্যিকভাবে চেয়েছেন, যা অকাট্য দলীলের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত, যে কাজের উপর সাওয়াব রয়েছে, ওযর ব্যতীত ছেড়ে দিলে বা তরক করলে শাস্তি রয়েছে এবং যার অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয়, যেমন, সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত। আর 'ওয়াজিব' হল : শরীয়ত প্রবর্তক যে কাজ হওয়া আবশ্যিকভাবে চেয়েছেন, কিন্তু তা সন্দেহযুক্ত যন্নী (ধারণাকৃত) দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত, এর পালনকারীর জন্য সাওয়াব রয়েছে এবং ওযর ব্যতীত ছেড়ে দিলে শাস্তি রয়েছে। আর এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না, কিন্তু তার প্রতি ফিসকের হুকুম দেয়া যাবে, যেমন সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব। ফরয-ওয়াজিবের মাঝে এ পার্থক্য হল হানাফী মাযহাবে।[৪৭৭] হানাফী মাযহাব মুতাবিক উক্ত ওয়াজিব ফরয থেকে নিচে।[৪৭৮] কেউ কেউ বলেন : হানাফী ফকীহদের মতে, ওয়াজিব তরক করা জাহান্নামের শাস্তিকে আবশ্যিক না করলেও কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত হারাম হওয়াকে আবশ্যক করে। আর এটাই মুমিনের জন্য বড় শাস্তি।[৪৭৯]

অন্য তিন মাযহাবে ফরয ও ওয়াজিব একই অর্থে (অর্থাৎ ফরযের স্থানে ওয়াজিবও) ব্যবহৃত হয়।[৪৮০] হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য সকল মাযহাবে ফরযের পরে সুন্নাতে মুআক্কাদার স্থান। সুতরাং এ বিষয়ে মতভেদ হয়েছে যে, সালাতুল বিতরকে কি বলা হবে, ওয়াজিব না-কি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্?

---

৪৭৭. আত-তা'রিফাত, ওয়া মুসত্বালাহাতে ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ৪।

৪৭৮. 'আব্দুর রহমান আল-জাযিরী, আল-ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, ১/৫২১।

৪৭৯. আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ১/২৪৬।

৪৮০. আত-তা'রিফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

www.waytojannah.com

o মতামতসমূহ

মাযহাব চতুষ্টয় (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী)-এর মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

হানাফী মাযহাবে : সালাতুল-বিতর (এশার নামাযের পর থেকে সুবহি সাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে) পড়া ওয়াজিব।[৪৮১]

আর বাকী তিন মাযহাব (মালিকী, শাফে'য়ী ও হাম্বলী) অনুযায়ী বিতরের সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।[৪৮২]

o মতানৈক্যের কারণ

এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা। বিশেষ করে যে সমস্ত হাদীসে ইসলামের রুকন হিসেবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর সাথে বিতর ওয়াজিবকারী হাদীসের বিরোধিতার ধারণা।

o দলীল-প্রমাণাদি

হানাফী মাযহাবের দলীল হচ্ছে,

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস, তিনি বলেছেন,

عَنْ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : ان الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها .

"আমর ইবন শু'আইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি সালাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হচ্ছে, বিতর। সুতরাং তোমরা সেটা সংরক্ষণ করবে।"[৪৮৩]

২. তিনি আরও বলেছেন,

عن بريدة الأسلمي أن رسول الله ﷺ قال : الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا .

"বুরাইদাহ আল-আসলামী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিতর হক্ক বা যথাযথ আবশ্যকীয় আমল, সুতরাং যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৪৮৪]

---

৪৮১. আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ১/৫২১।

৪৮২. আত-তা'রিফাত, পৃ. ১৫; আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ১/৫২১।

৪৮৩. মুসনাদে আহমাদ, ২/১৮০, ২০৫, ২০৮, ৬/৭।

৪৮৪. আবূ দাউদ ১৪১৯; মুসনাদে আহমদ ৫/৩৫৭, শুআইব আরনাউত বলেন, হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী; তাছাড়া হাদীসটি আরও এসেছে, মুস্তাদরাকে হাকিম ১/৩০৬; মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী, পৃ. ৫।

৩. অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن خارجة بن حذافة قال : قال لنا رسول الله ﷺ إن الله قد أمدكم بصلاة هى خيرلكم من حمر النعم جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر .

"খারেজাহ ইবন হুযাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একটি সালাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যা তোমাদের জন্য লাল উষ্ট্রির চেয়েও বেশি উত্তম। যাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ইশার সালাত থেকে সুবহে সাদিক উদিত হওয়া সময়ের মধ্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"[৪৮৫]

৪. অন্য হাদীসে এসেছে,

عن أبى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله ﷺ الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخساى فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل .

"আবূ আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক বা আবশ্যকীয় বিষয়, সুতরাং যে পাঁচ দিয়ে বিতর করতে চায় সে যেন তা-ই করে, আর যে তিন দিয়ে বিতর করতে চায় সে যেন তা-ই করে, আর যে এক রাকা'আতে বিতর করতে চায় সে যেন তা-ই করে।"[৪৮৬]

পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামের দলীল হচ্ছে,

১. ইসরা ও মি'রাজের হাদীসে সরাসরি পাঁচ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدىّ .

"সেটা পাঁচ, আর সেটাই পঞ্চাশ, আমার কাছে কথার কোন পরিবর্তন নেই।"[৪৮৭]

---

৪৮৫. দারমী ১৫৭৬; বুখারী, তারিখুল কাবীর ৩/২০৩; ইবনে আবদিল হাকাম, ফুতুহি মিসর, পৃ. ২৫৯-২৬০; আবূ দাউদ ১৪১৮; ইবনে মাজাহ ১১৬৮; তিরমিযী ৪৫২; দারা কুতনী ২/৩০; মুস্তাদরাকে হাকিম ১/৩০৬; বায়হাকী ফিল কুবরা ২/৪৭৭-৪৭৮; আল-বাগভী ৯৭৫; মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৩৯/৪৪২-৪৪৪ (নতুন সংস্করণ, তাহকীক আব্দুল্লাহ তুর্কী) সনদটি সহীহ লিগাইরিহী।

৪৮৬. আবূ দাউদ ১৪২২।

৪৮৭. বুখারী ৩৪৯; মুসলিম ১৬৩।

www.waytojannah.com

২. তাছাড়া আ'রাবী বা সেই বেদুঈনের বিখ্যাত হাদীসে এসেছে,

الأعرابى الذى سأل النبى ﷺ عن الإسلام فقال له : خمس صلوات فى اليوم والليلة قال هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع .

"যে বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সেটি দিন-রাতে পাঁচটি সালাত। বেদুইন বললেন, আমার উপর এর বাইরে কি কোন কর্তব্য আছে? রাসূল বললেন, না, তবে যদি তুমি নফল কিছু করতে চাও।"[৪৮৮]

৩. তারা আরও বলেন যে, হানাফীদের নিকট আল্লাহ্র কালামের উপর হাদীস দিয়ে কোন কিছু বাড়ানো আল্লাহ্র কালামের জন্য নাসখ হিসেবে পরিগণিত হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইসরা ও মি'রাজের রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করার পর বলে দিয়েছেন, إنه لا يبدل القول لدى "নিশ্চয় আমার কাছে কোন কিছুর পরিবর্তন নেই।"[৪৮৯] সুতরাং কিভাবে হাদীস দিয়ে এক ওয়াক্ত সালাত বাড়ানো হলো?

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

বিভিন্ন হাদীসদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, এখানে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্-এর দলীল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাছাড়া এগুলোতে কোথাও কোথাও واجب শব্দ সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৯০] সুতরাং বিতরকে ওয়াজিব-ই বলা আবশ্যক। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দলীল বিশুদ্ধ হলেও সাধারণ ও ব্যাপক, যা শুধু এ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাছাড়া এ পাঁচ সালাত ছাড়া আরও ফরয সালাত (যথা জুমআ) সবার নিকট রয়েছে। সুতরাং পাঁচ সালাতের পরে শরী'আত কর্তৃক আরও সালাত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা হাদীসের ভাষ্য أمدكم এবং زادكم দ্বারা বেশি স্পষ্ট।

সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

সালাত বা নামায ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। কেউ যদি সালাত অস্বীকার করে তবে সে সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ অস্বীকার করল না কিন্তু ইচ্ছা করে সালাত পরিত্যাগ করল তার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

---

৪৮৮. বুখারী ৪৬, মুসলিম ১১।

৪৮৯. বুখারী ৭৫১৭; মুসলিম ১৬৩।

৪৯০. ইবনুল কাত্তান, আল-ওয়াহমি ওয়াল ই-হাম ৫/৩৫০; যায়লা'য়ী, নাসবুর রায়া ২/১১২; দারাকুতনী ২/২২; মুসনাদে তায়ালাসী ৫৯৩; মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বাহ ২/২৯৭; শারহু মা'আনিল আসার ১/২৯১।

www.waytojannah.com

o মতামতসমূহ

এ ব্যাপারে ইমামগণ নিম্নোক্ত মতভেদ করেছেন :

১. তাকে হত্যা করা হবে। তাঁরা আবার হত্যার কারণ নির্ণয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়েছেন :

* একদলের মতে, তার হত্যা হবে কুফরীর কারণে। এটি ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, ইবনুল মুবারক-এর মত।

* অপরদলের মতে, তাকে শাস্তিমূলক হত্যা করা হবে। এটি ইমাম মালিক, শাফে'য়ীর মত।

২. ইমাম কর্তৃক তাকে তা'যীর বা অনির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা হবে। আর তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে সালাত আদায় করে। এটি ইমাম আবূ হানিফা ও আহলে যাহের-এর মত।[৪৯১]

o মতানৈক্যের কারণ

মতভেদের কারণ হচ্ছে, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীসের ভাষ্য বোঝার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য। কোন কোন হাদীসে সালাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, فقد كفر এখানে كفر শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরলে তাকে মুরতাদের শাস্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়। পক্ষান্তরে যারা كفر শব্দকে এখানে ধমকের অর্থে ব্যবহার করে এর অর্থ করেছেন, إن أفعاله أفعال كافر বা তার কাজ হচ্ছে কাফেরের কাজ। যেমন অন্য হাদীসে لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن বা "ব্যভিচারী ব্যভিচারের সময় ঈমানদার থাকে না আর চোরও চুরি করার সময় ঈমানদার থাকে না।" এ হাদীসে যেমন যিনাকারী ও চোরকে ঈমানদার নয় বলার পরও কেউই তাদেরকে কাফের বলেন না, বরং তাদেরকে গোনাহগার ফাসেক মুমিন বলেন, তেমনিভাবে উপরোক্ত সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসে فقد كفر-কেও অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করে তারা তাদেরকে কুফরীর কারণে হত্যার পক্ষে মত দেন নি। বরং তাদেরকে শাস্তিমূলক হত্যার পক্ষে মত দিয়েছেন। আর যারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে হত্যাকে গ্রহণ করেননি তারা শাস্তি হিসেবে তা'যীর ও কয়েদ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

o দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম আহমদ ও তাঁর মতাবলম্বীগণের দলীল হচ্ছে,

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস,

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر .

---

৪৯১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৯০।

www.waytojannah.com

Contents

"আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাদের মধ্যে ও কাফেরদের মধ্যে অঙ্গীকার হচ্ছে সালাতের, যে কেউ তা ত্যাগ করবে সে অবশ্যই কুফরী করল।"[৪৯২]

২. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة .

"জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দা ও কুফরীর মাঝে সালাত ছেড়ে দেয়া ব্যতীত আর কোন কিছু নেই।"[৪৯৩] অর্থাৎ সালাত ছেড়ে দেয়াই কুফরী।

৩. তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ترك الصلاة কে কাফেরই মনে করা হত :

عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .

"আবদুল্লাহ ইবন শাকীক আল উকাইলী বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ সালাত ব্যতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী গণ্য করতেন না।"[৪৯৪]

৪- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কাফেরদের বলা হবে,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ .

"তোমাদেরকে কিসে 'সাকার' জাহান্নামে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির : ৪২-৪৩]

সুতরাং বোঝা গেল যে, সালাত ত্যাগকারী জাহান্নামী।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও শাফে'য়ী মতাবলম্বীগণ যেহেতু কুফরী বা মুরতাদের শাস্তি হিসেবে হত্যার হুকুম দেন না তাঁরা এ সমস্ত হাদীস দিয়ে দলীল দেন না। তাদের দলীল হচ্ছে,

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لآ إله الاّ اللّهُ وأن محمدًا رسول الله وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله .

---

৪৯২. তিরমিযী ২৬২১; নাসায়ী ৪৬৩; ইবনে মাজাহ ১০৭৯; মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৪৬; সহীহ ইবনে হিব্বান ১৪৫৪।

৪৯৩. নাসায়ী ৪৬৪; ইবনে মাজাহ ১০৮০; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৭০; সহীহ ইবনে হিব্বান ১৪৫৩।

৪৯৪. তিরমিযী ২৬২২।

www.waytojannah.com

"আমাকে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। তারপর তারা যদি তা করে, তবে তাদের জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। তবে যদি ইসলামের কোন অধিকারে তাদেরকে পাকড়াও করা হয় সেটা ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র উপর।"[৪৯৫]

২. তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের হত্যা না করার জন্য যে শর্ত করেছেন তা হচ্ছে, তাওবা করা ও সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা। সুতরাং সেটা না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ্ বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ .

"অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও।"[৪৯৬]

৩. অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة .

"পাঁচ সালাত যেগুলো আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর লিখে দিয়েছেন, সুতরাং যে কেউ এগুলোর কোন কিছুকে হাল্কা মনে করে নষ্ট না করে নিয়ে আসবে, তার জন্য তা আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার হিসেবে গণ্য হবে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে এগুলো নিয়ে আসতে পারবে না, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে কোন অঙ্গীকার থাকবে না, যদি তিনি চান তাকে শাস্তি দিবেন, আর চাইলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৪৯৭]

অর্থাৎ যদি নামায তরককারী কাফের হতো, তবে তখনই সে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন থাকতো না। বরং সে সরাসরি জাহান্নামের অধিবাসী হতো।

সুতরাং এ দলীলের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে। কাফের হিসেবে হত্যার বিধান দেয়া হয়নি।

অন্যদিকে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্র মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে তিনি যা পেশ করেন, তা হচ্ছে,

---

৪৯৫. বুখারী, ২৫; মুসলিম ২০।

৪৯৬. সূরা আত-তাওবাহ্ : ৫।

৪৯৭ আবূ দাউদ ১৪২০; নাসায়ী ৪৬১; ইবন্ মাজাহ্ ১৪০১; মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৭।

www.waytojannah.com

Contents

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করা ঐ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তিনটি কাজের কোন একটি করবে : ঈমানের পরে কুফরী করবে (মুরতাদ হয়ে যাবে), অথবা বিয়ের পরে ব্যভিচার করবে, অথবা কোন আত্মাকে প্রাণের বদলে প্রাণ ব্যতীত হত্যা করবে।"[৪৯৮]

এখানে এ তিনটির কোনটিই পাওয়া যায়নি। সুতরাং তাকে হত্যা করা হবে না, যতক্ষণ না সে মুরতাদ হয়ে গেছে বলে প্রমাণিত হবে।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

দলীল-প্রমাণাদি বিশ্লেষণের পর এটাই স্পষ্ট হয় যে, সাহাবা, তাবেয়ীন তথা সালফে সালেহীন সালাত ত্যাগ করাকে অনেক বড় গুনাহের কাজ মনে করতেন। কারণ, কালেমা হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতির প্রমাণ। আর সালাত হচ্ছে, কর্মগত স্বীকৃতির প্রমাণ।[৪৯৯] সুতরাং প্রত্যেক ঈমানদারের উচিত সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

যোহরের সালাতের শেষ সময়

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ :

যোহরের সালাতের প্রথম সময়ের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কারও কোন মতভেদ নেই। কিন্তু যোহরের সালাতের সময় কখন শেষ হয়? এটিই এখানে মূল মাসআলা।

o মতামতসমূহ

এ ব্যাপারে ফকীহদের মতামত নিম্নরূপ :

১. মালিক, শাফে'য়ী, আহমাদ, আবূ সাওর ও দাউদ-এর মতে, যোহরের সালাতের শেষ সময় হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুর ছায়া বস্তুটির মত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হওয়া।

২. আবূ হানিফা-এর মতে, যোহরের সালাতের শেষ সময় হচ্ছে প্রতি বস্তুর ছায়া বস্তুটির দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হওয়া। আর এটিই আসরের প্রথম সময়। এটি ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর এক বর্ণনা।[৫০০]

---

৪৯৮. দারমী ২/২২৫; অনুরূপ বর্ণনা, বুখারী ৬৮৭৮; মুসলিম ১৬৭৬।

৪৯৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ ২৭/৫৩-৫৪।

৫০০. হাশিয়া ইবনে আবেদীন ১/২৪০; হিদায়া, ফাতহুল কাদীর সহ ১/১৯২; জাওয়াহিরুল ইকলীল ১/৩২; মাওয়াহিবুল জালীল ১/৩৮২; মুগনিল মুহতাজ ১/১২১, ১২২; ইবনে কুদামা, মুগনী ১/৩৭১. ৩৭৫; কাশ্শাফুল কিনা' ১/২৫০, ২৫১।

www.waytojannah.com

৩. আবূ হানিফা (রহ)-এর অপর মতে, যোহরের সালাতের শেষ সময় হচ্ছে প্রতিটি বস্তুর ছায়া বস্তুটির মত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হওয়া। আর আসরের সময় শুরু হয়, প্রতিটি বস্তুর ছায়া বস্তুটির ছায়ার দ্বিগুণ হওয়া। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ এক ছায়া থেকে দ্বিতীয় ছায়া পর্যন্ত সময়ে কোন সালাত নেই। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ-এর মত।[৫০১]

o মতানৈক্যের কারণ

এ ব্যাপারে মতানৈক্যের কারণ হচ্ছে, জিবরীলের ইমামতির হাদীসের সাথে আরেকটি হাদীসের ভাষ্যের মত বাহ্যিক অমিল হওয়া।

o দলীল-প্রমাণাদি

মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদ রাহেমাহুমুল্লাহ্-এর দলীল হচ্ছে,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিবরীল বায়তুল্লাহর কাছে দু'দিন নামাযের ইমামতি করেছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমদিন নামাযের প্রথম সময় আর দ্বিতীয় দিন নামাযের শেষ সময়ে সালাত আদায় করে বলেছিলেন যে, الوقت ما بين هذين "সময় হচ্ছে এ দু'সময়ের মধ্যবর্তী সময়।" সেখানে এসেছে,

ان جبريل صلى بالنبى ﷺ الظهر فى اليوم الأول حين زالت الشمس وفى اليوم الثانى حين كان ظل كل شىء مثله ثم قال : الوقت ما بين هذين ٠

"প্রথম দিন জিবরীল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে যোহর ঐ সময় আদায় করেছেন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। আর দ্বিতীয় দিন ঐ সময় আদায় করলেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার অনুরূপ হলো। তারপর জিবরীল বললেন, নামাযের হচ্ছে সময় এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়।"[৫০২]

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্-এর দলীল হচ্ছে,

عن سالم بن عبد الله عن أبيه انه اخبره انه سمع رسول الله ﷺ يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فاعطوا

---

৫০১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৯২।

৫০২. আবূ দাউদ ৩৯৩; দারা কুতনী ১/২৬৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১/২৮০ নং ৩২২০; মুসান্নাফে আবদির রায্যাক ১/৫৩১ নং ২০২৮; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৩৩; তিরমিযী ১৪৯; ইবনুর জারূদ ১৪৯; ইবন খুযাইমাহ ৩২৫।

www.waytojannah.com

قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أى ربنا : اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطًا قيراطًا ونحن كنا اكثر عملا قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضل أوتيه من أشاء ٠

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এ দুনিয়াতে অবস্থানের তুলনা হচ্ছে, দিনের আসর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময় অনুপাতে। তাওরাতওয়ালাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, তারা সেটা অনুসারে দিবসের মধ্যভাগ পর্যন্ত আমল করার পর অপারগ হয়ে পড়ল তখন তাদেরকে এক কীরাত, এক কীরাত সাওয়াব দেয়া হলো, তারপর ইঞ্জীলওয়ালাদেরকে ইঞ্জীল দেয়া হয়েছিল, তারা আসরের সময় পর্যন্ত সেটা অনুসারে আমল করার পর অপারগ হয়ে পড়ল, তখন তাদেরকে এক কীরাত, এক কীরাত সাওয়াব দেয়া হলো। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো, আমরা সেটার উপর আসরের পর থেকে সূর্য ডুবার সময় পর্যন্ত আমল করলাম, তখন আমাদেরকে দুই কীরাত, দুই কীরাত দেয়া হলো। তখন আহলে কিতাবগণ বলতে লাগলেন, হে আমাদের রব! তাদেরকে দুই কীরাত দুই কীরাত করে দিলেন আর আমাদেরকে এক কীরাত এক কীরাত করে দিলেন, অথচ আমরা বেশি আমল করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমি কি তোমাদের সাওয়াব প্রদানে কোন যুলুম করেছি? তারা বলল: না। তখন তিনি বললেন, এটা আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা তা দান করি।"[৫০৩]

ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ এ হাদীসের مفهوم বা উদ্দেশ্য থেকে বুঝে নিয়েছেন যে, যদি আসর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময় যোহর থেকে আসরের সময় পর্যন্ত সময় থেকে স্বল্প হয়ে থাকে, যেমনটি আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কাছে দাবি করে বলেছে বলে এ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, তাহলে অবশ্যই আসরের সময় দুই ছায়ার পরেই হতে হয়, আর এক ছায়ার পরেও যোহরের সময় বর্ধিত হতে হয়। সুতরাং এক ছায়ার পরিমাণ দৈর্ঘ্যের পরও যোহরের ওয়াক্ত বাকী থাকে। সে হিসেবে যোহ্রের সালাতের শেষ সময় হবে, দুই ছায়া পর্যন্ত।

০ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

এখানে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, ইমাম মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদের মত। কারণ, তাঁরা এখানে সরাসরি হাদীসের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বক্তব্যের সাহায্য নিয়েছেন।

৫০৩. বুখারী ৫৫৭; মুসনাদে আহমাদ ২/১২৯; সহীহ ইবন হিব্বান ৭২২১।

www.waytojannah.com

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ 'মাফহূম' বা অব্যক্ত বক্তব্যের সাহায্য নিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে সরাসরি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীতে মাফহূম তেমন শক্তিশালী বক্তব্য নয়।

আর সেজন্যই হয়ত ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্-এর ছাত্রদ্বয় ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহেমাহুমাল্লাহ্ও ইমামের মতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন।

তাছাড়া ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইবন হাযম বলেন, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, এতে যোহরের ওয়াক্ত এক ছায়ার পরে বাকী থাকার প্রয়োজন পড়ে না।[৫০৪]

মাগরিবের সালাতের শেষ সময়

০ মাসআলাটির পূর্ণরূপ :

এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই যে, সূর্য ডুবার পর থেকে মাগরিবের নামাযের সময় শুরু হয়। কিন্তু মাগরিবের নামাযের কি বর্ধিত সময় আছে? অর্থাৎ অন্যান্য নামাযের মত মাগরিবের নামাযের সময় বর্ধিত হয়ে কতক্ষণ থাকে? বা কখন শেষ হয়?

০ মতামতসমূহ

১. ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে, মাগরিবের নামাযের শেষ সময় "শাফাক" বা আভা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। এটি ইমাম আহমাদ, আবূ সাওর ও দাউদ আয-যাহেরীরও অভিমত।[৫০৫]

২. ইমাম মালিকের মতে, মাগরিবের নামাযের কোন বর্ধিত সময় নেই। বরং প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করার পর যেমন, ওযু, গোসল, কাপড় পরিধান করার পর তিন রাকা'আত সালাত আদায় করা পর্যন্তই এর সময় থাকে।[৫০৬]

৩. ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এর নতুন মত হচ্ছে, সূর্য ডুবার পর ওযু, সতর ঢাকা, আযান, ইকামত ও পাঁচ রাকা'আত, ফরয তিন ও সুন্নাত দুই রাকা'আত পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু করা পর্যন্ত সময়ই কেবল মাগরিবের সালাতের সময়।[৫০৭]

০ মতানৈক্যের কারণ

এ ব্যাপারে মতানৈক্যের মূল কারণ হচ্ছে, জিবরীলের (আ) ইমামতির হাদীসের সাথে অপর একটি হাদীসের বাহ্যিক বিরোধ।

---

৫০৪. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৯১-৯৩।

৫০৫. বাদায়েউস সানায়ে' ১/১২৩।

৫০৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৯৫-৯৬।

৫০৭. বাদায়েউস সানায়ে' ১/১২৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল ১/৩৩; নিহায়াতুল মুহতাজ ১/৩৫৩, ৩৫৪; হাশিয়াতুল কালইয়ূবী আলাল মিনহাজ ১/১১৪; আল-মুগনী ১/৩৭৪, ৩৭৫।

www.waytojannah.com

o দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর সমমতের ইমামদের দলীল হচ্ছে,

قوله ﷺ وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ·

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাগরিবের সালাতের সময় হচ্ছে যতক্ষণ না 'শাফাক' বা আভা ডুবে যাবে।"[৫০৮]

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও তাঁর সমমতের ইমামদের দলীল হচ্ছে,

حديث إمامة جبريل انه صلى المغرب فى اليومين فى وقت واحد ·

"জিবরীলের ইমামতির ঘটনায় দু'দিনেই জিবরিল (আ) মাগরিবের নামায একই সময় সূর্য ডুবার পরেই পড়েছেন।"[৫০৯]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

এখানে ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কারণ, এখানে ভিন্ন একটি সহীহ হাদীসে মাগরিবের সময়ের ব্যাপারে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যাতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ জিবরিলের (আ) ইমামতির হাদীসে না আসলেও পরবর্তীতে মাগরিবের এ সময়টিতে প্রশস্ততা এসেছে।

এশার সালাতের প্রথম ও শেষ সময়

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

এশার নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে দু' স্থানে মতবিরোধ হয়েছে। এক. ওয়াক্তের শুরু কখন থেকে। দুই. ওয়াক্তের শেষ কখন হবে।

o মতামতসমূহ

এশার ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ :

১. ইমাম মালিক ও শাফে'য়ী ও একদল ফকীহের মতে, এশার ওয়াক্ত শুরু হয় 'শাফাকে আহমার' বা লাল আভা চলে যাওয়ার পর থেকে।[৫১০]

২. ইমাম আবূ হানিফা ও যুফার-এর মতে, এশার ওয়াক্ত শুরু হয় "শাফাকে আবইয়াদ" বা সাদা আভা চলে যাওয়ার পর থেকে।

---

৫০৮. মুসলিম ৬১২।

৫০৯. আবূ দাউদ ৩৯৩; দারা কুতনী ১/২৬৪; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৩৩।

৫১০. হাশিয়া ইবনে আবেদীন ১/২৪১; মাওয়াহিবুল জলীল ১/৩৯৭; মুগনিল মুহতাজ ১/১২৩, ১২৪; আল-মুগনী ১/৩৮৪।

www.waytojannah.com

o মতানৈক্যের কারণ

এ মাসআলায় মতানৈক্যের মূল কারণ হচ্ছে, 'শাফাক' শব্দটি আরবী ভাষায় একটি 'মুশতারাক' শব্দ। যা একই সাথে লাল আভা ও সাদা আভা উভয় প্রকার আভাকেই শামিল করে। এই লাল ও সাদা আভার মধ্যে প্রায় বার মিনিট পার্থক্য থাকে।[৫১১] হাদীসে শুধু 'শাফাক' শব্দ এসেছে। এখন এ 'শাফাক' শব্দের অর্থ কোন্‌টি নেয়া হবে তা নিয়ে মতভেদ ঘটেছে।

হাদীসে এসেছে,

قوله ﷺ وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাগরিবের সালাতের সময় হচ্ছে যতক্ষণ না 'শাফাক' বা আভা ডুবে যাবে।"[৫১২]

o দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম আবূ হানিফার দলীল হচ্ছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

ويصلي العشاء حين يسود الأفق .

"আর তিনি এশা পড়তেন যখন দিগন্ত কালো হয়ে যেত।"[৫১৩]

আর তখনই শুধুমাত্র দিগন্ত কালো হয়, যখন সূর্য অন্ধকারে লুপ্ত হয়। আর সেটা সাদা আভা চলে যাওয়ার পরই কেবল সংঘটিত হয়।[৫১৪]

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহদের মতের পক্ষে দলীল হচ্ছে,

بما جاء عن النبي ﷺ أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এসেছে যে, তিনি এশা পড়তেন যখন তৃতীয়ার চাঁদ লুপ্ত হত।[৫১৫] আর তখনই তৃতীয়ার চাঁদ লুপ্ত হয় যখন লাল আভা লুপ্ত হয়।[৫১৬]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

এখানে উভয় পক্ষের দলীলই শক্তিশালী। তবে সম্ভবত সাবধানতা হচ্ছে সাদা

---

৫১১. আল-মাওসূ'আতুল কুওয়াইতিয়্যাহ ৭/১৭৫।

৫১২. মুসলিম ৬১২।

৫১৩. সহীহ ইবন হিব্বান ৪/২৯৯, নং ১৪৯২; ইবনে খুযাইমাহ ৩৫২; দারা কুতনী ১/২৫০; আল-বায়হাকী ১/৩৬৩; আবূ দাউদ ৩৯৪; মুস্তাদরাকে হাকিম ১/১৯২, ১৯৩।

৫১৪. বাদায়েউস সানায়ে' ১/১২৪।

৫১৫. তিরমিযী ১৬৫ ; আবূ দাউদ ৪১৯; নাসায়ী ৫২৮।

৫১৬. বাদায়েউস সানায়ে' ১/১২৪।

www.waytojannah.com

Contents

আভা চলে যাওয়ার পরই এশার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়, একথা বলা। কারণ, মাগরিব ও এশার সালাতের মাঝখানে বাড়তি কোন সময় নেই। মাগরিব শেষ হলেই এশা শুরু হবে। যদি এশার ওয়াক্ত শুরু হতে দিগন্ত কালো হতে হয়, তবে তা সাদা আভার পরেই শুরু হয়।

এশার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ

o মতামতসমূহ

এশার নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদের মতামত নিম্নরূপ :

১. আবু হানিফা ও তার সাথীদের নিকট এশার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, সুবহে সাদিক শুরু না হওয়া পর্যন্ত। ইমাম শাফে'য়ীও একই মত পোষণ করেন। তবে তাঁর নিকট এশার সময় সাতটি। এক. ফযীলতের সময়, আর তা হচ্ছে, প্রথম সময়। দুই. পছন্দনীয় সময়, আর তা হচ্ছে, রাতের তিন ভাগের প্রথম অংশ। অথবা অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত। কারণ, হাদীসে এসেছে, لولا أن أشق على أمتى لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل। "যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন না হতো, তবে আমি এশাকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দেরী করতাম।"[৫১৭] তিন. সুবহে কাযিব পর্যন্ত জায়েয ওয়াক্ত। চার. মাকরূহসহ সুবহে সাদিক পর্যন্ত। পাঁচ. হারাম সময়। ছয়. ওয়াক্তে জরুরত বা প্রয়োজনের খাতিরে। সাত. ওযরের কারণে।[৫১৮]

২. হাম্বলীদের নিকট এশার পছন্দনীয় সময় হচ্ছে, রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ। তারপর সুবহে সাদিক পর্যন্ত জরুরত বা প্রয়োজনের সময়। যেমন কেউ অসুস্থতা থেকে সুস্থ হল বা কোন হায়েযওয়ালী বা নিফাসওয়ালী মহিলা পবিত্র হলো।[৫১৯]

৩. মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্তই এর শেষ সময়।

o মতানৈক্যের কারণ

মতভেদের মূল কারণ হচ্ছে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস পাওয়া। এবং জিবরীলের (আ) ইমামতির হাদীসের সাথে এশার সময়ের কি কোন কিছু বৃদ্ধি ঘটেছে কি না তা নির্ধারণ।

---

৫১৭ তিরমিযী ১৬৭; অনুরূপ তিরমিযী ১৫১।

৫১৮. আল-মাওসূ'আতুল কুওয়াইতিয়্যাহ ৭/১৭৬।

৫১৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৯৭; জাওয়াহিরুল ইকলিল ১/৩৩; কালইয়ূবী ১/১১৪; আল-মুগনী ১/৩৮১।

www.waytojannah.com

০ দলীল-প্রমাণাদি

মালিকী মাযহাবের আলিমগণ তাদের মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে জিবরীলের ইমামতির হাদীস পেশ করে থাকেন। যাতে এসেছে,

انه صلاهما فى اليوم الثنى فى ثلث اللّيل ۔

"তিনি জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে দ্বিতীয় দিন রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত দেরী করে পড়েছিলেন।"[৫২০]

সুতরাং এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেই এশার সময় শেষ।

পক্ষান্তরে যাঁরা অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে দলীল হচ্ছে,

عن أنس قال أخر النبى ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل ۔

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এশার নামাযকে দেরী করে আদায় করেছিলেন।"[৫২১]

অন্য হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন আমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ۔

"যখন তোমরা এশা আদায় করবে তখন সেটার সময় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত বিস্তৃত।"[৫২২]

অন্য হাদীসে এসেছে, আবূ বারযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كان رسول الله ﷺ لا يبالى بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ۔

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দেরী করাটা কিছু মনে করতেন না।"[৫২৩]

আর যারা সুবহে সাদিক পর্যন্ত এশার শেষ সময় বর্ধিত হিসেবে নিয়েছেন তাদের পক্ষে বড় দলীল হচ্ছে,

عن عائشة قالت اعتم النبى ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ۔

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার রাত্রের নামায (এশা) দেরী করে পড়লেন, এমনকি রাতের বেশির ভাগ

---

৫২০. আবূ দাউদ ৩৯৩; দারা কুতনী ১/২৬৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৮০ নং ৩২২০; মুসান্নাফে আবদির রায্যাক ১/৫৩১ নং ২০২৮; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৩৩; তিরমিযী ১৪৯; ইবনুল জারূদ ১৪৯; ইবন খুযাইমাহ ৩২৫।

৫২১. বুখারী ৫৭২; মুসলিম ৬৪০।

৫২২. মুসলিম ৬১২; আবূ দাউদ ৩৯৬।

৫২৩. মুসলিম ৬৪৭; নাসায়ী ৪৯১।

সময় পার হয়ে গেল।"[৫২৪] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, অর্ধরাত্রির পরও এশার সময় থাকে।

তাছাড়া অন্য হাদীসে আবূ কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ·

"ঘুমের মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি নেই, তবে যদি কেউ কোন সালাত আদায় না করে এমনকি পরবর্তী সালাতের সময় এসে যায়।"[৫২৫]

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, এক ওয়াক্ত সালাত শেষ হলে আরেক নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। সুতরাং এশা শেষ হলে ফজর শুরু হবে। আর ফজর শুরু হয় সুবহে সাদিকের পর থেকে। সুতরাং এশা সুবহে সাদিক পর্যন্ত বিস্তৃত।[৫২৬] এ সমস্ত হাদীসের আলোকে তাঁরা বলেন যে, এশার সর্বশেষ সময় সুবহে সাদিক শুরুর আগ পর্যন্ত। তাছাড়া عن نافع بن جبير قال كتب عمر إلى أبي موسى وصلّ العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها "নাফে' ইবন জুবাইর বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে লিখেছিলেন যে, আর এশার সালাত রাতের যে সময় ইচ্ছে তাতে আদায় কর, কিন্তু এ ব্যাপারে গাফেল থেকো না।"[৫২৭]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপর্যুক্ত মতামত ও দলীল-প্রমাণাদি বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায় যে, অর্ধ রাত্রির পর এশার নামায আদায় করা সম্পর্কে সরাসরি কোন শক্তিশালী দলীল নেই। তাই সাবধানতা হিসেবে অর্ধরাত্রির মধ্যেই এশার সালাত আদায় করাই উত্তম।

তাকবীরে তাহরীমার পরে 'তাওজীহ' ও সানা পাঠের বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ :

'তাওজীহ' হচ্ছে, নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করা :

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ·

---

৫২৪. মুসলিম ৬৩৮; নাসায়ী ৫৩৬।

৫২৫. মুসলিম ৬৮১; আবূ দাউদ ৪৪১।

৫২৬. যাইলা'য়ী, নাসবুর রায়াহ ১/২৩৪, ২৩৫; তাহাভী, শারহু মাআনিল আসার ১/৯৩।

৫২৭. পূর্বোক্ত; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ৩২৩১।

www.waytojannah.com

"আমি আমার চেহারা যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন একনিষ্ঠভাবে তার দিকে ফিরাচ্ছি। আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।"[৫২৮]

তাকবীরে তাহরিমার পর কি তা পাঠ করা যাবে? নাকি অন্য কোন দো'আ পাঠ করা হবে?

o মতামতসমূহ

১. وجهت وجهي – الخ পাঠ করা সুন্নাত। এটি ইমাম শাফে'য়ীর মাযহাব।[৫২৯]

২. অথবা তাসবীহ তথা সানা سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك বলা, তা ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আহমাদের মাযহাব।[৫৩০]

৩. অথবা উপরোল্লেখিত উভয়টির (তাওজীহ ও সানা) মধ্যে সমন্বয় সাধন করা- ইমাম আবূ ইউসুফের মাযহাব।[৫৩১]

৪. তবে ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, নামাযে তাওজীহ ওয়াজিবও নয়, সুন্নাতও নয়।[৫৩২]

o মতানৈক্যের কারণ

ক. তাওজীহের আমল বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন 'আসার' পাওয়া।

খ. উক্ত 'আসার'সমূহের বিশুদ্ধতার বিষয়ে আলিমদের ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ।[৫৩৩]

o দলীল-প্রমাণাদি

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফা ও আহমদের দলীল হচ্ছে,

عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك .

"আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তখন

৫২৮. মুসলিম : ৭৭১।

৫২৯. আল-মাজমূ' ৩/৩২১।

৫৩০. হিদায়া ফাতহুল কাদীরসহ ১/২৮৮; আল-মুগনী ২/১৪৩; আল-মাজমূ' ৩/৩২১।

৫৩১. প্রাগুক্ত।

৫৩২. আল-ইস্তিযকার ৪/১১৩; হাশিয়াতুদ দাসূকী, শারহুল কাবীর সহ ১/২৫১; আশ-শারহুস সগীর ১/৪৬৩।

৫৩৩. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১০৩; হাশিয়াতুদ দাসূকী, শারহুল কাবীর সহ ১/২৫১।

www.waytojannah.com

Contents

তাকবীরে তাহরিমার পরে বলতেন, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك অর্থাৎ সানা পাঠ করবেন।[৫৩৪]

ইমাম শাফে'য়ীর দলীল হচ্ছে,

عن أبي رافع قال : وقع إلى كتاب فيه استفتاح رسول الله ﷺ كان إذا كبر قال : إني وجهت وجهي للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ·

"আবূ রাফে' বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, إني وجهت وجهي للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ·।"[৫৩৫]

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ্ উপর্যুক্ত দু'টির যে কোনটি বলার পক্ষে মত দিয়েছেন।

আর ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ্ মনে করেন যে, উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ পরস্পরবিরোধী। তাই এ সবের কোনটিই সুন্নাত নয়; তাছাড়া নামাযে ভুলকারী ব্যক্তিকে যখন নামায শিখানো হলো তখন তাকে এ দো'আগুলোর কোনটিই শিখানো হয়নি।[৫৩৬]

O প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

দলীল-প্রমাণাদি দৃষ্টে বোঝা যায় যে, توجيه (সানা পাঠ অর্থে) সুন্নাত। এ ব্যাপারে শক্তিশালী অবস্থানে আছেন ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুমাল্লাহ্। তাঁদের দলীল শক্তিশালী। ইমাম শাফে'য়ীর দলীল কিছুটা দুর্বল; আর এটা জানা থাকাও আবশ্যক যে, এর বাইরে আরও কয়েক ধরনের দো'আ বর্ণিত আছে।[৫৩৭] সেগুলোও মাঝে মধ্যে বলা উচিত।

---

৫৩৪. আবূ দাউদ ৭৭৫।

৫৩৫. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর ১/৩১৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/২৭৮।

৫৩৬. হাশিয়াতুদ দাসূকী, শারহুল কাবীর সহ ১/২৫১

৫৩৭. বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে সেগুলো বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

সালাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়ার বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ :

তাকবীরে তাহরীমার পরে দো'আ আছে। তারপর কিরাআত শুরু করতে হয়। কিন্তু কিরাআতের শুরুতে কি বিসমিল্লাহ পড়া হবে?

o মতামতসমূহ

নামাযে কিরআতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়ার বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

১. ইমাম মালিক (রহ) ফরয সালাতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। সালাত জাহরী হোক কিংবা সিররী হোক (অর্থাৎ সালাতে কিরাআত জোরে পাঠ করা হোক কিংবা আস্তে পাঠ করা হোক), সূরা ফাতিহার শুরুতে কিংবা অন্য যেকোন সূরার শুরুতে হোক। তবে তিনি নফল সালাতের ক্ষেত্রে তা বৈধ মনে করেন।[৫৩৮]

২. ইমাম আবূ হানিফা, সাওরী ও আহমদ (রহ)-এর মতে, প্রত্যেক রাকা'আতে আস্তে আস্তে বিসমিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব।[৫৩৯]

৩. ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এর মতে, যে সালাতে জোরে কিরাআত পড়া হয় সেগুলোতে জোরে, যে সালাতগুলোতে আস্তে কিরাআত পাঠ করা হয় সেগুলোতে আস্তে বিসমিল্লাহ্ পড়া ওয়াজিব।[৫৪০] সম্ভবত এর কারণ, ইমাম শাফেয়ীর মতে বিসমিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার অংশ। এটা ইমাম আহমদ, আবূ সাওর ও আবূ ওবায়েদের মত। তবে বিসমিল্লাহ্ সূরা ফাতিহা ও সূরা নমল ছাড়া অন্য সব সূরার অংশ কিনা এ ব্যাপারে তার থেকে দু'ধরনের মত বর্ণিত হয়েছে।

o মতানৈক্যের কারণ

ক. এ বিষয়ে বর্ণিত আছারসমূহ পরস্পর বিরোধী।

খ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সূরা ফাতিহার আয়াত কিনা সে ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ।

---

৫৩৮. আল-ইস্তিযকার ৪/১৭০, ২০৫; মাওয়াহিবুল জালীল ১/৫৪৪; আশ-শারহুল কাবীর, হাশিয়াতুদ দাসূকী সহ ১/২৫১; আশ-শারহুস সাগীর ১/৪৬২; আল-আওসাত ৩/১২১; আশ-শারহুল কাবীর, ইনসাফসহ ৩/৪৩১।

৫৩৯. হাশিয়া ইবনে আবেদীন ১/৩২০, ৩২৯, ৩৩০; আশ-শুরুনবিলালী, হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ ১/১৩৪, ১৩৫; আল-মাওসূ'আতুল কুওয়াইতিয়্যাহ ৮/৮৭।

৫৪০. সুনান তিরমিযী ১/১৫৫; আল-বায়হাকী ২/৫০; আল-ইস্তিযকার ৪/১৭০, ২০৮; আল-মুহাল্লা ৩/২৫৩; আল-মাজমূ' ৩/৩৩৪; আল-মুগনী ২/১৪৯।

www.waytojannah.com

Contents

o দলীল-প্রমাণাদি

যে আলিমগণ বিসমিল্লাহ পড়া বাদ দিয়েছেন তাঁদের দলীল :

১. ইবন মুগাফ্‌ফালের (রা) হাদীস,

عن ابن عبد الله بن مغفل قال : كان أبونا اذا سمع أحدا منا يقول : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يقول : إهي إهي ، صليت خلف رسول الله ﷺ وأبى بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقول : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

"তিনি বলেন, একদা আমার পিতা সালাতে আমাকে : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তে শোনেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে বৎস! বিদ'আত পরিহার কর। কেননা, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম -এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, কাউকে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি।"[৫৪১]

২. ইমাম মালিক (রহ) আনাস ইবন মালিক (রহ) থেকে বর্ণনা করেন আনাস (রা) বলেছেন,

عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبى ﷺ وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون أول (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) . لا يذكرون بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : في أول قرءة ولا في آخرها .

"আমি আবূ বকর, উমর, উসমান (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাঁরা সালাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তেন না।"[৫৪২]

পক্ষান্তরে উপরোক্ত মতের বিরোধী হাদীসও এসেছে। যেমন,

১. নু'আইম ইবন মুজমির-এর হাদীস, তিনি বলেন,

عن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبى هريرة فقرأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : ثم قرأ بأم القرآن .

"আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ফাতিহা ও প্রত্যেক সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়েছেন।"[৫৪৩]

---

৫৪১. মুসনাদে আহমাদ ৫/৫৫।

৫৪২. মুসলিম ৩৯৯।

৫৪৩. নাসায়ী ৯০৫।

www.waytojannah.com

২. ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীস,

عن ابن عباس قال : كان النبى ﷺ يفتتح صلاته (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) ·

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' দিয়ে সালাত শুরু করতেন।"[৫৪৪]

৩. উম্মে সালামা (রা) হাদীস, তিনি বলেন :

عن أم سلمة أنها ذكرت أو كلمة غيرها : قراءة رسول اللّٰه ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يقطع قراءته آية ·

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে এভাবে পাঠ করতেন : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ·"[৫৪৫]

০ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপর্যুক্ত হাদীস ও আছারসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। হয়ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও কোথাও শিখানোর জন্য বড় করে পড়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ আমল ছিল বিসমিল্লাহ নিচু স্বরে পাঠ করা। তাই এখানে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আহমদের মতই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।[৫৪৬]

সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান

০ মাসআলাটির পূর্ণরূপ

নামাযে কিরাআত পড়া নামাযের একটি রুকন। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নামাযে কি সূরা ফাতিহাই পড়তে হবে নাকি অন্য যে কোন কিরাআত পড়লেও নামায হবে? এটাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

০ মতামতসমূহ

এ ব্যাপারে আলিমদের মতামত নিম্নরূপ

১. এক শ্রেণীর আলিমের মতে সূরা আল-ফাতিহা প্রত্যেক রাক'আতে পড়া

---

৫৪৪. তিরমিযী ২৪৫।

৫৪৫. আবূ দাউদ ৪০০১; মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০২।

৫৪৬ আল-ইস্তিযকার ৪/১৪৫, ১৮৯, ১৯৪; আশ-শারহুস সাগীর ১/৪২৯, ৪৩০; আল-মাজমূ' ৩/৩৬১; আল-মুগনী ২/১৫৬।

www.waytojannah.com

ফরয। এটি ইমাম শাফে'য়ী ও আহমদের মত। তাছাড়া এটি ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত।

২. ইমাম আবূ হানিফার মতে, কুরআনের যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করা হলো ফরয। তাঁর অনুসারীগণ সীমিত করে বলেছেন, ছোট তিন আয়াত কিংবা বড় কোন এক আয়াত। পক্ষান্তরে শেষ দু'রাকা'আতে ইমাম আবূ হানিফার মতে সানা পড়া উত্তম হবে। সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করা অথবা প্রকাশও বৈধ। তাদের নিকট সূরা আল-ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। এ বিধানটি হলো প্রথম দু'রাকা'আতে। এটিই ইমাম আবূ হানিফা থেকে প্রসিদ্ধ মত। তবে ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ-এর বর্ণনায় ইমাম আবূ হানিফার নিকটও প্রথম দু'রাকা'আতেই কিরাআত পড়া ফরয। এ বর্ণনাটি ইমাম ইবনুল হুমাম প্রাধান্য দিয়েছেন।[৫৪৭]

০ মতানৈক্যের কারণ ও দলীল-প্রমাণাদি

ক. এ বিষয়ে বর্ণিত আছারসমূহ পরস্পর বিরোধপূর্ণ।

খ. কিতাবুল্লাহ ও আছারের বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ হওয়া।

পরস্পর বিরোধী আছারসমূহ

১. আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস,

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي ﷺ فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اذكع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها .

এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। অতঃপর লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও, সালাত আদায় কর। তুমি সালাত আদায় করনি। লোকটি সালাত আদায় করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আবার সালাম দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় ফিরে যেতে আদেশ

৫৪৭. বাদায়েউস সানায়েউ ১/১১১;ফাতহুল কাদীর ১/৪৫২। তবে ইবন আবিদীন এ সব খণ্ডন করেছেন. শামী ১খ., পৃ. ৩৩৮, শরহে বেকায়া, পৃ. ১৭০।

www.waytojannah.com

দিলেন। লোকটি এভাবে তিনবার করল। অতঃপর বলল, ওই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে হক বাণীসহ প্রেরণ করেছেন, এর চেয়ে ভালো পন্থা আছে কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন পরিপূর্ণভাবে ওযু করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর তাকবীর দিবে, অতঃপর কুরআনের যে অংশটুকু তোমার কাছে সহজ মনে হয় তা তিলাওয়াত করবে, রুকূ দিবে এবং রুকূতে স্থির হবে। রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তুমি তোমার পুরো সালাত আদায় করবে।"[৫৪৮]

পক্ষান্তরে এর বিপরীতে আরো দুটি হাদীস বর্ণিত আছে।

ক. ওবাদা ইবন্ সামেত (রা)-এর হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

"যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করবে, তার সালাত হবে না।"[৫৪৯]

খ. আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج فهى خداج فهى خداج.

"যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ; তিনবার বলেছেন।"[৫৫০]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত প্রথম হাদীস বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআনের সহজ যে কোন অংশই পাঠ করা যথেষ্ট। আর ওবাদা (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর দ্বিতীয় হাদীস প্রমাণ করে যে সূরা ফাতিহা সালাতের শর্ত।

কিতাবুল্লাহ্ ও আছারের বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ হওয়া

আল্লাহ্র বাণী :

فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .

"তোমরা কুরআনের সহজ যে কোন অংশ তিলাওয়াত কর।"[৫৫১]

এ আয়াতটি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পূর্বে বর্ণিত হাদীসটির সহায়ক এবং অন্য হাদীসদ্বয়ের বিপরীত।

---

৫৪৮. বুখারী ৭৫৭; মুসলিম ৩৯৭।

৫৪৯. বুখারী ৭৫৬; মুসলিম ৩৯৪।

৫৫০. মুসলিম ৩৯৫; আবূ দাউদ ৮২১।

৫৫১. সূরা মুয্যাম্মিল, ২০।

www.waytojannah.com

০ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

এ মাসআলাটি প্রসিদ্ধ মাসআলা। এর উপর বহু কিতাব লেখা হয়েছে। তবে সূরা ফাতিহার ব্যাপারটি হাদীসে এমনভাবে এসেছে যে, এর গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তাই এ সূরা দিয়েই কিরাআত শুরু করতে হবে।

সালাতে কুরআনের শব্দ ছাড়া দো'আ করার বিধান

০ মাসআলাটির পূর্ণরূপ

নামাযে সাধারণত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে যা যা করতে ও বলতে বলা হয়েছে তা বলা হয়। কিন্তু যদি কেউ সিজদা অবস্থায় অথবা সর্বশেষ বৈঠকে যেখানে দো'আ করার নির্দেশ আছে সেখানে পবিত্র কুরআন বা রাসূল থেকে আসেনি এমন শব্দে দো'আ করে, তাহলে তার বিধান কি?

০ মতামতসমূহ

এ ব্যাপারে আলিমগণের মতামত নিম্নরূপ :

১. ইমাম আবূ হানিফা ও আহমদের মতে, কুরআনের শব্দ ছাড়া আর কিছু দিয়ে দো'আ করা জায়েয নেই।[৫৫২] তবে যদি অনুরূপ বর্ণনা হাদীসে এসে থাকে বা অনুরূপ হয়।[৫৫৩]

২. ইমাম মালিক ও শাফে'য়ীর মতে, জায়েয।[৫৫৪]

০ মতানৈক্যের কারণ

পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দো'আ করলে সেটা কি মানুষের কথা হিসেবে গণ্য হবে? এ প্রশ্নের উত্তরের উপর এ মতানৈক্য নির্ভরশীল।

০ দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম আবূ হানিফা ও আহমদের দলীল হচ্ছে,

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .

"নিশ্চয় এ সালাতসমূহে মানুষের কথার কোন কিছু বলা সমীচীন নয়। এতে কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত।"[৫৫৫]

---

৫৫২. আল-হিদায়া ফাতহুল কাদীর সহ ১/৩১৮, ৩১৯; আল-মুগনী ২/২৩৪।

৫৫৩. প্রাগুক্ত।

৫৫৪. আল-মাজমূ' ৩/৪৭১; আল-মুবদি' ১/৪৯৬।

৫৫৫. মুসলিম ৫৩৭।

www.waytojannah.com

২. মানুষের কথা দ্বারা কোন কিছু চাওয়া যেন সালামের অথবা হাঁচির জওয়াব দেয়া। সুতরাং যা নিষিদ্ধ তা সালাতে করা যাবে না।

৩. যে সমস্ত হাদীসে পছন্দনীয় দো'আ করতে বলা হয়েছে, তা দ্বারা মাছুর বা কুরআন বা হাদীসে প্রমাণিত দো'আ উদ্দেশ্য। সুতরাং ইচ্ছামত দো'আ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফে'য়ীর দলীল হচ্ছে,

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

أما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ·

"কিন্তু সাজদাহ্, তুমি তাতে দো'আতে আত্মনিয়োগ কর; কেননা তা তো তোমার দো'আ কবুল হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।"[৫৫৬]

২. অন্য হাদীসে এসেছে,

إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح فى السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به ·

"যখন তোমাদের কেউ শেষ বৈঠকে বসবে, তখন বলবে, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين এ দো'আ করলে আসমান ও যমীনের সমস্ত নেক বান্দা সে দো'আর অংশ পায়, তারপর বলবে, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله এরপর যে দো'আ তার কাছে ভাল লাগে সেটা পছন্দ করে তা দিয়ে দো'আ করবে।"[৫৫৭]

৩. অন্য হাদীসে এসেছে,

إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له ·

"যখন তোমাদের কেউ তাশাহ্হুদ পড়া শেষ করবে তখন চারটি বস্তু থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করবে, জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন-মৃত্যুর

---

৫৫৬ মুসলিম ৪৭৯।

৫৫৭. নাসায়ী ১৯৫১।

www.waytojannah.com

Contents

ফিতনা ও মাসীহ দাজ্জাল-এর ফিতনা হতে আশ্রয় চাইবে। তারপর নিজের জন্য যা তার মনে জাগে তা দিয়ে দো'আ করবে।"[৫৫৮]

৪. তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে অনেক দো'আ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام .

"হে আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদকে বাঁচাও, সালামাহ ইবন হিশামকে বাঁচাও... ।"[৫৫৯]

এসব এটাই প্রমাণ করে যে, নামাযে দো'আ করার ব্যাপারটি উন্মুক্ত।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

দলীল-প্রমাণদৃষ্টে মনে হয়, ফরয সালাতে যতদূর সম্ভব শুধু মাছুর দো'আই করতে হবে। পক্ষান্তরে নফল সালাতে যত বেশি সম্ভব সাজদা ও শেষ বৈঠকে মনের আকুতি দিয়ে দোআ করা জায়েয হবে। তবে মানুষের কথার মত দো'আ পরিত্যাগ করতে হবে।

সালাতে তাশাহ্হুদের বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

সালাতে দুবার তাশাহহুদ পড়তে হয়। এ তাশাহ্হুদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন। কিন্তু মূলত এগুলো পড়ার বিধান কি?

o মতামতসমূহ

সালাতে তাশাহ্হুদ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

১. ইমাম মালিক, এক মতে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ী এবং একদল আলিমের মতে, তাশাহ্হুদ ওয়াজিব নয়।[৫৬০]

২. আরেক শ্রেণীর আলিমের মতে, তাশাহ্হুদ ওয়াজিব। এটি এক বর্ণনা মতে ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আবূ হানিফা এবং ইমাম আহমদ ও দাউদের মাযহাব।[৫৬১]

---

৫৫৮. নাসায়ী ১৩১০।

৫৫৯. বুখারী ৮০৪; মুসলিম ৬৭৫।

৫৬০. আল-মাজমু' ৩/৪৫০; আল-মুগনী ২/২১৭; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ২/২১৭; আশ-শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২৭১।

৫৬১. আল-মুগনী ২/২১৭; আল-মাজমূ' ৩/৪৫০; ফাতহুল বারী ২/৩১০; নাইলুল আওতার ২/২৭১।

www.waytojannah.com

৩. তবে হানাফী মাযহাবের সঠিক মত হলো, প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহহুদ ওয়াজিব। তাঁরা প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা এবং দ্বিতীয় তাশাহহুদের জন্য বসার মধ্যে পার্থক্য করেন। প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা ওয়াজিব আর দ্বিতীয় তাশাহহুদের জন্য বসা ফরয।[৫৬২]

০ মতানৈক্যের কারণ

এক্ষেত্রে তাদের মতানৈক্যের কারণ হলো কিয়াস তথা যুক্তি এবং বর্ণিত আছারসমূহের বাহ্যিক বিধানের সাংঘর্ষিকতা। কিয়াসের দাবি হলো তাশাহ্হুদকে সালাতে ওয়াজিব নয় এমন সব যিকিরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া। কেননা, সালাতে কেবল কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর তাশাহ্হুদ তো কুরআনের অংশ নয় যে তা পড়া ওয়াজিব হবে।

অন্যদিকে ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীস ان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের ন্যায় তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন।"[৫৬৩] এ হাদীসটি কুরআনের ন্যায় তাশাহ্হুদ ওয়াজিব হওয়ার দাবি করে।

০ দলীল-প্রমাণাদি

যারা তাশাহহুদকে ওয়াজিব মনে করেন না তাদের দলীল হচ্ছে,

১. ইবন বুহাইনা বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

عن ابن بحينة ان النبى ﷺ صلى فقام فى الشفع الذى كان يريد أن يجلس فيه فمضى فى صلاته حتى إذا كان فى آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ٠

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের দু'রাকাতে বসার স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন, এভাবে তিনি তাঁর সালাত চালিয়ে গেলেন, তারপর নামাযের শেষে সালাম ফিরানোর আগে দু'টি সিজদা দিলেন, তারপর নামাযের সালাম ফিরালেন।"[৫৬৪]

---

৫৬২. আল-মাবসূত ২/১১১; বাদায়েউস সানায়ে' ১/১১৩, ১৬৩; হাশিয়া ইবনে আবেদীন ১/৪৯৬। কাসানী বলেন : আমাদের অধিকাংশ মাশায়েখ প্রথম বসাকে সুন্নাত বলে থাকেন, তা হয়তো এ জন্যে যে, এটা সুন্নাত দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে, অথবা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ মানেই ওয়াজিব নয় (বাদায়ে'উস সানায়েউ ১/১৬৩)।

৫৬৩. মুসলিম ৪০৩; আবু দাউদ ৯৭৪।

৫৬৪. নাসায়ী ১১৭৬; সহীহ ইবন হিব্বান ১৯৩৮।

www.waytojannah.com

অর্থাৎ যদি বাধ্যতামূলক হত তবে অবশ্যই তিনি বসার জন্য আবার ফিরে আসতেন।

পক্ষান্তরে যাঁরা তাশাহহুদকে ওয়াজিব বলেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে,

১. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

عن عبد الله قال : كنا لا ندرى ما نقول فى كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا ﷺ علم فواتح الخير وخواتمه فقال إذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله

"আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমরা দু'রাকা'আতের পরে কি বলতে হবে তা জানতাম না, তবে আমরা তাসবীহ, তাকবীর ও আমাদের রবের প্রশংসা করতাম। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কল্যাণের শুরু এবং শেষ জানিয়ে দিলেন এবং বললেন, যখন তোমরা প্রতি দু' রাকা'আতে বসবে তখন বলবে, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله . এর পর তোমরা যে দো'আ তোমাদের ভাল লাগে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সে দো'আ করবে।"[৫৬৫]

এখানে তাশাহহুদ পড়ার নির্দেশ তথা امر দেয়া হয়েছে, যা সাধারণভাবে ওয়াজিব প্রমাণ করে। সুতরাং তাশাহহুদ ওয়াজিব।

২- অনুরূপভাবে রিফা'আহ ইবন রাফে'-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন নামাযে ভুলকারী ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন,

فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك .

"তারপর যখন তুমি নামাযের মাঝখানে বসবে, তখন শান্তশিষ্টভাবে বসবে এবং বাম পা বিছিয়ে দিবে, তারপর তাশাহহুদ পড়বে, তারপর যখন দাঁড়াবে

৫৬৫. নাসায়ী ১১৬৩; মুসনাদে আহমাদ ১/৪৩৭।

www.waytojannah.com

তখন... ।"[৫৬৬] এখানেও তাশাহহুদ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।

৩. তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এ তাশাহহুদ পড়েছেন। সর্বদা তাশাহহুদ পড়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা ওয়াজিব।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। যা ভুলক্রমে বাদ দিলে সাজদা সাহু দিতে হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন বলে হাদীসে এসেছে।

সালাতের শেষে সালামের বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

সাধারণত সালাত শেষ হয় সালামের মাধ্যমেই। কিন্তু কোন কারণে যদি কেউ সালাম ফিরাতে পারলো না, তার আগেই ওযু নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে সালাতের বিধান কি? আর সালাতের শেষে সালাম ফিরানোর শর'য়ী মর্যাদাই বা কি?

o মতামতসমূহ

এ বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ক. অধিকাংশ ফকীহর মতে তা ফরয; বরং তা নামাযের একটি রুকন।[৫৬৭]

খ. আবূ হানিফা ও তাঁর অনুসারীদের মতে তা ফরয নয়।[৫৬৮] ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্ থেকে সালামের ব্যাপারে সঠিক বর্ণনা হচ্ছে, তিনি এটাকে ওয়াজিব মনে করেন, ফরয নয়।[৫৬৯] ব্যাপারটি অনেকটা ফরয এবং ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল।

যারা সালামকে ওয়াজিব করেছেন তাদের অধিকাংশের মতে, ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর উপর কেবল একবার সালাম দেওয়াই ওয়াজিব।[৫৭০] আবার

---

৫৬৬. আবূ দাউদ ৮৬০; তিরমিযী ৩০২; নাসায়ী ১৩১৩।

৫৬৭. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ পৃ. ৭৪; আশ-শারহুস সগীর ১/৪৩৫; আল-মাজমূ' ৩/৪৭৫, ৪৮১; আল-মুগনী ২/২৪০।

৫৬৮. অনুরূপভাবে এ কথাটি ইমাম আওযা'য়ী ও হাসান ইবন হাই ব্যতীত অধিকাংশ কুফাবাসী থেকেও বর্ণিত। আত-তামহীদ ১১/২০৮; আল-মাজমূ' ৩/৪৭৫; আল-মুগনী ২/২৪০।

৫৬৯. বাদায়ে'উস সানায়ে'উ ১/১৯৪; আল-হিদায়া, ফাতহুল কাদীর ও শারহুল ইনায়া সহ ১/৩২০-৩২২; আল-বাহরুর রায়িক ১/৩১১।

৫৭০. আল-মাজমূ' ৩/৪৮২, ৪৮৩; আল-মুগনী ২/২৪৩; বাদায়েউস সানায়ে'উ ১/১৯৫; আল-মুহাল্লা ৪/১৩০।

www.waytojannah.com

Contents

তাদের কারও কারও মতে, দু'বার সালাম দেওয়াই ওয়াজিব। আর তা ইমাম আহমদ (রহ)-এর মাযহাব।[৫৭১]

০ দলীল-প্রমাণাদি

জমহুর তথা অধিকাংশ আলিম তাঁদের মতের সপক্ষে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

১. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, وتحليلها التسليم "কেবল সালামই সালাতের কারণে গর্হিত কাজসমূহের বৈধতা দানকারী।"[৫৭২] তাঁরা উক্ত হাদীসের বাহ্যিক সালাম শব্দের দ্বারা দলীল প্রদান করেন। তাছাড়া হাদীসে শুধু সালামের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কতবার তা উল্লেখ করা হয়নি, তাই বাহ্যত একবারই ওয়াজিব।

২. যেসব আলিমের মতে দু'বার সালাম দেওয়া ওয়াজিব, তাদের দলীল হলো : انه كان يسلم تسليمتين

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'বার সালাম প্রদান করতেন।"[৫৭৩]

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর দলীল হল :

১. হাদীসে এসেছে,

عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة .

"আব্দুর রহমান ইবন যিয়াদ আল-আফ্রিকী বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান ইবন রাফে' ও বকর ইবন সাওয়াদাহ তার নিকট আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন ইমাম নামাযের শেষাংশে বসে সালামের পূর্বেই ওযু ভঙ্গ করে ফেলে, তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। আর যারা তার পিছনে আছে তারাও তাদের সালাত পূর্ণ করল।"[৫৭৪]

---

৫৭১. আত-তামহীদ ১১/২০৮; আল-ইস্তিযকার ৪/২৯৮; আল-মুহাল্লা ৪/১৩২; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ পৃ. ৭৪; আল-মাজমু' ৩/৪৮৩; আল-মুগনী ২/২৪৩; গায়াতুল মুন্তাহা ১/১৪৩; হাশিয়াতুর রাওদিল মুরবি' ২/১২৬।

৫৭২. আবূ দাউদ ৬১; তিরমিযী ৩; ইবন মাজাহ ২৭৫; মুসনাদে আহমাদ ১/১২৩।

৫৭৩. মুসলিম ৫৮১; দারা কুতনী ১/৩৭৫।

৫৭৪. আবূ দাউদ ৬১৭; তিরমিযী ৪০৮। তবে এর সনদ দুর্বল।

www.waytojannah.com

ইবন আবদুল বার বলেন, আলী (রা) থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসখানা মুহাদ্দিসগণের নিকট অধিকতর সুদৃঢ়। কেননা, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা)-এর হাদীসখানা কেবল আফ্রিকীই বর্ণনা করেছেন। আর মুহাদ্দিসগণের নিকটি তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ব্যক্তি নামাযে ভুল করেছিল তাকে সালামের দিকে দিকনির্দেশনা দেননি।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপরোক্ত মাসআলার দলীল-প্রমাণাদি বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নামায থেকে বের হওয়ার জন্য সালামের প্রয়োজন। তবে ফরয না হয়ে ওয়াজিব হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد .

"যখন তুমি তা বলবে, অথবা তা পূর্ণ করবে, তখনই তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন তুমি দাঁড়াতে ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে যাও, আর যদি বসতে ইচ্ছে কর, বসে থাক।"[৫৭৫]

সালাতে হাত উঠানোর বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

সালাতের প্রথমে এবং সালাতের মধ্যে প্রতিটি অবস্থান পরিবর্তনের সময় তাকবীর ও তাসমী' এর সময় হাত উঠানোর মাসআলাটি একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা।

o মতামতসমূহ

ক. অধিকাংশ ফকীহের মতে, সালাতে দু' হাত উঠানো সুন্নাত।[৫৭৬]

খ. দাউদ ও তাঁর অনুসারীদের মতে, দু'হাত উঠানো ফরয।[৫৭৭] তাঁরা আবার কয়েকটি মতে বিভক্ত :

---

৫৭৫. আবূ দাউদ ৯৭০; দারা কুতনী ১/৩৫২।

৫৭৬. ইবনুল মুনযির বলেন, এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত উঠাতেন। ইমাম নাওয়াবী বলেন, তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে এ উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আল-মাজমূ' ৩/৩০৫; আল-মুগনী ২/১৩৬; আল-ইনায়া হিদায়া সহ ১/২৮০।

৫৭৭. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৩৫। আল-ইস্তিযকার ৪/১০৭।

www.waytojannah.com

১. তাঁদের কারও কারও মতে, কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো ফরয।[৫৭৮]

২. অপর কারও কারও মতে, নামাযের শুরু ও রুকুর (অর্থাৎ রুকুতে যাওয়া ও তা থেকে মাথা উঠানোর) সময় হাত উঠানো ফরয।[৫৭৯]

৩. অন্য কারও কারও মতে, এ দু'স্থান সহ সিজদার সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় সাজদার সময় তা করা ফরয।[৫৮০]

o মতানৈক্যের কারণ

এখানে যে কারণে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটেছে, তা হচ্ছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নামায শিক্ষাদান সংক্রান্ত হাদীসখানা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের বিপরীত হওয়া।

তাছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূলী ইখতিলাফও এখানে কার্যকর ছিল। তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল বা ফে'ল কিসের প্রমাণবহ? এটা দ্বারা কি ফরয সাব্যস্ত হয়? হলে কখন হবে? এর জন্য কি তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সর্বদা করা প্রয়োজন?

o দলীল-প্রমাণাদি

যাঁরা ফরয বলেন, তাঁদের প্রমাণ হলো, ইবন উমর (রা) সহ অনেক সাহাবীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের প্রাক্কালে তাঁর দু'হাত মোবারক উপরে উঠাতেন। সুতরাং তাঁর আমল প্রমাণ করছে যে, সেটা করা বাধ্যতামূলক। সে হিসেবে তা ফরযই হবে।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, صلوا كما رأيتموني اصلي "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় কর।"[৫৮১] সুতরাং তিনি যেহেতু হাত উঠিয়েছেন প্রমাণিত সেহেতু তা ফরযই হবে।

পক্ষান্তরে যারা ফরয বলেননি তাদের প্রমাণ হলো, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৫৭৮. দাউদ আয যাহেরীর মতে, তাকবীরে তাহরিমার সময়ে হাত উঠানো ফরয এবং নামাযের রুকনের অন্তর্ভুক্ত। আল-ইস্তিযকার ৪/১০৩। সম্ভবত এ মতটি ইবনে হাযম আয-যাহেরীও গ্রহণ করেছেন আল-মুহাল্লা ৩/২৩৪। ইমাম নাওয়াবী শাফে'য়ী মাযহাবের প্রাচীন ইমাম আবুল হাসান আহমাদ ইবনে সাইয়ার আল-মারওয়াযী থেকেও অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন।

৫৭৯. আল-ইস্তিযকার ৪/১০৩।

৫৮০. পূর্বোক্ত ৪/১০৩।

৫৮১. বুখারী ৬৩১; সহীহ ইবন হিব্বান ১৬৫৮।

www.waytojannah.com

বলেছেন, وقالوا ابو هريرة قال النبى ﷺ استقبل القبلة وكبر "তুমি কিবলামুখী হও এবং তাকবীর বলো।"[৫৮২] এ হাদীসে তাকে দু'হাত উঠানোর নির্দেশ দেন নি।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যাবতীয় কর্ম বা ফে'লই ফরয প্রমাণ করে না। নতুবা নামাযের যত যিকর আছে সবগুলো ফরয হয়ে যেত। অথচ এমন দাবি কেউই করেনি।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

সুতরাং প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে, নামাযে হাত উঠানো সুন্নাত। ইমাম আবূ উমর ইবন আবদুল বার বলেন, আলিমদের মধ্যে যাঁরাই হাত উঠানোর পক্ষে মত দিয়েছেন এবং হাত উঠিয়েছেন তাঁরা কেউই একথা বলেননি যে, যারা হাত উঠায় না তাদের সালাত বাতিল হবে। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, মুহাদ্দিস হুমায়দী ও ইমাম দাউদ আয-যাহেরীর কিছু অনুসারী। ... তবে হুমায়দী ও তার মত আর যারা এ মত পোষণ করে তাদের এ কর্মকাণ্ড شذوذ বা অগ্রহণযোগ্য মত এবং ভুল পথ, এ দিকে দৃষ্টিপাতও করা যাবে না।[৫৮৩]

সালাতের বৈঠকে বসার নিয়ম

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

নিঃসন্দেহে দু'রাকা'আত পড়ে একবার বসতে হয়। কোন কোন সালাতে দু' বার বসতে হয়। এ বসার নিয়ম কি? উভয় বসার নিয়ম কি এক? এ বিষয়টি এখানকার আলোচ্য বিষয়।

o মতামতসমূহ

নামাযের বৈঠকে বসার নিয়ম সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে নিম্নোক্ত মতামত রয়েছেঃ

১. ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর অনুসারীদের মতে, ডান পায়ের পাতা দণ্ডায়মান রেখে বাম পায়ের পাতার উপর বসবে।[৫৮৪]

২. ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীদের মতে, নিতম্বদ্বয়কে যমিনের সাথে মিলিয়ে ডান পা-কে দাঁড় করিয়ে বাম পা-কে ছেড়ে দিবে। তাঁর মতে মহিলাদের বসাও পুরুষের ন্যায়।[৫৮৫]

---

৫৮২. বুখারী, বাবুত তাওয়াজ্জুহ নাহওয়াল কিবলাতি হাইসু কানা ও ৭৯৩, ৭৫৭, ৬২৫১, ৬২৫২; বায়হাকী ফিস সুনানিল কুবরা ২/১২৬ নং ২৫৯৭।

৫৮৩. আল-ইস্তিযকার ৪/১০৩।

৫৮৪. আল-হিদায়া, ফাতহুল কাদীরসহ ১/৩১২।

৫৮৫. আল-ইস্তিযকার ৪/২৬৪; হিলয়াতুল উলামা ২/১০৪; আল-মাজমু' ৩/৪৫০; আল-মুগনী ২/২২৫।

www.waytojannah.com

৩. ইমাম শাফে'য়ী ও আহমদ (রহ) মধ্যবর্তী ও শেষ বৈঠকের মাঝে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে মধ্যবর্তী বৈঠকে ইমাম আবূ হানিফা ও শেষ বৈঠকে ইমাম মালেকের নিয়ম অনুসারে বসবে।

৪. ইমাম তাবারীর মতে, এ সব পদ্ধতিই বৈধ। সালাত আদায়কারী ব্যক্তি এর যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারে।

o মতানৈক্যের কারণ

তাদের মতানৈক্যের কারণ হলো, এ বিষয়ে বর্ণিত 'আসার'সমূহ পরস্পর বিরোধপূর্ণ হওয়া। এক্ষেত্রে তিনখানা 'আসার' পাওয়া যায়।

o দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর দলীল হচ্ছে,

১. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর হাদীস,

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه قال : إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ·

"আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর বলেন, সালাতের সুন্নাত হচ্ছে বাম পা-এর উপর বসে ডান পা দণ্ডায়মান রাখা।"[৫৮৬]

২. ওয়ায়েল ইবন হুজর-এর হাদীস,

عن وائل بن حجر قال : أتيت رسول الله ﷺ فرأيته ... إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ·

"ওয়ায়েল ইবন হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসলাম। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম যে, তিনি যখন নামাযের দু'রাকা'আতের পর বসতেন, তখন তাঁর বাম পা শুইয়ে দিতেন এবং ডান পা দণ্ডায়মান রাখতেন।"[৫৮৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عن وائل بن حجر قال : أتيت المدينة فذكر الحديث وقال : وثنى رجله اليسرى ونصب اليمنى ·

৩. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস

عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ·

---

৫৮৬. নাসায়ী ১১৫৭।

৫৮৭. নাসায়ী ১১৫৯; ১২৬৩; সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৬৯০।

www.waytojannah.com

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ... তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে দিতেন।"[৫৮৮]

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ)-এর দলীল হচ্ছে,

عن ابن عمر قال : إن سنة الصلاة : ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى .

"আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সুন্নাত হচ্ছে, তুমি ডান পা দণ্ডায়মান রেখে বাম পা ভাঁজ করে রাখবে।"[৫৮৯]

এ হাদীসটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এর দ্বারা কোন কোন হানাফী মাযহাবের ইমাম তাদের মতের সপক্ষে দলীল নেয়ার চেষ্টা করেছেন।[৫৯০] কিন্তু ইমাম তাহাবীর এক বর্ণনা উপরোক্ত সম্ভাবনাকে নাকচ করে ইমাম মালিকের মতকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করে। সেখানে বলা হয়েছে,

اخرج الطحاوى فى شرح معانى الآثار عن يحى بن سعيد : أن القاسم بن محمد اراهم الجلوس فنصب اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه ثم قال : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وقال : إن اباه كان يفعل ذلك .

'ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ বলেন, কাসেম ইবন মুহাম্মাদ তাদেরকে বসার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর ডান পা দাঁড় করিয়ে দিলেন, বাম পা ভাঁজ করলেন এবং তার বাম নিতম্বের উপর বসলেন। তিনি তাঁর পায়ের উপর বসেন নি। এরপর তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমর আমাকে এভাবে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তাঁর পিতা এ রকমই করতেন।'[৫৯১]

আর ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমাদ (রহ)-এর দলীল হচ্ছে আবূ হুমাইদ আস-সা'য়েদীর হাদীস,

قال أبو حميد الساعدى أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا

---

৫৮৮. মুসলিম ৪৯৮; মুসনাদে আহমাদ ২/৩৯২।

৫৮৯. বুখারী ৮২৭।

৫৯০. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ১৫৩।

৫৯১. শারহু মা'আনিল আসার ১/২৫৭ নং ১৫৩৬।

www.waytojannah.com

قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته .

আবূ হুমাইদ আস-সা'য়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দ্বিতীয় রাকা'আতে বসতেন, তিনি তাঁর বাম পা মোবারকের উপর বসে ডান পা মোবারক দণ্ডায়মান রাখতেন। আর যখন শেষ রাকা'আতে বসতেন, তিনি তাঁর বাম পা মোবারক সামনে বাড়িয়ে ডান পা দণ্ডায়মান রেখে তাঁর নিতম্বের উপর বসতেন।"[৫৯২]

আর ইমাম তাবারী (রহ) এ সবগুলো হাদীস গ্রহণ করে বলেছেন, এ সব পদ্ধতিই বৈধ। কেননা, সবগুলোই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

ইমাম তাবারীর কথা এখানে খুবই যুক্তিযুক্ত যে, এ সব পদ্ধতির সবগুলিই বৈধ। তাই যে কোন পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য।

সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত রাখার স্থান ও তার বিধান

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত কোথায় রাখবে ও কিভাবে রাখবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে কি বর্ণিত হয়েছে এবং আমাদের কি করা দরকার, তা-ই এখানে আলোচিত হবে।

o মতামতসমূহ

সালাতে এক হাত অপর হাতের উপর রাখার বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

১. ইমাম মালিক (রহ) তা ফরয সালাতে অপছন্দ করেছেন, তবে নফল সালাতে বৈধ করেছেন।[৫৯৩]

২. এক শ্রেণীর আলিমের মতে তা সালাতের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। এটি জমহুর তথা অধিকাংশ আলিমের মত।[৫৯৪]

---

৫৯২. বুখারী ৮২৮।

৫৯৩. আল-ইস্তিযকার ৬/১৯৫; আত-তামহীদ ২০/৭৫; আল-মাজমূ' ৩/৩১১; আল-মুগনী ২/১৪০; আল-ইনসাফ ৩/৪২৩।

৫৯৪. আল-ইস্তিযকার ৬/১৯৬; আল-মাজমূ' ৩/৩১১; আল-মুগনী ২/১৪০।

www.waytojannah.com

৩. অন্য এক শ্রেণীর আলিমের মতে, হাত বাঁধা বা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি ইচ্ছাধীন। এটি ইমাম আওযা'য়ীর মত।[৫৯৫]

o মতানৈক্যের কারণ

এ বিষয়ে মতানৈক্যের কারণ হলো আছারসমূহ পরস্পর বিরোধপূর্ণ হওয়া।

o দলীল-প্রমাণাদি

যারা ফরয সালাতে এটাকে মাকরূহ বলেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত বর্ণনা সংক্রান্ত আছারসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান হাত বাম হাতের উপর বাঁধার কথা বর্ণিত হয়নি।[৫৯৬]

আর যাঁরা এটিকে সুন্নাত বলেন, তাঁদের দলীল হলো,

১. বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, উক্ত বিষয়ে লোকদেরকে আদেশ দেয়া হত। যেমন,

عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة قال ابو حازم لا كلمه إلا ينمى ذلك إلى النبى ﷺ .

"আবূ হাযেম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মানুষদেরকে সালাতে ডান হাতকে বাম কব্জির উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হতে।" আবূ হাযেম বলেন, সাহল ইবন সা'দ নির্দেশের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বলেই আমি জানি।[৫৯৭]

২. তাছাড়া ডান হাত বাঁধার বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের বর্ণনায় এসেছে। বলা হয়েছে,

عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال : كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه .

"কাবীসা ইবন হুলব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি তাঁর বাম হাতকে ডান হাত দ্বারা ধরতেন।"[৫৯৮]

---

৫৯৫. আল-ইস্তিযকার ৬/১৯৬; আত-তামহীদ ২০/৭৫।

৫৯৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১২০।

৫৯৭. বুখারী ৭৪০; মুসনাদে আহমদ ৫/৩৩৬; মুয়াত্তা ৩৭৬।

৫৯৮. তিরমিযী ২৫২।

www.waytojannah.com

৩. অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عن طاوس قال : كان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو فى الصلاة .

"তাউস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতে থাকতেন, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন, তারপর এ দুটোকে বুকের উপর রাখতেন।"[৫৯৯]

৪. ওয়ায়েল ইবন হুজর-এর হাদীসে এসেছে,

عن وائل قال : رأيت رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على اليسرى فى الصلاة قريبا من الرسغ .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন, কব্জির নিকটে।"[৬০০]

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا فى صلاتنا .

"ইবন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা নবী সম্প্রদায়, আমাদেরকে আমাদের সাহরী দেরী করতে, ইফতার তাড়াতাড়ি করতে এবং আমাদের সালাতে ডান হাতকে বাম হাত দ্বারা ধরতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।"[৬০১]

৫. অনুরূপভাবে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن ابن مسعود : انه كان يصلى وضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبى ﷺ فوضع يده اليمنى على اليسرى .

"ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি বাম হাত ডান হাতের উপর রেখে সালাত আদায় করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।"[৬০২]

৬. অন্য সাহাবী বলেন,

عن غضيف بن الحارث أو الحارث بن غضيف قال : ما نسيت من الأشياء ما نسيت إنى رأيت رسول الله ﷺ واضعا يمينه على شماله فى الصلاة .

---

৫৯৯. আবূ দাউদ ৭৫৯।

৬০০. মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৮।

৬০১. সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/৬৮ নং ১৭৭০।

৬০২. আবূ দাউদ ৭৫৫।

www.waytojannah.com

Contents

"গুদাইফ ইবন হারেস অথবা হারেস ইবন গুদাইফ বলেন, যে সমস্ত জিনিস আমি ভুলিনি তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতে দেখেছি।"[৬০৩]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপর্যুক্ত মতামত বিচার করলে এটাই স্পষ্ট ভাষায় প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখাই সুন্নাত। আর এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

একাকী সালাত আদায়ের পরে জামাত হলে একাকী সালাত আদায়কারী কি করবে?

o মাসআলাটির পূর্ণরূপ

কেউ একাকী নামায শেষ করল, এমন সময় দেখল যে, জামাতের সাথে নামায হচ্ছে, তখন সে কি আবার নামাযে শরীক হবে? নাকি হবে না। এটাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

o মতামতসমূহ

এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে নিম্নোক্ত মতভেদ হয়েছে :

১. এক শ্রেণীর আলিম বলেন, জামা'আতের সাথে পুনরায় সব সালাতই আদায় করে নিবে; তবে মাগরিবের সালাত ব্যতীত। এটি ইমাম মালিক (রহ) ও তাঁর অনুসারী এবং ইমাম আহমদ (রহ)-এর মত।[৬০৪]

২. ইমাম আবূ হানিফার মতে মাগরিব, আসর ও ফজর ব্যতীত অন্য সব সালাতই পুনরায় আদায় করবে।[৬০৫]

৩. ইমাম আওযা'য়ীর মতে, আসর ও ফজর ব্যতীত বাকি সব সালাতই পুনরায় আদায় করবে।[৬০৬]

৪. ইমাম আবূ সাওরের মতে, আসর ও ফজর ব্যতীত বাকি সব সালাত আদায় করবে।[৬০৭]

---

৬০৩. মুসনাদে আহমদ ৪/১০৫।

৬০৪. আল-মুদাওয়ানাহ ১/৮৭; আল-ইস্তিযকার ৫/৩৫৯, ৩৬১; আল-আওসাত ২/৪০৪; শারহুস সুন্নাহ ৩/৪৩১; হাশিয়াতুদ দাসূকী ১/৩২০; আশ-শারহুস সগীর ১/৫৮৩; মাওয়াহিবুল জালীল ২/৮৩; আল-ইনসাফ, শারহুল কাবীরসহ ৪/২৮০-২৮২; গায়াতুল মুন্তাহা ১/১৮২; আল-মাজমূ ৪/২২৫।

৬০৫. আল-মাবসূত ১/১৫২; আল-হিদায়া, ফাতহুল কাদীরসহ ১/৪৭৩; হাশিয়া ইবনে আবেদীন ২/৫২; আল-আওসাত ২/৪০৪; শারহুস সুন্নাহ ৩/৪৩১; আল-মাজমূ' ৪/২২৫।

৬০৬. আল-ইস্তিযকার ৫/৩৬১; আল-আওসাত ২/৪০২, ৪০৪; শারহু মা'আনিল আসার ১/৩৬৫; শারহুস সুন্নাহ ৩/৪৩১; আল-মাজমূ' ৪/২২৫।

৬০৭. আল-আওসাত ২/৪০৪।

www.waytojannah.com

৫. ইমাম শাফে'য়ী (রহ)-এর মতে, সব সালাতই পুনরায় জামা'আতের সাথে আদায় করবে।[৬০৮]

মোটকথা, সামষ্টিকভাবে সব আলিমই একমত যে, পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। কেননা বুসর ইবন মিহজান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

عن محجن أنه كان فى مجلس مع رسول الله ﷺ فأذن بالصلاة فقام رسول الله ﷺ ثم رجع محجن فى مجلسه فقال له رسول الله ﷺ ما منعك ان تصلى ألست برجل مسلم قال بلى ولكنى كنت قد صليت فى أهلى فقال له رسول الله ﷺ إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت .

মিহজান বলেন, একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত না আদায় করায় তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার কী হল ? তুমি লোকদের সাথে সালাত আদায় করনি! তুমি কি মুসলিম লোক নও?!" উত্তরে তিনি বলেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তবে আমি আমার পরিবারে সালাতে আদায় করে এসেছি (ফলে আপনার সাথে জামা'আতে শরীক হইনি)। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন তুমি মসজিদে আসবে, তখন তুমি সালাত আদায় করে নেবে, যদিও ইতোপূর্বে তুমি সালাত আদায় করে থাক।"[৬০৯]

০ মতানৈক্যের কারণ

মূলত পুনঃ সালাত আদায় করার বিধান সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাপকতা কিয়াস কিংবা অন্য কোন দলীলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করার সম্ভাবনার কারণে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন।

০ দলীল-প্রমাণাদি

যেসব আলিম 'নস'টিকে তার ব্যাপকতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁরা সব সালাতই পুনঃ আদায় করা জরুরী মনে করেছেন। এটি ইমাম শাফে'য়ীর মাযহাব।

আর যেসব আলিম পুনঃ আদায় করার বিধান থেকে মাগরিবের সালাতকে পৃথক করেছেন তারা উক্ত বিধান থেকে কিয়াসের মাধ্যমে মাগরিব সালাতকে পৃথক করেছেন। তা এভাবে যে, মাগরিবের সালাত হলো বেজোড়, যদি তা পুনরায় আদায় করা হয়,

---

৬০৮. আল-আওসাত ২/৪০১-৪০৪; আল-ইস্তিযকার ৫/৩৬১; শারহুস সুন্নাহ ৩/৪৩১; আল-মাজমু' ৪/২২৫।

৬০৯. নাসায়ী ৮৫৭; মুসনাদে আহমদ ৪/৩৪; আল-মুয়াত্তা ২৯৬।

www.waytojannah.com

তবে তা জোড় সালাতের সদৃশ হয়ে যায়। কেননা, তিন রাকা'আতকে পুনরায় আদায় করলে ছয় রাকা'আত হয়ে যায়। ফলে মাগরিবের সালাতের মৌলিকতা পরিবর্তিত হয়। আর তা বাতিল।

ইমাম আবূ হানিফার মতে, দ্বিতীয় সালাতটি হলো তার জন্য নফল স্বরূপ। যদি ফজর ও আসর সালাতকে পুনরায় আদায় করে তাহলে ফজর ও আসর সালাতের পর নফল আদায় করা হলো, আর তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, হাদীসে এসেছে,

قال رسول الله ﷺ لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .

"আসরের সালাতের পরে সূর্য ডুবা পর্যন্ত কোন সালাত নেই। আর ফজরের পরে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই।"[৬১০]

এর মাধ্যমে তিনি ফজর ও আসরের সালাতকে বিশেষায়িত করেছেন।

মাগরিবের সালাতকে এভাবে পুনঃ আদায়ের বিধান থেকে পৃথক করেছেন যে, মাগরিবের সালাত হলো বেজোড়। আর বেজোড় সালাত পুনরায় আদায় করা যায় না। করলে রাতে দু'বার বিতর আদায় করার পর্যায়ে পড়ে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا وتران في ليلة "এক রাত্রিতে দুই বিতর নেই।"[৬১১]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

عن النبي ﷺ قال : من صلى وحده ثم أدرك الجماعة أعاد إلا الفجر والعصر .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে একাকী সালাত আদায় করবে, তারপর জামা'আত পাবে সে যেন তা পুনরায় পড়ে, তবে ফজর ও আসর ব্যতীত।"[৬১২]

তাছাড়া এ ব্যাপারে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন :

قال : إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب ... فإنهما لا تصليان مرتين .

"যখন তুমি তোমার পরিবারে সালাত আদায় করবে, তারপর মসজিদে ইমামের সাথে সালাত পাবে তখন তাদের সাথে সালাত আদায় করবে। তবে ফজর ও

৬১০. মুসলিম ৮২৭।

৬১১. মুসনাদে আহমাদ ৪/২২; আবূ দাউদ ১৪৩৯; তিরমিযী ৪৬৮; নাসায়ী ৩/২২৯; ইবন খুযাইমাহ ১১০১; ইবনে হিব্বান ৬৭১।

৬১২. দারা কুতনী, আল-'ইলাল ১২/৩১২; আবদুর রায্‌যাক ২/৪২২; নং ৩৯৩৯; মুয়াত্তা ১/১১৭; শারহু মা'আনিল আসার ১/৩৬৫।

মাগরিব ব্যতীত... কেননা এগুলো দু'বার পড়া যায় না।"[৬১৩]

পক্ষান্তরে যেসব আলিম ফজর ও আসরের সালাতের মধ্যে পৃথক করেছেন, তাদের দলীল হল ফজর সালাতের পর সালাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সব আছার স্বীকৃত। আর আসরের সালাতের পর সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আছারসমূহ বিভিন্ন ধরনের।[৬১৪] এটি ইমাম আওযা'য়ীর মত।

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

এখানে মূল মতভেদটি উসূলে ফিকহ ভিত্তিক। প্রথমত, কিছু হাদীসে এসেছে, ফজর ও যোহরের পরে কোন সালাত নেই। আবার এ হাদীসে এসেছে যে, যে কোন সালাতই জামাতবিহীন পড়া হবে, জামাতের সাথে তা পাওয়া গেলে পুনরায় পড়তে হবে। এ দু'ধরনের হাদীসই عموم। এ হিসেবে تعارض العمومين হিসেবে এখানে এক ধরনের توفيق দেয়া দরকার। যদি حاظر কে مبيح এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়, তবে ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্-এর মাযহাব অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর যদি দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসকে প্রথম প্রকারের হাদীস থেকে تخصيص করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে ইমাম শাফে'য়ীর মতামত প্রাধান্য পাবে।

ইমামকে লোকমা দেয়ার বিধান

লোকমা দেয়া অর্থ, ইমাম যদি কেরাআত পড়তে গিয়ে আটকে যায়, কিংবা ভুল করে তবে কি মুক্তাদীগণের কেউ তাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে?

o মতামতসমূহ

১. ইমাম মালিক, শাফে'য়ীসহ অধিকাংশ ফকীহর মতে, ইমামকে লোকমা দেওয়া জায়েয।[৬১৫]

২. কুফাবাসীগণ তা থেকে নিষেধ করেছেন।[৬১৬]

৩. ইমাম ইবন হাযমের মতে, শুধু সূরা আল-ফাতিহায় আটকে গেলে তাকে তা বলে দিতে হবে। নতুবা নয়।[৬১৭]

o মতানৈক্যের কারণ

এ বিষয়ে বর্ণিত আছারসমূহের পরস্পর বিরোধী হওয়া।

---

৬১৩. আল-আওসাত ৩/৪৩০; আল-মুহাল্লা ২/২৬৪।

৬১৪. কারণ, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাতের পর ঘরে এসে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। বুখারী ৫৯২; মুসলিম ৩০০।

৬১৫. আল-ইস্তিযকার ৪/১৭২; আল-মুগনী ২/৪৫৪; আশ-শাওকানী, আস-সাইলুল জাররার ১/২৪২।

৬১৬ আল-মাবসূত ১/১৯৪, ১৯৫; হাশিয়া ইবন আবেদীন ১/৬২২; আল-ইস্তিযকার ৪/১৭২।

৬১৭. আল-মুহাল্লা ৪/৩।

www.waytojannah.com

o দলীল-প্রমাণাদি

যারা নামাযে লোকমা দেয়া জায়েয মনে করে তাদের দলীল হচ্ছে,

১. আব্দুল্লাহ ইবন উমর বর্ণিত হাদীস,

عن عبد الله بن عمر أن النبى ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فبس عليه فلما انصرف قال لأبىّ أصليت معنا ؟ قال نعم قال فما منعك ؟

"আবদুল্লাহ ইবন উমর বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক নামায পড়ছিলেন, কিন্তু কোন এক আয়াতে দ্বিধায় পড়ে যান, সালাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'উবাই! তুমি কি আমাদের সাথে সালাত আদায় করনি?' তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তোমাকে কে নিষেধ করল?"[৬১৮] অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই কর্তৃক লোকমা দেওয়া চাচ্ছিলেন।

২. অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عن المسور بن يزيد المالكى قال : شهدت رسول الله ﷺ يقرأ فى الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله ﷺ هلا أذكرتنيها قال كنت أراها نسخت .

"মুসাওয়ার ইবন ইয়াযীদ আল-মালিকী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযে কিরাআত পড়তে দেখলাম। অতঃপর তিনি কিছু অংশ ছেড়ে দিলেন, পড়লেন না। নামাযের পরে তাঁকে এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে না কেন?" লোকটি বলল, আমি মনে করেছিলাম সেটা বুঝি রহিত হয়ে গেছে।"[৬১৯]

৩. অন্য বর্ণনায় এসেছে,

من السنة أن تفتح على الإمام .

"ইমামকে লোকমা দেয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।"[৬২০]

৪. আরও এসেছে,

إذا استطعمكم الإمام فأطعموه .

"যখন ইমামকে লোকমা দেয়ার প্রয়োজন হয়, তখন তাকে লোকমা দিবে।"[৬২১]

---

৬১৮. আবূ দাউদ ৯০৭; বাইহাকী ২/২১২।

৬১৯. আবূ দাউদ ৯০৭।

৬২০. বায়হাকী ৩/২১৩।

৬২১. ইবন আবী শায়বাহ ১/৪১৭; দারা কুতনী ১/৪০০; আল-মুগনী ২/৪৫৫।

www.waytojannah.com

পক্ষান্তরে যারা লোকমা দেয়া বৈধ মনে করেন না, তাদের দলীল হচ্ছে,

قال رسول الله ﷺ يا على لا تفتح على الإمام فى الصلاة ·

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আলী! তুমি ইমামকে লোকমা দিও না।"[৬২২]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

মূলত এ বিষয়ে প্রথম শতাব্দীতে মতবিরোধ ছিল। তা নিষেধ হওয়ার বিধানটি আলী (রা) আর বৈধ হওয়ার বিধানটি ইবন উমর (রা) থেকে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিভিন্ন হাদীসদৃষ্টে বোঝা যায় যে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে লোকমা দেয়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে যেন তা করা না হয়।

ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

ইমাম ও মুক্তাদী একই সমান ভূমিতে দাঁড়াবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইমাম কি ইচ্ছে করলে উঁচুতে দাঁড়াতে পারবে? পারলে কতটুকু উঁচুতে?

o মতামতসমূহ

উপরোক্ত বিষয়ে তিনটি মত প্রসিদ্ধ

১. ইমাম শাফে'য়ীর মতে, মুক্তাদী থেকে উঁচু স্থানে ইমামের দাঁড়ানো জায়েয, যদি তা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

২. ইমাম আবূ হানিফার মতে, তা বৈধ নয়।

৩. ইমাম মালিক ও আহমদের মতে, সামান্য উঁচুতে দাঁড়ানো বৈধ।

o মতানৈক্যের কারণ

এ বিষয়ে মতানৈক্যের কারণ হলো বাহ্যত পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীস।

o দলীল-প্রমাণাদি

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ্‌র মতের পক্ষে দলীল হচ্ছে,

عن سهل بن سعد قال : رأيت رسول الله ﷺ صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد فى أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال "أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتى" ·

"সাহল ইবন সা'দ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর ইমামতি করেছেন। তিনি মিম্বরের উপর তাকবীর দিলেন। তারপর মিম্বরের উপর

৬২২. আবূ দাউদ ৯০৮। দুর্বল সনদে।

www.waytojannah.com

রুকু করলেন। তারপর পিছনে নেমে এসে মিম্বরের গোড়ায় সিজদা করলেন। তারপর আবার মিম্বরের উপর ফিরে গেলেন। তারপর যখন তিনি তাঁর নামায শেষ করলেন, তখন সাহাবীদের দিকে মুখ করে বললেন : "হে লোকসকল! আমি এটা করেছি, যাতে তোমরা আমার অনুকরণ কর এবং আমার সালাত শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।"[৬২৩]

পক্ষান্তরে যারা নিষেধ করেন তাদের পক্ষে দলীল হচ্ছে,

إن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني .

"একদা হুযায়ফা (রা) কোন এক দোকানের উপর দাঁড়িয়ে ইমামতি করছিলেন। আবূ মাসউদ (রা) তার কাপড় ধরে টেনে নিলেন। অতঃপর সালাত শেষ করার পর তিনি তাকে বললেন, 'তোমার কী জানা নেই তা থেকে লোকদেরকে নিষেধ করা হতো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন আমাকে তুমি টান দিয়েছ তখন আমার মনে পড়েছে।"[৬২৪]

তাছাড়া, ইমাম যদি উঁচু স্থানে দাঁড়ায়, তবে মুক্তাদীগণ তাকে দেখার জন্য উপরের দিকে তাকাতে হবে, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকাতে বিভিন্ন হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।[৬২৫]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

উপরোক্ত হাদীস দু'টির মধ্যে সমন্বয় করা যায়। প্রথমোক্ত হাদীসটি শিখানোর জন্য হয়েছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসটি শিখানোর জন্য ছিল বলে প্রমাণিত হয়নি। তাই যদি শিখানোর জন্য হয় এবং সামান্য উঁচুতে হয় তবে অবশ্যই জায়েয হবে। তবে মনে রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই অহংকারবশত বা নিজেকে বড় মনে করে ইমাম সাহেবের জন্য উঁচু স্থানে অবস্থান করে ইমামতি করা জায়েয নয়। তাছাড়া কোন অবস্থাতেই এটাকে সাধারণ নিয়ম মনে করা যাবে না যে, ইমামের স্থান উঁচু করে নিতে হবে বা তিনি সর্বদা উঁচু জায়গায় দাঁড়াবেন এটাও ঠিক নয়।

কাতারের পিছনে এক কাতারে একজন দাঁড়ানোর বিধান

কোন লোক মসজিদে এসে কাতারের পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। এখানে দু'টি অবস্থা

৬২৩. বুখারী ৯১৭; মুসলিম ৫৪৪।

৬২৪. আবূ দাউদ ৫৯৭; মুস্তাদরাকে হাকিম ১/২১০; আল-বায়হাকী ৩/১০৮।

৬২৫. আল-মুগনী ৩/৪৮।

www.waytojannah.com

থাকতে পারে। এক. আগের কাতারে কোন জায়গা খালি নেই। দুই. আগের কাতা জায়গা থাকা সত্ত্বেও একাই কাতারের পিছনে দাঁড়িয়ে ইমামের নামাযের সাথে ইক্তে করল। এমতাবস্থায় তার নামাযের হুকুম কি?

o মতামতসমূহ

আলিমগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন :

১. অধিকাংশ আলিমের মতে তার সালাত হয়ে যাবে, তবে সেটা মাকরূহ।[৬২৬]

২. ইমাম আহমদ, আবূ সাওরসহ এক শ্রেণীর আলিমের মতে, তার সালাত ফাসেদ হয়ে যাবে।[৬২৭]

o মতানৈক্যের কারণ

১. বিভিন্ন হাদীস থেকে বিভিন্নমুখী বুঝ

২. সাহাবী ওয়াবেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য সম্পর্কে মতভেদ।

o দলীল-প্রমাণাদি

যাঁরা বলেন সালাত ফাসেদ হয়ে যাবে, তাদের দলীল হচ্ছে,

عن على بن شيبان قال صليت خلف رسول الله ﷺ فانصرف فرأى رجلا يصلى فردا خلف الصف فوقف نبى الله ﷺ حتى اذ صرف الرجل من صلاته فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف .

"আলী ইবন শায়বান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। নামায থেকে তিনি মুখ ফিরানোর পর এক লোককে কাতারের পিছনে নামায পড়তে দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা করলেন। লোকটি তার নামায শেষ করে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার নামায পুনরায় আদায় কর; কেননা কাতারের পিছনে একাকী ব্যক্তির কোন নামায নেই।"[৬২৮]

তাছাড়া, অন্য হাদীসে ওয়াবেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

ان رجلا صلى خلف الصف وحده ... فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الصلاة .

---

৬২৬. হিলইয়াতুল উলামা ২/১৮১; আল-বাদায়ে'উ ১/১৪৬; ফাতহুল কাদীর ১/৩৫৭; আল-মুদাওয়ানাহ ১/১০৬; হাশিয়াতুদ দাসূকী ১/৩৩৪; আল-মাজমূ'৪/২৯৮; আল-মুগনী ৩/৪৯; আল-ইখতিয়ারাত পৃ. ৭০।

৬২৭ আল-ইস্তিযকার ৬/১৫৪; আল-মুহাল্লা ৪/৫২; হিলইয়াতুল উলামা ২/১৮১; আল-মুগনী ৩/৪৯; আল-মাজমূ' ৪/২৯৮; যাদুল মুস্তাকনি' মা'আস সালসাবীল ১/১৬৭।

৬২৮. মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩; ইবনে মাজাহ ১০০৩; শারহু মা'আনিল আসার ১/৩৯৪; ইবন খুযাইমাহ ১৫৬৯; ইবন হিব্বান ২২০২,২২০৩।

www.waytojannah.com

"এক লোক কাতারের পিছনে একাকী নামায আদায় করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিলেন।"[৬২৯]

পক্ষান্তরে, যারা কাতারের পিছনে একাকী নামাযকে মাকরূহসহ জায়েয বলেছেন তাদের দলীল হচ্ছে,

عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى ﷺ فقال "زادك الله حرصا ولا تعد".

"আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু অবস্থায় ছিলেন। ফলে তিনি কাতারে শামিল হওয়ার আগেই নামাযে যোগ দিয়ে রুকু করে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি তা জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "আল্লাহ তোমার (কল্যাণের প্রতি) আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়ে দিন, তবে আর দ্বিতীয়বার করো না।"[৬৩০]

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সালাত শুদ্ধ হয়েছে। যদি তা-ই হয়, তবে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, মাকরূহ হওয়া।

ফায়েদা : এ হাদীসে বর্ণিত, ولا تعد শব্দটিকে কয়েকভাবে পড়া যায়। আর তাতে অর্থের ক্ষেত্রেও হেরফের হয়। প্রসিদ্ধ পড়া হচ্ছে, ولا تَعُد অর্থাৎ আর দ্বিতীয়বার করো না। কেউ কেউ পড়েছেন, ولا تُعِد অর্থাৎ এটা গণনা করো না। আবার কেউ কেউ পড়েছেন ولا تعد অর্থাৎ আর কখনো দৌড়ে আসবে না।

০ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, বিনা ওযরে কেউ একা কাতারে দাঁড়ালে তার সালাত না হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য স্পষ্ট। কিন্তু যদি কারও ওযর থাকে, তবে তার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। বিশেষ করে যদি আগের কাতার সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সে আসে এবং কাউকে তার সাথে না পায়, তবে সে একাকী দাঁড়াতেও পারে। কারণ, তার পক্ষে অন্যজনকে আগের কাতার থেকে টেনে আনার ব্যাপারে কোন কোন ফকীহ মত প্রদান করলেও যাকে আগের কাতার থেকে টেনে আনা হয়েছে, তার আগের কাতারের সওয়াব থেকে মাহরূম হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

৬২৯. তিরমিযী ২৩০; মুসনাদে আহমাদ ৪/২২৭-২২৮; আবূ দাউদ ৬৮২; ইবন মাজাহ ১০০৪।

৬৩০. বুখারী ৭৮৩; আবূ দাউদ ৬৮৩।

www.waytojannah.com

Contents

আর তার নামাযের মধ্যে টানা-হেচড়া করা অপরের জন্য উচিত নয়। তাই যে পরে আসবে সে এমতাবস্থায় একাকী দাঁড়ানোতে কোন সমস্যা নেই।[৬৩১]

বসে সালাত আদায়কারী ইমামের পিছনে মুক্তাদি সালাত বসে পড়বে না দাঁড়িয়ে?

ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সুস্থ ব্যক্তির জন্য ইমাম কিংবা একাকী ফরয সালাত বসে আদায় করা বৈধ নয়, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ অর্থাৎ, "তোমরা অনুগত হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াও।"[৬৩২] তবে যদি মুক্তাদি সুস্থ হয় আর সালাত বসে আদায়কারী কোন অসুস্থ ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, তবে এ ক্ষেত্রে আলিমদের কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়।

o মতামতসমূহ

১. মুক্তাদি উক্ত ইমামের পিছনে বসে সালাত আদায় করবে। তা ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মত।[৬৩৩]

২. মুক্তাদি উক্ত ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। এটি ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারী, ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর অনুসারী ও আবূ সাওরের মাযহাব।[৬৩৪]

৩. মালিকী মাযহাবের ইবন কাসেমের মতে, বসা ইমামের ইমামতি জায়েয নয়। তার পিছনে যদি বসে অথবা দাঁড়িয়ে এক্তেদা করা হয়, তবে সকল মুক্তাদীর সালাত বাতিল হয়ে যাবে।[৬৩৫] এটি হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসানেরও একটি মত।

৪. ইমাম মালিক (রহ)-এর এক বর্ণনানুসারে, তারা সালাতের সময় থাকলে সালাত পুনরায় আদায় করে নেবে।[৬৩৬] তবে প্রথম বর্ণনাটিই তার প্রসিদ্ধ বর্ণনা।

---

৬৩১. শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৩৯৬।

৬৩২. সূরা আল-বাকারা, ২৩৮।

৬৩৩. আত-তামহীদ ৬/১৩৯, ২২/৩১৮; আল-ইস্তিযকার ৫/৩৯০, ৪০০; হিলইয়াতুল উলামা ২/১৭৩, আশ-শারহুল কাবীর, আল-ইনসাফসহ ৪/৩৭৬; আল-মাজমূ' ৪/২৬৫; আল-মুহাল্লা ৩/৫৯।

৬৩৪. আত-তামহীদ ৬/১৩৯, ২২/৩১৮; আল-ইস্তিযকার ৫/৩৯১; হিলইয়াতুল উলামা ২/১৭৩, ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৮; আল-মাজমূ' ৪/২৬৫; আশ-শারহুল কাবীর, আল-ইনসাফসহ ৪/৩৭৭।

৬৩৫. আল-মুদাওয়ানাহ ১/৮১; আত-তামহীদ ৬/১৪২, ২২/৩১৯, আল-ইস্তিযকার ৫/৩৯১, ৪০১; হিলইয়াতুল উলামা ২/১৭৩; ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৮; আল-মাজমূ' ৪/২৬৫; আশ-শারহুল কাবীর, আল-ইনসাফসহ ৪/৩৭৬।

৬৩৬. আল-ইস্তিযকার ৫/৪০১; আত-তামহীদ ৬/১৪২, ২২/৩১৯; আল-মাজমূ' ৪/২৬৫।

www.waytojannah.com

o মতানৈক্যের কারণ

ক. এ বিষয়ে বর্ণিত আছারসমূহ পরস্পর বিপরীত হওয়া।

খ. আহলে মদীনার আমল আছারের বিপরীত হওয়া।

o দলীল-প্রমাণাদি

যাঁরা বলেন যে, মুক্তাদী উক্ত ইমামের পিছনে বসে সালাত আদায় করবে, তাঁদের দলীল হচ্ছে,

عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ سقط عن فرسه فجحشت ساقهُ أو كتفه فأتاه أصحابه يعودونه فصلّى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنـما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كَبَّرَ فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائـما فصلوا قياما .

"আনাস (রা)-এর থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। ... সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি তখন তাদের নিয়ে বসে নামায পড়লেন। আর তারা দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। যখন সালাম ফিরালেন, তখন তিনি বললেন, "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য, সুতরাং যখন সে তাকবীর দিবে, তারপর তোমরা তাকবীর দিবে, আর যখন সে সাজদাহ করে তারপর তোমরা সাজদাহ করবে, আর যদি তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন তবে তোমরা দাঁড়িয়ে পড়বে।"[৬৩৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "ইমাম যখন বসে সালাত আদায় করবে তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় কর।"[৬৩৮]

পক্ষান্তরে যারা উক্ত ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার কথা বলেন, তাদের দলীল হচ্ছে,

عن عائشة قالت امر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله ﷺ في نفسه خفة فخرج فإذا ابو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليـه أن كـما أنت فـجلس رسول الله ﷺ حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ والناس يصلون بصلاة ابي بكر .

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে মানুষের

---

৬৩৭. বুখারী ৩৭৮।

৬৩৮. বুখারী ৬৮৮; মুসলিম ৪১১।

www.waytojannah.com

ইমামতি করছেন। অতঃপর আবূ বকর (রা) পিছু হটতে চাইলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারা করে তাকে তার স্থানে থাকার নির্দেশ দিলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বকর (রা)-এর পাশে বসে পড়লেন। আবূ বকর (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে সালাত আদায় করছিলেন, আর লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর সালাতের অনুসরণে সালাত আদায় করছিল।"[৬৩৯]

o প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও যৌক্তিকতা

এ দুধরনের হাদীস বিষয়ে আলিমগণ দু'ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

ক. নসখ তথা রহিত হয়েছে বলা পদ্ধতি।

খ. প্রাধান্যদানের পদ্ধতি।

যাঁরা নসখের মত অবলম্বন করেছেন, তাঁরা বলেন, আয়েশা (রা)-এর হাদীসের বাহ্যিক মর্ম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের ইমামতি করেছেন আর আবূ বকর (রা) লোকদের শ্রবণ করাচ্ছিলেন। কেননা, একই সালাতে দুই ইমাম জায়েয নয়। আর লোকেরা ছিল দাঁড়িয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। সুতরাং যেহেতু এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সর্বশেষ আমল, তাই এটি তার পূর্ববর্তী বাণীর জন্য রহিতকারী। এ মতটি ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মত।

যে আলিমগণ তারজীহ তথা প্রাধান্যদানের মত অবলম্বন করেছেন, তাঁরা আনাস (রা) এর হাদীসটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিতে মূলত ইমাম কে ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি আবূ বকর (রা) এ বিষয়ে বর্ণনা অস্পষ্ট। সুতরাং অস্পষ্টতা থেকে দূরে থেকে স্পষ্ট মত গ্রহণ করা উচিত।

উভয় মতই এখানে শক্তিশালী হলেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ আমল হিসেবে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুমাল্লাহ্র মতই এখানে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত বলে মনে হয়।

---

৬৩৯. বুখারী: ৬৮৩; মুসলিম ৪১৮।

www.waytojannah.com

Contents

পরিশিষ্ট

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الرحمات وعلى آله وأصحابه وبعدا ·

আল-হামদুলিল্লাহ। যার অপার অনুগ্রহে তুলনামূলক ফিকহ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। মূলত তুলনামূলক ফিকহ চর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বিধানকে জেনে বুঝে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কার্যকর করা। যা সমস্ত মুসলিম উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটাকেই তিনি শরী'আত হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ·

"তারপর আমরা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের এক শরী'আত তথা বিশেষ বিধানের উপর; কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।"[৬৪০]

আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিশন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هى قعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذالك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعسنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ·

"আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হচ্ছে, এমন মুষলধারার বৃষ্টির মতো যা ভূমিতে এসে পড়েছে, ফলে এর কিছু

৬৪০. সূরা আল-জাসিয়াহ ১৮।

www.waytojannah.com

Contents

অংশ এমন উর্বর পরিষ্কার ভূমিতে পড়েছে যে ভূমি পানি চুষে নিতে সক্ষম, ফলে তা পানি গ্রহণ করেছে, এবং তা দ্বারা ফসল ও তৃণলতার উৎপত্তি হয়েছে।

আবার তার কিছু অংশ পড়েছে গর্তওয়ালা ভূমিতে যা পানি আটকে রাখতে সক্ষম সুতরাং তা পানি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে, ফলে আল্লাহ্ এর দ্বারা মানুষের উপকার করেছেন। তারা তা পান করেছে, ভূমি সিক্ত করিয়েছে এবং ফসলাদি উৎপন্ন করতে পেরেছে।

আবার তার কিছু অংশ পড়েছে এমন অনুর্বর সমতল ভূমিতে যাতে পানি আটকে থাকে না, ফলে তাতে পানি আটকা পড়েনি, ফসলও হয় নি।

ঠিক এটাই হলো ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীনের সঠিক 'ফিকহ' বা সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে এবং আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হতে পেরেছে, ফলে সে নিজে জেনেছে এবং অপরকে জানিয়েছে (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি)। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে এই হিদায়াতের দিকে মাথা তুলে তাকায়নি, ফলে আল্লাহ যে হিদায়াত নিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা গ্রহণ করে নি (তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি)।"[৬৪১]

বাস্তব কথা হচ্ছে, ফিকহ চর্চার মাধ্যমেই জাতি বর্তমান স্থবিরতা থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু ফিকহ চর্চা সবার দ্বারা সম্ভব নয়। অনেকে ফিক্হ বহন করে বেড়ায় কিন্তু সে তা থেকে কিছুই উপকৃত হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন,

رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ٠

"অনেক ফিকহ বহনকারী আছে যে তার থেকে বড় ফকীহের মুখাপেক্ষী। আবার অনেক ফিকহ বহনকারী আছে যে মোটেই ফকীহ নয়।"[৬৪২]

সুতরাং ফকীহ হওয়া সবচেয়ে বড় কাজ। উম্মতের হালাল হারাম চেনা, মানুষদেরকে তাদের দীন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কাজ একমাত্র ফকীহই করতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরাই বড়, যাঁরা ছিলেন ফকীহ। যুগে যুগে মানুষ তাঁদেরই অনুসরণ করেছে।

এ ফকীহদের সম্মিলিত কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা, তাদের মতভেদ ও দলীল সংক্রান্ত গবেষণাই হচ্ছে তুলনামূলক ফিকহ।

---

৬৪১. বুখারী ৭৯; মুসলিম ২২৮২।

৬৪২. আবূ দাউদ ৩৬৬০।

www.waytojannah.com

এ গ্রন্থে এ বিষয়ে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তা তুলনামূলক ফিকহের মহা সমুদ্রের বিন্দুর চেয়েও কম। প্রতিটি অধ্যায়ে যাবতীয় মাসআলা নিয়ে এসে সে সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদি উল্লেখ করে তা যথাযথ যাচাই-বাছাই করার পরই এ কর্ম সম্পাদিত হতে পারে। এটা অত্যন্ত দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ। আমার যাবতীয় প্রচেষ্টা ছিল এ বিষয়ে একটি নমুনা তৈরি করা। তাই আমি পবিত্রতা অধ্যায় ও সালাত অধ্যায়ে তুলনামূলক ফিকহ কেমন হওয়া প্রয়োজন তা আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহ্‌র কাছে এ দো'আই করব যে, তিনি আমার এ আমলটিকে কবুল করে আখিরাতে আমার নাজাতের অসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।।

www.waytojannah.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. আত-তুরকী, আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহসিন, আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা
২. আত-তুরকী, আব্দুল্লাহ আবদুল মুহসিন, উসূলি মাযহাবি ইমাম আহমাদ
৩. আত-তা'রিফাত, ওয়া মুসত্বালাহাতে ফিকহিয়্যাহ
৪. আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর
৫. আত-তায়ালাসী, আবূ দাউদ, মুসনাদ
৬. আত-তাহতাবী, হাশিয়া আলা মারাকিল ফালাহ
৭. আত-তাহাবী, মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা
৮. আত-তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আছার
৯. আত-তাহাবী, শারহু মা'আনিল আসার
১০. আদুদুদ্দিন আল-ঈজী, শারহু মুখতাসারু ইবনিল হাজেব
১১. আদ-দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর
১২. আদ-দারদীর, আশ-শারহুস সগীর
১৩. আদ-দারা কুতনী, আল-'ইলাল
১৪. আদ-দারা কুতনী, আস-সুনান
১৫. আদ-দারেমী, আস-সুনান
১৬. আদ-দাসূকী, হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশ-শারহিল কাবীর লিদ দারদীর,
১৭. আদাবুশ-শাফেয়ী ওয়া মানকিবুহু
১৮. আন-নাওয়াবী, আল-আযকার, আল-ফতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ সহ মুদ্রিত
১৯. আন-নাওয়াবী, আল-আরবাঈন
২০. আন-নাওয়াবী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব
২১. আন-নাওয়াবী, আল-মাজমু'
২২. আন-নাওয়াবী, আল-হাওয়ী
২৩. আন-নাওয়াবী, রাওদাতুত তালেবীন
২৪. আন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত
২৫. আন-নাসায়ী, আস-সুনান
২৬. আনোয়ার শাহ আল-কাশমীরী, ফায়দুল বারী

www.waytojannah.com

২৭. আবূ ইয়া'লা, আল-মুসনাদ
২৮. আবূ দাউদ, আল-মারাসীল
২৯. আবূ দাউদ, আস-সুনান
৩০. আবূ নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া
৩১. আবূ যাহরা, আশ-শাফে'য়ী
৩২. আবূ যাহরা, ইবন হাম্বল
৩৩. আবূ যাহরা, মালিক,
৩৪. আবূ হাতেম আর-রাযী, তাকদিমাতু আল-জারহি ওয়াত-তা'দীল,
৩৫. আব্দুর রহমান আল-জাযিরী, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ
৩৬. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন কাসেম, হাশিয়াতুর রাওদিল মুরবি'
৩৭. আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ
৩৮. আব্দুল হাই লাখনৌভী, আল-আজওয়িবাতুল ফাদিলা
৩৯. আবূল ওয়ালিদ আল-বাজী, আল-মুন্তাকা
৪০. আমীর বাদশাহ, তাইসীরুত তাহরীর
৪১. আয-যাইলা'য়ী, তাবয়ীনুল হাকায়েক
৪২. আয-যাইলা'য়ী, নাসবুর রায়াহ
৪৩. আয-যাবিদী, তাজুল আরুস
৪৪. আয-যামাখশারী, আল-ফায়িক
৪৫. আয-যামাখশারী, আসাসুল বালাগাহ
৪৬. আয-যুরকানী, শারহুল মুয়াত্তা
৪৭. আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খন্ড
৪৮. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা
৪৯. আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম
৫০. আর-রাগিব আল ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত
৫১. আর-রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ
৫২. আর-রাযী, মানাকিবুশ শাফে'য়ী
৫৩. আর-রাযী, মাফাতীহুল গাইব
৫৪. আল হুমাইদী, আল-মুসনাদ
৫৫. আল-'আলাঈ, জামেউত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল
৫৬. আল-আমেদী, আল-ইহকাম

www.waytojannah.com

৫৭. আল-আলবানী, তামামুল মিন্নাহ
৫৮. আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী
৫৯. আল-আসকারী, আবূ হিলাল, মু'জামুল ফুরূক আল-লুগাওয়িয়্যাহ,
৬০. আল-কুরআনুল কারীম
৬১. আল-কুরতুবী, আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন
৬২. আল-কান্দালুভী, মুহাম্মাদ যাকারিয়্যা, আওজাযুল মাসালেক
৬৩. আল-কাসানী, বাদা'য়েউস সানায়ে'উ
৬৪. আল-কাসেমী, কাওয়ায়েদুত তাহদীস
৬৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, আল-কিফায়াহ
৬৬. আল-খতীব আল-বাগদাদী, আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ
৬৭. আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ
৬৮. আল-খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান
৬৯. আল-গাযালী, আল-মুস্তাসফা
৭০. আল-গাযালী, আল-মানখূল
৭১. আল-গাযালী, ইহ্‌ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন
৭২. আল-জাওহারী, আস-সিহাহ
৭৩. আল-জামে'উস সহীহ, তিরমিযী
৭৪. আল-জামেউস সাহীহ আল-মুসনাদ লিল ইমাম আল-বুখারী
৭৫. আল-জাসসাস, আল-ফুসূল ফিল উসূল
৭৬. আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন
৭৭. আল-ফাইরুযাবাদী, আল-কামুসুল মুহীত
৭৮. আল-বুখারী, আত-তারিখুল কাবীর
৭৯. আল-বা'লী, আল-ইখতিয়ারাত
৮০. আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা
৮১. আল-বায়হাকী, মানাকিবুশ-শাফে'য়ী
৮২. আল-বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ
৮৩. আল-বাবরতী, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ, আল-'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ
৮৪. আল-বাযদাবী, আল-উসুল, কাশফুল আসরারসহ
৮৫. আল-বাহূতী, আর-রাওদুল মুরবি'
৮৬. আল-বাহূতী, কাশশাফুল কানা'

www.waytojannah.com

৮৭. আল-বাহূতী, মুকাদ্দামাতু কাশ্‌শাফুল কানা'

৮৮. আল-বাহূতী, শারহু মুন্তাহাল ইরাদাত

৮৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ

৯০. আল-মানাভী: আত-তাইসীর শারহুল জামিউস সাগীর

৯১. আল-মারগিনানী, আল-হিদায়াহ

৯২. আল-মারদাওয়ী, আল-ইনসাফ

৯৩. আল-মাহাল্লী, জামউল জাওয়ামি'উ

৯৪. আল-হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ

৯৫. আল-হাকিম আন-নাইশাপূরী, আল-মুস্তাদরাক

৯৬. আল-হাকিম, আল-মাদখাল ইলাস সহীহ

৯৭. আল-হাজাওয়ী, শরফুদ্দীন মূসা, যাদুল মুস্তাকনি' মা'আস সালসাবীল

৯৮. আল-হাত্তাব, মাওয়াহিবুল জালীল

৯৯. আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার

১০০. আলাউদ্দীন আল-বুখারী, কাশফুল আসরার

১০১. আলী খফীফ, আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা

১০২. আলে সাবালেক, আহমাদ মানসূর, ফাতহুল ওহহাব ফী বয়ানে মাহিয়্যাতিল ফিকহিল মুকারিন লিত তুল্যাব

১০৩. আশ-শুরুনবিলালী, হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ

১০৪. আশ-শাওকানী, আস-সাইলুল জাররার

১০৫. আশ-শাওকানী, নাইলুল আওতার

১০৬. আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ

১০৭. আস-সুবকী, জাম'উল জাওয়ামে'উ

১০৮. আস-সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী

১০৯. আস-সা'দী, আব্দুর রহমান, তাইসীরু কালামিল মান্নান

১১০. আস-সাইমারী, আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি

১১১. আস-সাখাওয়ী, ফাতহুল মুগীস

১১২. আস-সামারকান্দী, তুহফাতুল ফুকাহা

১১৩. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত

১১৪. ই.ফা.বা, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন

১১৫. ইবন 'আরাবী, আহকামুল কুরআন

www.waytojannah.com

১১৬. ইবন আতিয়্যাহ, আল-মুহাররারুল ওয়াজীয
১১৭. ইবন আবদিল বার, আত-তামহীদ
১১৮. ইবন আব্দিল বার, আল-ইস্তিযকার
১১৯. ইবনু আবদিল বার, জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদলিহী
১২০. ইবন আবদিল হাকাম, ফুতুহি মিসর
১২১. ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ
১২২. ইবন আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল
১২৩. ইবন আবেদীন, মাজমু' রাসায়েল ইব্ন আবেদীন
১২৪. ইবন আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার
১২৫. ইবন্ আবেদীন: রিসালাতুল মুফতী
১২৬. ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী
১২৭. ইবন কাসিম, আল-বাহরুয যাখখার
১২৮. ইবন কাসীর, আল-বা'য়িসুল হাসীস
১২৯. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম
১৩০. ইবন খুযাইমাহ, আস-সহীহ
১৩১. ইবন খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান
১৩২. ইবন জুযাই, কাওয়ানিনুল আহকামিশ শারইয়্যাহ
১৩৩. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু' ফাতাওয়া
১৩৪. ইবন তাইমিয়্যাহ, রাফউল মালাম 'আনিল আইম্মাতিল আ'লাম
১৩৫. ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক
১৩৬. ইবন ফারেস, মু'জামু মাকায়িসুল লুগাহ
১৩৭. ইবন বাদরান, আল-মাদখালু ইলা মাযহাবিল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল
১৩৮. ইবনু মুফলিহ, আল-মুবদি'
১৩৯. ইবন মাজাহ, আস-সুনান
১৪০. ইবন মানযূর, লিসানুল আরব
১৪১. ইবন রুশদ আল-জাদ্দ, আল-মুকাদ্দিমাত
১৪২. ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ
১৪৩. ইবন রাজাব, শারহু ইলালিত তিরমিযী
১৪৪. ইবন হুবায়রা, আল-ইফসাহ
১৪৫. ইবন হাজার আল-আসকালানী, আদ-দিরায়াহ

www.waytojannah.com

১৪৬. ইবন হাজার আল-আসকালানী, ইতহাফুল খিয়ারাতুল মাহারাহ বি যাওয়াইদিল মাসানিদিল আশারাহ
১৪৭. ইবন হাজার আল-মাক্কী, আল-খাইরাতুল হিসান
১৪৮. ইবন হাজার, তালখীসুল হাবীর
১৪৯. ইবন হাজার, ফাতহুল বারী
১৫০. ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা
১৫১. ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা
১৫২. ইবন হিব্বান, আস-সহীহ
১৫৩. ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ
১৫৪. ইবনুল ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব
১৫৫. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কে'য়ীন
১৫৬. ইবনুল কাত্তান, আল-ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম
১৫৭. ইবনুল জাওযী, আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ
১৫৮. ইবনুল জারুদ, আল-মুন্তাকা
১৫৯. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত
১৬০. ইবনুল মুনযির, আল-ইসরাফ
১৬১. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর
১৬২. ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ
১৬৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শাইবানী, আল-মুয়াত্তা
১৬৪. ইমাম মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ
১৬৫. ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা
১৬৬. ইমাম শাফে'য়ী, আর রিসালাহ
১৬৭. ইমাম শাফে'য়ী, আল-উম্ম
১৬৮. ইমাম শাফেয়ী, আল-মুসনাদ
১৬৯. কাফফাল আশ-শাশী, হিলইয়াতুল উলামা
১৭০. কাযী আতহার হুসাইন, আয়িম্মায়ে আরবা'আহ
১৭১. কাহহালা, উমর রিদা, মু'জামুল মুআল্লেফীন
১৭২. খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদি, আল-আইন
১৭৩. খাইরুদ্দীন আর-রামলী, মিনহাতুল খালিক আলাল বাহরির রায়িক
১৭৪. জাওয়াহিরুল ইকলীল আলা মুখতাসারি খালীল

১৭৫. জামালুদ্দিন আল-ইসনাওয়ী, শারহু জামউল জাওয়ামেউ
১৭৬. ড. আবদুল করীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উসুলিল ফিকহ
১৭৭. ড. আবূল ফাতাহ, দিরাসাত আলা বিদায়াতুল মুজতাহিদ লি কাজী আবুল ওয়ালীদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবী
১৭৮. ড. আহমদ শালাবী, আত-তাশরী' ওয়াল কাদা ফিল ফিকরিল ইসলামী
১৭৯. ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার, তারিখুল ফিকহিল ইসলামী
১৮০. ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু
১৮১. ড. বাদরান আবূল আইনাইন বাদরান, তারীখুল ফিকহিল ইসলামী ও নাযরিয়াতুল মিলকিয়াতি ওয়াল উকুদ
১৮২. ড. মুস্তফা সাঈদ আল-খীন, আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাওয়াইদিল উসূলিয়্যাহ ফী ইখতিলাফিল আয়িম্মাহ
১৮৩. ড. মুস্তফা হাসান আস-সিবা'য়ী, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়ীল ইসলামী,
১৮৪. তাবারী, আবূ জা'ফর, জামেউল বায়ান ফী তাফসীর আয়িল কুরআন
১৮৫. তাসকুবরী যাদাহ, মিফতাহুস সা'আদাহ
১৮৬. ফাওয়ায়েদু কিতাবিল মুগনী ওয়াশ শারহিল কাবীর
১৮৭. ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম খণ্ড), সম্পাদনা বোর্ড, ইফাবা
১৮৮. বুজাইরমী আলা আল-খতীব
১৮৯. মুজাম্মা আল-লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত
১৯০. মুস্তফা আহমাদ আয-যারকা, আল-মাদখালুল ফিকহী আল-আম
১৯১. মুসলিম, আস-সহীহ
১৯২. মুহাম্মাদ ইবন হাসান আল-হাজাওয়ী, আল-ফিকরুস সামী
১৯৩. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, শারহু সুনানি ইবন্ মাজাহ
১৯৪. মুহাম্মাদ রশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার
১৯৫. মানাভী, ফয়যুল কাদীর
১৯৬. মোল্লা আলী আল-কারী, আল-আসরারুল মারফু'আহ ফিল আখবারিল মাওদু'আহ
১৯৭. মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাত
১৯৮. মোল্লা জিউন, আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ
১৯৯. মোল্লা জিউন, নুরুল আনওয়ার

www.waytojannah.com

২০০. শা'রানী রচিত আল-মীযানুল কুবরা, কাশফুন নি'মাহ
২০১. শাব্বির আহমদ আল-উসমানী, মুকাদ্দিমাহ
২০২. শাব্বির আহমাদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম
২০৩. শামসুদ্দিন ইবন কুদামাহ, আশ-শারহুল কাবীর
২০৪. শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া, ইখতিলাফুল আয়িম্মাহ
২০৫. শারওয়ানী, হাশিয়া আলাল মিনহাজ
২০৬. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, আল-ইনসাফ ফী সাবাবিল ইখতিলাফ
২০৭. শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ
২০৮. হুসনুত তাকাদী ফী সীরাতে ইমাম আবি ইউসুফ আল-কাযী
২০৯. হাশিয়া কালইয়ূবী ওয়া উমাইরাহ
২১০. হাশিয়াতুল ফান্নারী

ইফাঃ গবেষণা/২০১২-২০১৩/গবে/৫৭২৭(উ)-২,২৫০

www.waytojannah.com